

রবীন্দ্রজীবনকথা



রবীন্দ্রনাথ

যুক্তরাষ্ট্র । আমেরিকা । ডিসেম্বর ১৯১৬

রবীন্দ্রজীবনকথা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী
কলিকাতা

প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৬
পরিবর্ধিত সংস্করণ : কার্তিক ১৩৬৮
পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৭৩ : ১৮৮৮ শক

প্রকাশক বিশ্বভারতী
গ্রন্থনবিভাগ : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

৩·১

নিবেদন

রবীন্দ্রজীবনকথা পূর্বে চার খণ্ডে মুদ্রিত বিরাট রবীন্দ্রজীবনীর সংক্ষেপ-কৃত সংস্করণ নয়— এটা নূতন বই-ই বলতে পারি ; প্রথমতঃ চলতি ভাষা হয়েছে এর বাহন ; আর দ্বিতীয়তঃ সন-তারিখ পাদটীকা প্রভৃতির দ্বারা কণ্টকিত করি নি।

এই বই লেখা সম্ভব হত না, যদি শ্রীমতী সুধাময়ীদেবী চার খণ্ড 'জীবনী' পড়ে তার একটা সারসংকলন করে আমার সামনে না ধরতেন। তিনি সে কাজ করেছিলেন বলেই এটা আমার পক্ষে নূতন করে লেখা সম্ভব হয়েছে ; না হলে নিজের লেখার সবটাই মনে হয় অপরিহার্য।

আর-একজনের নাম এই গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাক্— তিনি হচ্ছেন আমাদের 'হরিপদ কেরানি' ওরফে শ্রীকানাই সামন্ত। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও রসবোধ নিয়ে তিনি বইখানিকে আদ্যন্ত দেখে দিয়েছেন— তাঁর জন্য 'কৃতজ্ঞ' এইটুকু বলে আমি তাঁকে ছোটো করতে চাই নে।

আমি এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেছি শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় মহাশয়কে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষক ছিলেন ; তাঁরই চেষ্টায় আমি ১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছিলাম। সেইটি স্মরণ করে এই উপলক্ষে তাঁর প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

এই গ্রন্থের নির্দেশিকা তৈরি করে দিয়েছেন আমার বধূমাতা শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়। আমি তাঁকে আমার আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট রবীন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের শ্রীমান্ জগদিন্দ্র ভৌমিক। তাঁর উদ্দেশে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

সর্বশেষে না বলে পারছি না যে, সম্পাদনার কতকটা দায়িত্ব নিয়েছিলেন কল্যাণীয় শ্রীপুলিনবিহারী সেন। লেখকের অনবধান-জনিত লেখার কোনো ত্রুটি, আশা করি, তাঁর শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারে নি— ফলে তথ্যের দিক দিয়ে এবং বিষয়সংগতিতে যথেষ্ট শুদ্ধ বা সংস্কৃত হয়েছে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। ইতি

বোলপুর। ৫ ফাল্গুন ১৩৬৫

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

চিত্রসূচী

প্রচ্ছদ : রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি। তেহেরান। ৮ মে ১৯৩২

প্রবেশক : রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি। ইলিনয়। আমেরিকা। ডিসেম্বর ১৯১৬

এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রতিকৃতি-চিত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গৃহীত হয় Mrs. Seymourএর সৌজন্যে রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত আছে।

প্রথম ও শেষ পাণ্ডুলিপি-চিত্রের মূল শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি-চিত্রের বিষয়ীভূত গানটি ১৯২৬ খৃস্টাব্দে য়ুরোপ-ভ্রমণ-ক রচিত এবং কবি-কর্তৃক বৈকালী গ্রন্থে যথাযথ প্রতিমুদ্রণের উদ্দেশে বিশে প্রস্তুত ধাতুফলকে পুনর্লিখিত।

উৎসর্গ

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়
করকমলেষু

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমে
রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় পাবার
ব্যবস্থা আপনি করে দিয়েছিলেন—
সেই কথা স্মরণ ক'রে এই গ্রন্থখানি
আপনাকে অর্পণ করলাম।

গ্রন্থকার

প্রস্তাবনা

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের বাংলাদেশ ও কলিকাতার অবস্থা কী ছিল, তা এখনকার লোকের পক্ষে কল্পনা করা দুরূহ। কারণ, যে বদলটা হয়েছে সেটা যদি শুধু বস্তুগত হত, অর্থাৎ জীবনযাত্রার সুখদুঃখের উপকরণ দিয়ে তার বিচার সীমিত হত, তবে দূরত্বটাকে হয়তো-বা বোঝা যেতেও পারত। কিন্তু আসল বদল হয়েছে বাঙালির মনে, যেটাকে বলা যায় তার গুণগত বিবর্তন— কালান্তরে যা ঘটে চলেছে।

ইংরেজ বাংলাদেশে কায়েম হয়ে বসেছে প্রায় আরো একশো বছর আগে। ইংরেজের সেই নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য যে-স্বাধীনতার লড়াই উত্তর ও মধ্য ভারতে দেখা দিয়েছিল, ইতিহাসে যা আজ পর্যন্ত 'সিপাহী-বিদ্রোহ' নামে অভিহিত, সদ্য তার অবসান হয়েছে। বাংলাদেশেও তার তরঙ্গ উঠেছিল। কিন্তু বাঙালি তখনো ইংরেজের মোহবন্ধন থেকে বেরিয়ে আসবার তাগিদ বোধ করে নি, তাই তার সমাজজীবনে অত বড়ো বিপ্লবের রেখাপাত স্পষ্ট নয়।

কিন্তু, এই রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাংলার সমাজ ও ধর্ম-জীবনে মহাবিপ্লব এসেছিল রাজা রামমোহন রায়ের নূতন ধর্মদেশনা থেকে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মবৎসর ১৮৬১ খৃস্টাব্দ। তার পূর্বের পাঁচটা বৎসরকে বলা যেতে পারে বাংলার সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। এই পর্বের মধ্যে পড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -স্থাপন, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা -বিষয়ক আন্দোলন, নীলকরের হাঙ্গামা ও হরিশ মুখুজ্জের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ, বাংলার প্রত্যন্তদেশে সাঁওতাল-বিদ্রোহ, বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব, মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব, 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন ও নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যুগোচিত প্রতিভার আত্ম-প্রকাশের প্রয়াস— অতি বিচিত্র ঘটনাবলী। প্রত্যেকটি আন্দোলন বাংলাদেশকে মধ্যযুগীয় মনোভাব থেকে বাইরে আসতে সহায়তা করেছিল। আধুনিকতার সূত্রপাত হল এই পর্বে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল বাংলার এই নবজন্মের প্রত্যুষে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে দেবেন্দ্রনাথের পরিবার প্রাচীন হিন্দুসমাজের অনেক-কিছু সংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতার যার-পর-নেই ধনী ও অভিজাত বংশের এক যুবকের পক্ষে প্রাচীন সমাজের সংস্কার ভেঙে বেরিয়ে আসা যে কী নিদারুণ পরীক্ষা, তা আজকের যুগে কল্পনা করা কঠিন; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।" ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর (১৮৪৩) থেকেই দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে যুগান্তর এসেছিল; "আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম…সমস্তই বিরল" হয়ে উঠেছিল; সে যুগের ধনী হিন্দুগৃহে বারো মাসের তেরো পার্বণ, পূজা, উৎসব— সবই বন্ধ করে দেন দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন…নতুন কাল সবে এসে নামল।" অর্থাৎ, প্রায় পূর্বসংস্কারহীন পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এলেন এ সংসারে।

তখনকার নতুন কাল বা আধুনিকতা বলতে কী বোঝায়, তার দুই-একটা নমুনা দিই। আদব-কায়দায় পোশাকে-পরিচ্ছদে ঠাকুর-বাড়ির

পুরুষেরা ছিলেন আধা-মোগলাই ; কারণ, উনবিংশ শতকের মাঝসময় পর্যন্ত সেটাই ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। এরই মধ্যে এসে পড়েছিল য়ুরোপীয় আধুনিকতার নয়া সাজ-সরঞ্জাম। দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন যেমন ধনী ও মানী তেমনি শৌখিন ও বিলাসী। তাঁর সময় থেকে বিলাতি ছবি, ইতালীয় পাথরের মূর্তি, বিলাতি টেবিল-চেয়ার সোফা-কৌচ প্রভৃতি আসবাব-পত্রের আমদানি হয়। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রেরা ও জামাতারা ইংরেজিআনায় যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তা বলতে পারি নে। বিলাতি অর্গান, পিয়ানো, ফ্লুট, বেহালা প্রভৃতির চলন হল ঘরের মজলিশে ; আদি ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের জন্য একান্ত-বিলাতি পাইপ-অর্গান ব্যবহৃত হত। এই দেশী ও বিলাতি সংস্কৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিশুকাল কাটে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা, তথা ভারতের, সর্বপ্রথম আই. সি. এস.। বিলাত থেকে এসে তিনি অনেক-কিছু বিলাতিআনা প্রবর্তন করেন ; তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন। ১৮৬৬ সালে কর্মস্থল বোম্বাই থেকে বাড়ি ফেরার সময় "ঘরের বৌকে মেমের মতো গাড়ি হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়িতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে, আর-একটা ঘোড়ায় নিজে চড়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গড়ের মাঠে যেতেন হাওয়া খেতে ; এও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল। এই-সব কাণ্ড দেখে ঘরে বাইরে ছীছি রব উঠল। (কেননা, এক দিন এই ঠাকুর-বাড়ি থেকে মেয়েরা গঙ্গাস্নানে যেতেন ঘটাটোপ-দেওয়া পাল্কি চড়ে। বন্ধ পাল্কি -সুদ্ধ তাঁদের জলে চুবিয়ে আনা হত, ঘাটে নামবার রেওয়াজ ছিল না। এমন পর্দানশিন সব। ঘর ও বাহির ছিল অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মতো।) রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবনের অনেক দিন কাটে এই মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিদাদার সঙ্গে, নূতন আবহাওয়ায়, নূতন পরিবেশের মধ্যে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-রূপে মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ

বাংলা কাব্যে আনল যুগান্তর। বাংলা ভাষায় এল নূতন শক্তি, তার গতিতে এল স্বাচ্ছন্দ্য ও লীলা— অভাবিত এই সিদ্ধি। শুধু ভাষায় নয়, ভাবের রাজ্যে, দৃষ্টিভঙ্গিতেও এল বিপ্লব। গদ্যনাটক-রচনায় দীনবন্ধু যে ভাষাকে বাহন করলেন তা খাঁটি গ্রাম্য বাংলা। অর্থাৎ, সাধারণ বাঙালি যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষা দিলেন তিনি পাত্রপাত্রীর মুখে ; নাটকের বিষয় হল ঘরোয়া সুখদুঃখের কাহিনী ও সমস্যা। এতদিন নাটক লেখা হয়েছিল ইংরেজির ছায়া অবলম্বনে অথবা পুরাণ-ইতিহাসের কাহিনীকে কেন্দ্র করে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক সাহিত্যে ও নাট্যাভিনয়ে বিপ্লব এনেছিল। এই সন্ধিক্ষণে আসেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর ভাষায় যে জৌলুশ, আখ্যানে ও চরিত্রচিত্রণে যে বৈচিত্র্য তা একেবারেই অ-পূর্ব। বাংলা ভাষা আধুনিক যুগে স্থিতি ও গতি পেল মধুসূদনের কাব্যে আর— য়ুরোপীয় ও ভারতীয় এই দুই বিপরীত ভাবধারার সংমিশ্রণ হল বঙ্কিমের উপন্যাসে। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই দুই ধারার পরিপূর্ণ বিকাশ।

২

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক উপন্যাসের সূচনায় লিখেছেন, "আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে, সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সল্‌তে পাকানো।"

রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগের কথা হচ্ছে কলিকাতায় ঠাকুর-পরিবারের আবির্ভাব-কাহিনী। একটু গোড়া ঘেঁসে সংক্ষেপে বলি। ঠাকুরগোষ্ঠীর আদিপুরুষ জগন্নাথ কুশারী পীরালি ব্রাহ্মণ শুকদেব রায়চৌধুরীর এক কন্যাকে বিবাহ ক'রে দক্ষিণডিহি (খুলনা) গ্রামের ভূসম্পত্তি পেয়ে সেখানেই বাস করতে থাকেন ; পীরালি ঘরে বিবাহ করে জগন্নাথ সমাজে হলেন পতিত। তুর্কী-পাঠানদের শাসনকালে মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার জন্য অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ 'পতিত' হন। রায়চৌধুরীদের সম্বন্ধে সেইরকম কাহিনী প্রচলিত আছে।

জগন্নাথের কয়েক পুরুষ পরে পঞ্চানন ও তাঁর কাকা শুকদেব পারিবারিক মনোমালিন্য হেতু একদিন দক্ষিণডিহি থেকে নৌকা করে চলে এলেন

কলিকাতায়। জীবিকার জন্য ভাবনা নেই—ইংরেজ বণিকরা জাহাজে করে ব্যাবসা-বাণিজ্য শুরু করেছে সেখানে।

কুশারীরা এসে ঘর বাঁধলেন গোবিন্দপুর গ্রামে, দরিদ্র হিন্দুসমাজের হরিজন পল্লীতে। সেখানে এতদিন এক ঘরও ব্রাহ্মণ ছিল না। লোকেরা তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পেয়ে খুব খুশি। খুলনায় এঁরা ছিলেন পতিত পীরালি, এখানে তাঁরা হলেন 'ঠাকুরমশাই', ব্রাহ্মণ তো বটে। তখন ব্রাহ্মণেরা ঠাকুরদেবতার মতোই সম্মান পেতেন—তা, তাঁদের যে পেশাই হোক। মুখে মুখে চলল 'ঠাকুরমশাই'—ব্রাহ্মণের নাম ধরে তো ডাকা যায় না। পঞ্চাননরা ইংরেজ জাহাজওয়ালাদের মালপত্র সরবরাহ করেন; ইংরেজরাও পঞ্চাননকে 'ঠাকুর' বলতে শুরু করল। তাদের মুখে ঠাকুর শব্দটা বিকৃত হয়ে হল ট্যেগোর (Tagore, Tagaure)। এইভাবে কুশারীদের পদবী গেল উঠে—তাঁরা নিজেরাই ঠাকুর পদবীটা ব্যবহার শুরু করে দিলেন।

পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম ইংরেজ কোম্পানির আমিনগিরি করে বেশ দুপয়সা করেন। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে নীলমণি ও দর্পনারায়ণ হলেন যথাক্রমে জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের আদিপুরুষ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশের দেওয়ানী পাওয়ার (১৭৬৫) পর নীলমণি উড়িষ্যার কালেক্টরি বা রাজস্ববিভাগে চাকুরি পান; এতে করে তাঁর ধনার্জনটা ভালোই হয়। তার পর দর্পনারায়ণও অলস ছিলেন না, তিনি কলিকাতায় বসেই বহুভাবে টাকা রোজগার করেন। দুই ভাইয়ের টাকায় পাথুরিয়াঘাটা পল্লীতে কেনা জমিজমার উপর ঘর বাড়ি উঠলো। কিন্তু অর্থ অনর্থের মূল—এ তো ঋষিবাক্য। নীলমণি ও দর্পনারায়ণের মধ্যে মন-কষাকষি শুরু হল। তখন নীলমণি পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি ও আরও কিছু ভূসম্পত্তি দর্পনারায়ণকে দিয়ে নিজে নিলেন নগদে এক লক্ষ টাকা; আর তার পর গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনকে নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন।

কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার পুবে জোড়াসাঁকোর কাছে জমি কিনে নীলমণি ঠাকুর ঘর ওঠালেন। সেটা ঘটে ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালের

শেষ দিকে (১৭৮৪)। তখন ও পাড়ার নাম ছিল মেছোবাজার ; জোড়াসাঁকো নাম হয় পরে।

এই বংশে রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথের জন্ম। দ্বারকানাথ থেকে (১৭৯৪-১৮৪৬) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে ধন এল, মান এল, প্রতিপত্তি বাড়ল। কালে দ্বারকানাথ হলেন সে যুগের কলিকাতার বড়ো একজন ব্যবসায়ী। বিদ্বান বুদ্ধিমান ও ধনবান ব'লে নাম-ডাক হল। কী বাঙালি, কী ইংরেজ বণিক বা রাজপুরুষ, সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তাঁর বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির জলসায় নিমন্ত্রণ পাবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকত মেমসাহেবরা— এলাহি আয়োজন হত খানাপিনা নাচ-গানের। যেমন টাকা রোজগার করতেন তেমনি ব্যয় ও অপব্যয় করতেন দু হাতে। কলিকাতার কত ভালো কাজে যে টাকা দিয়েছিলেন তার ঠিক নেই— অকাতরেই দান করতেন। বিলাতে যান বেড়াতে ভ্রমণের নেশায় বটে, ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা-সুযোগ আদায়ের জন্যও বটে। সেখানে তাঁর দানখয়রাত দেখে লোকে তাঁকে 'প্রিন্স্' বলত। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ও বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে হিন্দুধর্মের আচার ত্যাগ করেন নি, আবার লৌকিক ধর্মের খাতিরে বন্ধুর বিরোধিতাও করেন নি। সুবিধার জন্য লোকাচার মানতেন, আবার সুবিধার জন্য সাহেবিআনাও করতেন, কিন্তু সাহেবি পোশাক-পরিচ্ছদ কখনো পরেন নি।

রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ এই দ্বারকানাথের পুত্র ; ইনি রামমোহনের ধর্ম গ্রহণ করেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন (১৮৪৩, ২২ ডিসেম্বর)। এ ঘটনায় বিষয়ী পিতা খুশি হন নি আদৌ। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই আর পুরানো বিশ্বাসের মধ্যে ফিরতে পারলেন না। খুব অশান্তির মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের দিন যায়। কিন্তু একদিন উপনিষদের এক ছেঁড়াপাতা থেকে যে খবরটি পেলেন— ঈশ্বর সমস্তকে ছেয়ে আছেন, তিনি যা দেবেন তাই খুশি হয়ে নেবে, অন্যের ধনে লোভ কোরো না— সেটাই হল তাঁর জীবনের মন্ত্র।

এমন সময়ে বিলাতে দ্বারকানাথের মৃত্যু হল ; ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যাঙ্ক এবং জমিদারির সমস্ত ঝুঁকি এসে পড়ল যুবক দেবেন্দ্রনাথের উপর।

ব্যবসায়ের বিস্তর দেনা সমস্ত শোধ করলেন বিষয়-আশয় বিক্রয় ক'রে। ঋণমুক্ত হবেনই, তাঁর সংকল্প; বিষয়ী আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ গ্রহণ করে উত্তমর্ণদের ফাঁকি দিতে রাজী হলেন না। পিতার ঋণ শুধু নয়, পিতার প্রতিশ্রুত লক্ষাধিক টাকার চাঁদা বহু বৎসরে তিনি শোধ করেন; সেটাকেও পিতৃঋণ বলেই মেনে নিয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ইতিহাস আমরা জানতে পারি তাঁর আত্মচরিত থেকে। বাংলা সাহিত্যের এটি এক অপূর্ব গ্রন্থ; যেমন ভাষা তেমনি তার আন্তরিকতা। এ ছাড়া স্বীয় ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংকলন করেন ভারতীয় নানা শাস্ত্র থেকে; সে গ্রন্থ 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে সুপরিচিত। এই ব্রাহ্মধর্ম বইখানি যে কেবল হিন্দুর ধর্মচিন্তার উৎকৃষ্ট সংগ্রহপুস্তক তা নয়, বিশ্বধর্মের ভূমিকা-রূপেও তাকে গ্রহণ করতে কারো বাধা না হতে পারে।

৭ই পৌষ হল দেবেন্দ্রনাথের জীবনের পুণ্যদিন; সেদিন তিনি তাঁর সত্যধর্মকে পেয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে। আর, সে দিনটা রবীন্দ্রনাথের জীবনেও ছিল তেমনি পবিত্র— জীবনের শেষ সাতই পৌষ পর্যন্ত এই দিনটি তিনি স্মরণ করেছেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থটি ছিল কবির নিত্যসঙ্গী, তাঁর সাধকজীবনের আশ্রয়— সেখান থেকে পেতেন তাঁর অধ্যাত্মজীবনের শক্তি ও সম্বল, আনন্দ ও বীর্য।

৩

দেবেন্দ্রনাথের পনেরোটি সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চতুর্দশ। তাঁর জন্ম হয় (১৮৬১) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, তাঁর তিরোভাব হয় ঐ গৃহেই। আশি বৎসরের উপর এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল; সে বাড়ি বাঙালি এখনো তাঁর জন্মদিনে (২৫ বৈশাখ) ও মৃত্যুদিনে (২২ শ্রাবণ) দেখতে যায়।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় দেবেন্দ্রনাথের বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর: তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স একুশ; মধ্যম সত্যেন্দ্রনাথ উনিশ বৎসরের যুবক, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলাত যাচ্ছেন; পরবর্তী সন্তান হেমেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তেরো। অন্য

ভাইয়েদের কথা বললাম না, কারণ এই চার জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রভাব পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের উপর বেশি ক'রে।

দেবেন্দ্রনাথের কন্যাদের মধ্যে যাঁদের বিবাহ হয়েছিল, তাঁরা জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই থাকেন— সকলেই প্রায় 'ঘর-জামাই'; কারণ পতিত পিরালী ব্রাহ্মণবংশে বিবাহ করায় হিন্দুসমাজে জামাইরা স্থান মান দু'ই হারাতেন। ধনী শ্বশুরের আশ্রয়ে থাকতে হত অনেককেই। এই বহু আত্মীয় কুটুম্ব-আশ্রিত, দাসদাসী পাইক হরকরা-পরিবেষ্টিত বড়ো একটা বুনিয়াদি পরিবারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিশুকাল কাটে আরও পাঁচটি শিশুর মতোই।

ধনীগৃহের রেওয়াজ-মতে শিশুদের দিন কাটে ঝি-চাকরদের হেফাজতে। মাতা সারদাদেবী এই বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী— সব সময় মন দিতে হয় সংসারের কাজে— কর্তা থাকেন বিদেশে। পুত্রবধূরা ও কন্যারা নিজ নিজ শিশুদের সামলাতেই ব্যস্ত। এ ছাড়া সারদাদেবীর শেষ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে তাঁর শরীরও যায় ভেঙে; সে শিশুর অকালমৃত্যু হয়। ফলে রবীন্দ্রনাথ মায়ের বা দিদিদের বা বউদিদিদের যত্ন খুব যে পেতেন তা নয়। ভৃত্যমহলেই দিন কাটে অযত্নে অনাদরে। ঘরে আটকা থাকেন; জানলার নীচে একটা পুকুর, তার পুব ধারে পাঁচিলের গায়ে বড়ো একটা বটগাছ, দক্ষিণ দিকে নারিকেল গাছের সারি। শিশুর সময় কাটে এই ছবির মতো দৃশ্য দেখে— 'ডাকঘরে'র অমলের দশা— ঘর থেকে বের হওয়া বারণ। ঘুর ঘুর করলে চাকরদের কাজ বাড়ে, তারা শাসন করে।

জোড়াসাঁকোর বসত-বাটি তৈরি হয় বহুকাল আগে; নীলমণি ঠাকুর ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক্ হওয়ার পরে জোড়াসাঁকোয় বাড়ি তৈরি করেছিলেন। দ্বারকানাথ পৈতৃক বাড়ির পাশেই বিরাট এক অট্টালিকা নির্মাণ করান— সাহেব-মেমদের খানাপিনা দিতেন সেখানে। সে বাড়ি বহুবৎসর বাংলাদেশের নূতন চারু ও কারু-কলা-আন্দোলনের মর্মকেন্দ্র ছিল— সেখানে থাকতেন গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ। সে বাড়ির প্রধান অংশের চিহ্ন নেই, এখন সেখানে হয়েছে রবীন্দ্রভারতী।

পুরানো বসত-বাড়ি প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে নানা

মহলে। অনেক ঘর, আঁকা-বাঁকা অনেক আঙিনা। বহু তলায় ও বহু ছাদে ওঠানামার উঁচু-নিচু নানারকম সিঁড়ি এখানে-সেখানে। গোলোক-ধাঁধার মতো সমস্ত বাড়িটা। শিশুরবির নিকট এই-সব জানা-অজানা কুঠুরি ছাদ বিরাট রহস্যে পূর্ণ। কল্পনাপ্রবণ বালকের বিশ্বাস করবার শক্তি অপরিসীম। সঙ্গীদের মধ্যে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ তাঁর থেকে একটু বড়ো; তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ব'লে ছোটো মাতুলটির তাক্ লাগিয়ে দিতেন। তাঁর ভগিনী ইরাও 'রাজার বাড়ি'র রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিতে বালককে বিহ্বল করে তোলে। বড়ো বয়সে শিশুর উক্তিচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

আমার রাজার বাড়ি কোথায়
কেউ জানে না সে তো—
সে বাড়ি কি থাকত যদি
লোকে জানতে পেত।

অন্যত্র কবি বলছেন, "মনে আছে এক-একদিন সকাল বেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারি দিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল।···গোলাবাড়িতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তুম, মনে করতুম কী-একটা রহস্য আবিষ্কৃত হবে। দক্ষিণের বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড়ো করে তার ভিতর কতকগুলো আতার বিচি পুঁতে রোজ যখন-তখন জল দিতেম—ভাবতেম এই বিচি অঙ্কুরিত হয়ে উঠলে সে কী-একটা আশ্চর্য ব্যাপার হবে। পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ, ঝড়বাদলা—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানামূর্তিতে আমায় সঙ্গ দান করত।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৃদ্ধ বয়সে লেখা 'ছেলেবেলা' বইয়ে তাঁর বাল্যজীবনের যে ছবি এঁকেছেন তার থেকে বেশি-কিছু সংকলন এখানে নিষ্প্রয়োজন; কারণ, সে বই মূল বাংলায়, হিন্দি ও ইংরেজি তর্জমায় অনেকে পড়েছেন আশা করি। সেজন্য সে-সব ঘটনার পুনরুক্তি এখানে করলাম না।

দেবেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি ছিল, ধীরে ধীরে মিতব্যয়ের দ্বারা ও

সুবুদ্ধিবলে বিষয়সম্পত্তি আবার গড়ে তোলেন। সেই জমিদারির আয় ছিল মোটা ; জীবিকার জন্য সংগ্রাম দেখা দেয় নি তখনো।

ঠাকুর-বাড়ির আবহাওয়া ছিল সাহিত্য গান অভিনয় প্রভৃতির আনন্দ-কোলাহলে ভরপুর। তবে সে যুগে বড়োদের ও ছোটোদের মধ্যে খুব একটা ব্যবধান ছিল ; জ্যেষ্ঠদের মজলিশে বা জলসায় কনিষ্ঠদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু সেই-সব গান-বাজনা হৈহুল্লোড়ের ঢেউ ছোটোদের কানে এবং প্রাণে তো এসে পৌছয়। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য লিখছেন, বন্ধুদের পড়ে শোনান— রবীন্দ্রনাথ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে-সব শোনেন। শুনে শুনে কাব্যের অনেকখানি তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়— তাঁর শৈশবের কাব্যের মধ্যে স্বপ্নপ্রয়াণের প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

শিশুকাল হতে রবীন্দ্রনাথ সুকণ্ঠ। তিনি বলেছেন, কবে যে গান গাইতে পারতেন না তা তাঁর মনে পড়ে না। দেবেন্দ্রনাথের পরম ভক্ত শ্রীকণ্ঠ সিংহ বীরভূম-রায়পুরের লোক, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের জ্যেষ্ঠতাত ; কলিকাতায় এলে এঁদের বাড়িতে থাকেন। তিনি গানের পাগল ; সুরে-সেতারে মশগুল, মত্ত। কবি লিখেছেন, "তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না।" বিষ্ণু চক্রবর্তী আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ; শিশুদের গানে 'হাতে খড়ি' হয় এঁর কাছে— সকাল-সন্ধ্যায়, উৎসবে, উপাসনা-মন্দিরে তাঁর গান শোনেন। বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়ে যান। আর-একটু বড়ো বয়সে ঠাকুর-বাড়ির ছেলে-মেয়েদের গান শেখাবার জন্য এলেন যদুভট্ট— অসামান্য ওস্তাদ। কিন্তু যাকে বলে মন দিয়ে শেখা বা বিশেষ প্রণালীর মধ্য দিয়ে শেখা, তা রবীন্দ্রনাথের ধাতে ছিল না ; ইচ্ছামত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেতেন ঝুলি ভর্তি করতেন তাই দিয়ে। দাসদাসী কর্মচারী ভিখারি-বেদেনি বাউল-মাঝিমাল্লা প্রভৃতি বিচিত্র লোককে যখন যা গাইতে শুনতেন তাই শিখে ফেলতেন। এই বিচিত্র রসের গান ও সুর শিশুর মনকে ভরে দিত।

যে ভৃত্যমহলে শিশুদের দিন কাটে, সেই ভৃত্যদের মধ্যে ঈশ্বর বা ব্রজেশ্বর কোনো এক কালে ছিল গ্রামের গুরুমশায়। তার উপরেই

ছেলেদের ভার। তখনকার দিনে কলিকাতা শহরে বিজলী বাতি অজ্ঞাত, কেরোসিনের তেল শুরু হচ্ছে সবেমাত্র; রেড়ির তেলের সেজের অনুজ্জ্বল আলোর চার পাশে ব'সে বালকেরা ঈশ্বরের রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকা-পাঠ শুনত। তার পর রাত্রির আহার শেষ করে বড়ো একটা বিছানায় শিশুরা শুয়ে পড়ে— পৃথক্ খাটে আলাদা-আলাদা শোওয়ার রেওয়াজ তখনো হয় নি। বাড়ির পুরাতন ঝিয়েদের মধ্যে কেউ-না-কেউ ছেলেদের শিয়রের কাছে ব'সে গল্প শোনায়— তেপান্তরের মাঠ দিয়ে চলেছে রাজপুত্তুর।...শুনতে শুনতে ঘুম আসে।

লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হল 'বর্ণপরিচয়' দিয়ে। 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটিয়ে প্রথম ভাগের পাতায় প্রথম যেদিন পড়লেন "জল পড়ে পাতা নড়ে" সেদিন কবির মনে হল, যেন আদি কবির আদি কবিতা শুনলেন। পড়ার বই মুড়ে রেখেও মনের মধ্যে অনুরণন থামল না— "জল পড়ে পাতা নড়ে।"

পড়াশুনা চলে ঘরেই, মাধব পণ্ডিতের কাছে। কিন্তু একদিন বড়ো ছেলেদের স্কুলে যেতে দেখে বালক রবি কান্না জুড়লেন, তিনিও স্কুলে যাবেন। মাধব পণ্ডিত এক চড় কষিয়ে বললেন, "এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদছ, না-যাবার জন্য এর চেয়ে অনেক বেশি কাঁদতে হবে।" কবি পরে লিখেছেন, "এত বড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।"

যা হোক, কান্নার জোরে ওরিএন্টাল সেমিনারি নামে এক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু সেখানে বেশি দিন পড়েন নি; অভিভাবকেরা সকলকেই নর্মাল স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে পড়াশুনো হত বিলাতি ইস্কুলের অনুকরণে। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ-লাভের থিয়োরি অনুসারে ক্লাস আরম্ভ হবার পূর্বে সমস্ত ছাত্র এক জায়গায় সমবেত হয়ে একটা ইংরেজি কবিতা সমস্বরে আবৃত্তি করত; সেই দুর্বোধ্য ইংরেজি গানের ভাষা বাঙালি ছাত্রদের মুখে মুখে কী বিকৃত রূপ পেয়েছিল তা 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক অবশ্যই জানেন। কবির মনে এই নর্মাল-স্কুলের স্মৃতিও মধুর ছিল না।

৪

বয়স যখন বছর এগারো বালকের প্রথম সুযোগ হল শহর ছেড়ে শহরতলিতে যাবার। জোড়াসাঁকোর গলির মধ্যে প্রাচীর-ঘেরা অট্টালিকার বাসিন্দা, সুকুমারমতি বালকের জীবনে এই ঘটনার প্রভাব নিতান্ত সামান্য হয় নি।

সেবার (১৮৭২-৭৩) কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বর ঘরে ঘরে। ঠাকুর-পরিবারের সকলে তাই গেলেন গঙ্গার ধারে পেনেটি বা পানিহাটির এক বাগানবাড়িতে। অদূরে গঙ্গা, চাকরদের ঘরের সামনে একটা পেয়ারা গাছ, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পাল-তোলা নৌকা চলেছে মাঝ-গঙ্গায়। এই ছবি স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে ছিল বড়ো বয়সেও— কবিতায় রূপ দিয়েছেন।

পেনেটি থেকে শহরে ফিরে, আবার বালকদের নর্মাল স্কুলে যেতে হয়— সেই নীরস পুনরাবৃত্তি। মাধবপণ্ডিতের ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলতে আরম্ভ হয়েছে, স্কুলের উপর বিতৃষ্ণা জমছে।

স্কুলের পড়াশুনা ছাড়াও, বাড়িতেই বালকদের সর্ববিদ্যাবিশারদ করবার নানা আয়োজন হয়েছে। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন এর উদ্যোক্তা, বালকদের মনকে নানা বিষয়ের জ্ঞানে ভরে দিতে হবে, তবেই তাদের চিত্তের 'সর্বোদয়' হবে, এই ছিল তাঁর ধারণা। তবে সব শিক্ষাই হত বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে। তাই ভাষার বুনিয়াদ বেশ পোক্ত হল।

ভোরে উঠে এক কানা পালোয়ানের কাছে লঙ্গোটি প'রে ধুলোমাটি মেখে, কুস্তি ল'ড়ে হত দিনের আরম্ভ। তার পর গৃহশিক্ষকদের কাছে বাংলা গণিত ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতির ছক-বাঁধা পড়াশোনা। স্কুল থেকে ফেরবার পর ড্রয়িং-মাস্টারের কাছে ছবি আঁকার শিক্ষা ; আর একটু পরে জিম্‌নাস্টিক। সন্ধ্যার পর ইংরেজি পড়া, কিন্তু তখন বই হাতে নিতেই দু চোখ ভেরে আসে ঘুমে। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ছেলেদের ঢুলতে দেখে বড়দাদা ছুটি দিয়ে যান ; তখনই ঘুম যায় ছুটে আর বালক রবি মাতৃ-অধিষ্ঠিত অন্তঃপুরের অভিমুখে রওনা দেন।

রবিবার সকালে আসেন বিজ্ঞানশিক্ষক ; যন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞান পড়ান তিনি। এটাতেই বালকের সব চেয়ে বেশি উৎসাহ। বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী যে অনুরাগ এই ভাবেই হল তার ভিত্তিপত্তন।

বাংলায় যে-সব বই পড়ানো হত সেও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়— যেমন চারুপাঠ, বস্তু-বিচার, প্রাণীবৃত্তান্ত প্রভৃতি। বাংলাভাষা শেখানোর জন্য পাঠ্যপুস্তক করা হয়েছিল মেঘনাদবধকাব্য। কাব্যকে এভাবে ভাষা ও ব্যাকরণ শেখাবার কাজে লাগানোতে বালকের মন ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ষোলো বছরে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েই, 'ভারতী'র পাতায় (১২৮৪) 'মেঘনাদবধকাব্য'কে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে— সে এমন রচনা যে কবি তাকে আর কখনো ফিরে ছাপান নি। আনন্দের বস্তুকে শিক্ষা ও শাসনের বস্তু করার এই প্রতিক্রিয়া।

নর্মাল স্কুল থেকে ছাড়িয়ে বালকদের ভর্তি করে দেওয়া হল বেঙ্গল একাডেমি নামে এক ফিরিঙ্গী ইস্কুলে। ইংরেজিভাষায় লেখাপড়া, বিশেষতঃ বলা-কহা ভালোরকম রপ্ত হবে এই ভরসায় সেখানে দেওয়া। এই বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের সঙ্গে বালক-কবির ঘনিষ্ঠতা হয়, সে ম্যাজিক দেখাতে পারত; কবি তাকে অমর করেছেন গল্পসল্পের 'ম্যাজিশিয়ান' গল্পে —অবশ্য, 'জীবনস্মৃতি'তে যে ভাবের উল্লেখ ছিল তার উপর যথেষ্ট রঙ চড়িয়েণ

স্কুলের বাঁধাধরা পাঠ্যতালিকার বাইরে অ-পাঠ্য বইয়ের উপরেই বালকের টান বেশি। দ্বিজেন্দ্রনাথের আলমারিতে অনেক দামী বইয়ের মধ্যে ছিল— 'অবোধবন্ধু' ও 'বিবিধার্থসঙ্গ্রহ' সাময়িক পত্র আর বৈষ্ণবপদাবলী। 'অবোধ-বন্ধু'তে ফরাসী উপন্যাস পৌল ও বর্জিনিয়ার ধারাবাহিক তর্জমা বের হয়; প্রশান্তমহাসাগরের এক দ্বীপে দুটি তরুণ-তরুণীর জীবনের করুণ কাহিনী পড়তে পড়তে বালকের মন বেদনায় ভরে ওঠে। এই কাহিনীর প্রাকৃতিক বর্ণনার প্রভাব তাঁর বাল্যরচনা 'বনফুল'-এর মধ্যে বেশ স্পষ্ট।

বিবিধার্থসঙ্গ্রহ সম্বন্ধে কবি নিজে লিখছেন, "সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।"

অবোধবন্ধুতে বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রকাশিত হত। বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এই রচনাগুলি বালককে বিভোর করে তোলে;

অট্টালিকাবাস থেকে বিহারীলাল-বর্ণিত "নড়বোড়ে পাতার কুটীরে, স্বচ্ছন্দে রাজার মতো ঘুমে আছি নিদ্রাগত" অবস্থাটি কল্পনায় বড়ো মনোরম মনে হয়। বিহারীলালের 'নিসর্গদর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী,' 'সুরবালা কাব্য' এই অবোধবন্ধু মাসিক পত্রে বালক কবি প্রথম পড়লেন।

ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যুগান্তর এল— বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' -রূপে (১৮৭২)। তখন বালক রবীন্দ্রনাথের বয়স এগারো বৎসর। কিন্তু এই অল্প বয়সে তিনি বঙ্গদর্শনের সব-কিছুই পড়ে ফেলতেন ; সে যুগে কখানা পত্র-পত্রিকাই বা ছিল! এ-সব সাময়িক সাহিত্য ছাড়া যা বালককে সব থেকে বেশি আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে বৈষ্ণবপদাবলী এবং গীতগোবিন্দের স্খলিত ছন্দ।

৫

আদি ব্রাহ্মসমাজে উপনয়নাদি সংস্কার প্রচলিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেই সংস্কার-অনুসারে বড়োমেয়ের বড়োছেলে সত্যপ্রসাদ ও নিজের ছোটো দুই ছেলে সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, এঁদের পৈতা দিলেন। তবে এই অনুষ্ঠান যতদূর অপৌত্তলিক ভাবে সম্পন্ন করা যায় তা তিনি করেন। ইতিপূর্বে অন্যান্য পুত্রদের উপনয়ন প্রচলিত হিন্দুরীতি -অনুসারেই হয়েছিল।

উপনয়নের সময় (১৮৭৩ ফেব্রুয়ারি) রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল এগারো বৎসর নয় মাস। গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ বোঝবার বয়স ঠিক নয় ; তবুও নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবার দিকে খুব একটা ঝোঁক উপস্থিত হল। গায়ত্রীর প্রভাব তাঁর সমস্ত জীবনের ধর্মসাধনায় ওতপ্রোত হয়ে ছিল। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের 'মানবসত্য' ভাষণে দেখি যে, জীবনের শেষ দিকেও স্মরণ করেছেন এই দিনের কথা— "তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ... এইরকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে—এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।"

নতুন 'ব্রাহ্মণ' তো হলেন ; কিন্তু মুণ্ডিত মস্তকে বা 'নেড়া মাথায়' ফিরিঙ্গী ইস্কুলে কী করে যাবেন? মন খুব উদ্‌বিগ্ন। এমন সময় একদিন তেতলায়

পিতার ঘর থেকে ডাক এল ; পিতা হিমালয় যাচ্ছেন, বালক তাঁর সঙ্গে যেতে চান কি ? কবি বলেন, 'চাই' এই কথাটা চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে বলা গেলে মনের ঠিক ভাবটি প্রকাশ হত। "কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয় !"

পাহাড়ে যাবার পথে পিতাপুত্রে কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে থেকে গেলেন। ১৮৭৩ অব্দের বোলপুর নগণ্য গ্রাম। স্টেশন থেকে মাইল-দেড় দূরে বিঘা কুড়ি জমি কিনে দেবেন্দ্রনাথ ছোটো একটি একতলা পাকা বাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন ; বাড়ির নাম দেন শান্তিনিকেতন। চারি দিকে ধূ ধূ মাঠ, একটা অসম্পূর্ণ পুষ্করিণী। দূরে ভুবনডাঙা গ্রামের বাঁধ, তালের সারিতে ঘেরা—এখন সে তালগাছ একটাও নেই। পরে এখানে দেবেন্দ্রনাথ আশ্রম স্থাপন ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এগারো বৎসর বয়সে (১৮৭৩) বোলপুর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। আর, গভীর ভাবে পরিচয় হল পিতার সঙ্গে।

দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা থেকে দূরে দূরে থাকতেন ব'লে পুত্রকন্যাদের সঙ্গে স্নেহে ভালোবাসায় তেমন ঘনিষ্ঠতা হত না। তা ছাড়া আজকাল বাপ-মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যেরকম মাখামাখির সম্বন্ধ, সেকালের সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে রেওয়াজ ছিল না। পিতাপুত্রের মধ্যে বেশ একটা দূরত্ব থেকে যেত—সম্ভ্রমের দূরত্ব, বড়ো ও ছোটোর স্বাভাবিক দূরত্ব। বোলপুরের প্রান্তরে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতাকে কাছে পেলেন। পিতার টাকা রাখা, হিসাব লেখা, ঘড়িতে দম দেওয়া প্রভৃতি অনেক কাজের ভার তিনি পেলেন। আর পেলেন আপনমনে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা।

শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশ বালকের কাব্যরচনার সহায় হল। বালক যে কোন্ বয়স থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন, তার ইতিহাস উদ্ধার করা শক্ত। কবি লিখেছেন, "ইতিপূর্বেই কোন একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা, সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে।...পয়ার, ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকার বোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। শুরু হল আমার ভাঙা ছন্দে টুকরো কাব্যের

পালা উল্কাবৃষ্টির মতো; বালকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথনী।”

শান্তিনিকেতনের ছোটো একটা নারিকেল গাছের তলায় বসে বালক-কবি 'পৃথ্বীরাজপরাজয়' নামে এক নাট্যকাব্য লিখলেন। 'পৃথ্বীরাজপরাজয়' কাব্যখানির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি; তবে আমাদের মনে হয় 'রুদ্রচণ্ড' নাট্যকাব্য এই গ্রন্থেরই রূপান্তর।

বোলপুর থেকে বের হয়ে রেলপথে সাহেবগঞ্জ দানাপুর এলাহাবাদ কানপুর প্রভৃতি স্থানে থামতে থামতে তাঁরা চললেন। অবশেষে পৌছলেন পঞ্জাবের অমৃতসর শহরে।

অমৃতসরে শিখেদের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরে পিতাপুত্রে প্রায়ই যান, মন দিয়ে গান শোনেন; দেবেন্দ্রনাথ খুশি হয়ে গায়কদের পুরস্কৃত করেন—এ-সব কথা কবির খুব স্পষ্ট মনে ছিল। অমৃতসর মন্দিরে 'গ্রন্থসাহেব'-এর অখণ্ড পাঠ ও ভজনপদ্ধতি দেখে পরবর্তী কালে দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ঐ প্রথার কিছু পরিবর্তন ক'রে প্রাতে ও সায়াহ্নে নিয়মিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ -পাঠ ও ব্রহ্মসংগীতের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রথা বহুকাল চলিত ছিল।

অমৃতসর থেকে পিতা পুত্রে ডালহৌসি পাহাড়ে বক্রোটা শৈলশিখরে বাসা বাঁধলেন। দূরে বরফ-জমা পাহাড়, চার দিকে পাইনবন, গভীর খদ, সরু পথ—তার মধ্যে বালক স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ান একা একা। পিতা উদ্‌বেগশূন্য। “তখন আমার অল্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয় চলেছেন ডালহৌসি পাহাড়ে। সকালবেলায় ডাণ্ডি চড়ে বেরোতুম, অপরাহ্নে ডাক-বাংলোয় বিশ্রাম হত।” বৃদ্ধ বয়সে সেই স্মৃতি থেকে লেখেন:

হিমালয় গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে
মনে পড়ে। ধূর্জটির তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারেবারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন,
তুষার নিরুদ্ধবাণী বর্ণহীন, বর্ণনাবিহীন।···
সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে চিরদিন মনোমাঝে।

বক্রোটার বাংলোতে দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে নিয়মিত পাঠ দেন—সংস্কৃত, ইংরেজি, জ্যোতিষ। ইংরেজি বই থেকে জ্যোতিষ্ক রহস্য সরলভাবে বুঝিয়ে দেন, খোলা আকাশের তলে ব'সে নক্ষত্র চেনান। পিতার কাছে যা পাঠ গ্রহণ করেন, সেটা বাংলায় লিখে ফেলেন। জ্যোতিষের প্রতি এই-যে অনুরাগের সৃষ্টি হল সেটি জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল; আধুনিক জ্যোতিষ সম্বন্ধে কত বই-যে তিনি পড়েছিলেন তা বলা যায় না। যাই হোক, জ্যোতিষ সম্বন্ধে ইংরেজি থেকে পড়া ও পিতার কাছ থেকে শোনা কথাগুলি গুছিয়ে একটা প্রবন্ধ খাড়া করলেন; সেটা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কেটে-হেঁটে প্রকাশিত হয়। বোধ হয় এটাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম-মুদ্রিত রচনা; অবশ্য অ-নামেই ছাপা হয়েছিল।

৬

হিমালয়ে চার মাস কাটিয়ে বালক বাড়ি ফিরলেন দেবেন্দ্রনাথের এক অনুচরের সঙ্গে। ঠিক পূর্বের স্থানটিতে ফিরলেন এমন নয়; এতকাল বাড়িতে থেকেও যে নির্বাসনে ছিলেন, তা পার হয়ে বাড়ির ভিতরে এসে পৌছলেন। ভৃত্যরাজক বাইরের ঘরে আর তাঁকে কুলোয় না; মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল করে বসলেন। তখন বাড়ির যিনি বয়ঃকনিষ্ঠা বধূ, রবীন্দ্রনাথের কিছু বড়ো, তাঁর কাছে কনিষ্ঠ দেবরটি প্রচুর স্নেহ ও আদর পেলেন। ইনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরীদেবী; এঁর প্রসঙ্গে পরে আমাদের ফিরে আসতে হবে।

অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ের কথা ভোলেন না; বেঙ্গল একাডেমি স্কুলে আবার যেতে হয়। স্কুলের চার-দেয়াল-ঘেরা ঘরকে কয়েদখানা বলে মনে হয়। মনে জাগে নানা আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিচিত্র সাধ। এগারো বৎসর বয়েসে লেখা 'অভিলাষ' কবিতায় প্রকাশ পায় সেই-সব মনের কথা; কবিতাটি ১২৮১ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—এবারেও বিনা নামেই।

এ দিকে স্কুলে যাওয়ার থেকে না-যাওয়ার দিন বেড়ে চলে। শেষে স্থির হল বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে ঘরে পড়ানোর। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য এলেন, গ্র্যাজুয়েট গৃহশিক্ষক। তিনি ধীমান ব্যক্তি; অভিনব পদ্ধতি বার করলেন

এই অদ্ভুত বালকের জন্য। মূল থেকে পড়ালেন কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' আর শেক্স্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক। এই দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি বালক-কবির মনের গোচর করল অপূর্ব দুটো জগৎ। জ্ঞানচন্দ্র পড়িয়েই ক্ষান্ত হলেন না। পঠিত অংশগুলি বাংলা কবিতায় তর্জমা না করা পর্যন্ত বালকের নিষ্কৃতি ছিল না। ম্যাকবেথ তর্জমা কিছুটা বিনা নামে ভারতীতে ছাপা হয়েছিল। কবি জীবনস্মৃতিতে বলেছেন—রামসর্বস্ব পণ্ডিতের সঙ্গে গিয়ে বিদ্যাসাগরমশায়কেও ম্যাকবেথ-তর্জমা শুনিয়ে আসতে হয়েছিল; বুক দুরুদুরু করলেও মোটের উপর উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চয় করেই বাড়ি ফিরেছিলেন।

এই বয়সের বিনা-নামে-ছাপা লেখা আরো আছে, যেমন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে 'জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' কবিতাটি।

ছাপার হরফে স্বনামে প্রকাশিত প্রথম কবিতা— 'হিন্দুমেলার উপহার'। এটি ছাপা হয়েছিল দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় (১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি)। তখন বালকের বয়স তেরো বৎসর আট মাস। হিন্দুমেলার এই সভা বসে আপার সার্কুলার রোডের পার্শিবাগানে; সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। এই কবিতা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতসংগীত "বাজ্ রে শিঙা বাজ্ এই রবে"র অনুকরণে ও সেই ছন্দেই লেখা; সে যুগে 'ভারতসংগীত' অনেক শিক্ষিত বাঙালিরই কণ্ঠস্থ ছিল। দেশের বেদনা প্রকাশ পায় আরেকটি কবিতায়। 'প্রকৃতির খেদ' নামে কবিতা পড়েছিলেন বিদ্বজ্জন সভায়।

সমসাময়িক 'সাধারণী' পত্রিকা লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রকৃতির-খেদ' নামে স্বরচিত একটি পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর, পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইতেছিল।" কবিতাটি প্রকাশিত হয় পণ্ডিত রামসর্বস্ব -সম্পাদিত 'প্রতিবিম্ব' মাসিকে সর্বপ্রথম (১২৮২ বৈশাখ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)।

এই প্রতিবিম্ব কয়েক মাস পরেই 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এর সঙ্গে মিলিত হয়। এই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যোপন্যাস 'বনফুল' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় (১২৮২ অগ্রহায়ণ-১২৮৩ কার্তিক)।

হিমালয় থেকে ফিরে এসে যে সময়টা ঘরে বসে পড়াশুনা করেন, তখন 'বনফুল' কাব্য লেখা—বয়স তেরো বৎসরের বেশি নয়। "পরে দাদা সোমেন্দ্রনাথের অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উৎসাহে" গ্রন্থাকারে ছাপা হয় (১৮৮০ মার্চ)। এ বই আর পুনর্মুদ্রিত হয় নি—অবশ্য, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অচলিত সংগ্রহের অন্তর্গত রয়েছে।

'বনফুল' ছাড়া জ্ঞানাঙ্কুরে বালক-কবির অন্য 'কতকগুলি পদ্যপ্রলাপ' প্রকাশিত হয় ; প্রলাপই বটে :

আয় লো প্রমদা ! নিঠুর ললনা
　　বার বার বলি কী আর বলি !
মরমের তলে লেগেছে আঘাত
　　হৃদয় পরান উঠেছে জ্বলি।

তেরো বৎসরের বালকের এ ভাবে কথা বলা অস্বাভাবিক ; তবে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অসাধারণ কল্পনাপ্রবণ বালকের ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়।

গদ্য-প্রবন্ধেরও হাতেখড়ি হয় এই জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় ; সেটি এক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা', 'অবসরসরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী' এই তিনটি কাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে, খণ্ডকাব্য গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের লক্ষণাদি বিচার-পূর্বক বালক লেখক খুব ঘটা করে ও গম্ভীর-ভাবে প্রমাণ করলেন যে, কাব্য-তিনখানিতে প্রকৃত গীতিকাব্যের লক্ষণ ও কবিপ্রতিভা প্রকাশ পায় নি। এই রচনা প্রকাশিত হলে তার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ মাতুলকে ভয় দেখিয়ে বলেন যে, একজন বি. এ. তাঁর লেখার জবাব লিখছেন। শুনে বালক রবীন্দ্রনাথ সশঙ্ক হয়ে রইলেন।

৭

ঘরে পড়াশুনা বিশেষ হচ্ছে না ; জ্ঞানচন্দ্র চলে গেলেন আইন পড়তে। তখন বালকদের সেণ্ট্ জেভিয়ার্স্ স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। সেজেগুজে ঘোড়ার গাড়ি চেপে সকলে স্কুলে যায়, বালক রবির প্রায়ই বহুবিধ কারণ ঘটে না-যাওয়ার। এই ভাবে দিন যায়। ইতিমধ্যে জননী সারদাদেবীর মৃত্যু হয়েছে (১৮৭৫ মার্চ)। সারদাদেবীর ন্যায় সুগৃহিণীর অভাবে গৃহ যেন

লক্ষ্মীহীন হয়ে গেল। এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের স্কুলে যাওয়ায় আরও ঢিল পড়ে গেল ; বাড়ির মা-হারা ছোটো ছেলে বলে দিদি ও বউদিদিদের আদরে ও আস্কারায় স্কুল-কামাই বেড়ে চলল। স্কুলে না গিয়ে মনের সুখে বাংলা বই, বাংলা পত্রিকা, যা হাতের কাছে পান পড়েন ; বিশেষভাবে রীতিমত পরিশ্রম করে বৈষ্ণবপদাবলী পড়তে লেগে গেলেন। ঐ দিকে স্কুলে বৎসর-শেষে রবীন্দ্রনাথ 'প্রমোশন' পেলেন না। প্রিপারেটরি এন্‌ট্রান্‌স্‌ ক্লাস বা ফিফথ্‌ স্ট্যান্‌ডার্ড পর্যন্ত পড়েন ; বোধ হয় ক্লাসে না ওঠায় স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়।

স্কুল ছাড়বার পর ঘরে পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বাঁধাধরা শিক্ষার মধ্যে তাঁকে বাঁধা গেল না। বাড়িতেও নানা রকমের আলোচনা উত্তেজনা —তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন আর আপন মনে লিখে যান কবিতা, গান। উত্তেজনার ইন্ধন জোগালো 'সঞ্জীবনীসভা'। হিন্দুমেলার উৎসব তখনো বছরে বছরে বসে ; সেটা হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক সম্মেলন। কিন্তু মেলার লোকে তো আর দেশ স্বাধীন করতে পারে না ; তার জন্য চাই বিপ্লব। তলে তলে বৈপ্লবিক কাজ করবার জন্য গুপ্তসমিতি স্থাপিত হল, তারই নাম সঞ্জীবনীসভা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু[১] প্রভৃতি ছিলেন এর পাণ্ডা। সে সভায় নিজের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হত, সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার হত—ঐ ভাষায় সঞ্জীবনী-সভাকে বলা হত 'হামচুপামুহাফ্‌'। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটা খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।" বোধ হয় এই সভার জন্যই বালক-কবি

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

১ কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' নামে সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করেন ; ইনি রাজনারায়ণ বসুর জামাতা। অরবিন্দ এবং বারীন্দ্র ঘোষের পিতা ডাক্তার কে. ডি. ঘোষও রাজনারায়ণের জামাতা।

গানটি রচনা করে দেন।

হিন্দুমেলার দশম বার্ষিক উৎসবে (১৮৭৭ ফেব্রুয়ারি) বালক রবীন্দ্রনাথ একটি জ্বালাময়ী কবিতা পাঠ করলেন। নূতন বড়লাট লীটন ভারতে এসে খুব আড়ম্বর করে হত-শ্রী দিল্লিতে মহারানী ভিক্‌টোরিয়াকে 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' (এম্‌প্রেস অব্‌ ইন্‌ডিয়া) বলে ঘোষণা করেছেন (১৮৭৭ জানুয়ারি ১)। দেশে তখন দারুণ দুর্ভিক্ষ; সেই শ্মশানদৃশ্যের মধ্যে উৎসব! এই কবিতা দিল্লি দরবারের প্রতিবাদ। কিন্তু বড়লাট বাহাদুরের দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে নূতন প্রেস অ্যাক্টে তখন শান্‌ পড়ছে। তাই কবিতাটি কোনো সাময়িক পত্রিকায় ছাপা হল না। কিছু অদলবদল করে সেটাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে এক মধ্যযুগীয় বীরের মুখ দিয়ে বলানো হল। পাঠান-মোগলদের বিরুদ্ধে আস্ফালন করলে তারা তো আর জবাবদিহি চাইতে আসত না; তাই যা খুশি বলা চলত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সকলেই অন্যযুগের লোকের মুখে কবিতা বসিয়ে ব্রিটিশের উপর পরোক্ষে ঝাল ঝাড়তেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "দিল্লি-দরবার সম্বন্ধে… লর্ড্‌ লীটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে… ইংরেজ গবর্মেণ্ট রুশিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ-পনেরো [১৬] বছর বয়সের বালক-কবির লেখনীকে ভয় করিত না।"

এই দিন হিন্দুমেলায় বালকের সহিত বঙ্গের উদীয়মান কবি নবীনচন্দ্র সেনের পরিচয় হয়। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' সদ্য প্রকাশিত হয়েছে (১৮৭৫); শিক্ষিতদের মুখে মুখে মোহনলালের বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি প্রায়ই শোনা যেত। নবীনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাৎকারের অতি সুন্দর বর্ণনা রেখে গেছেন।

"নেশনাল মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম।… একজন বন্ধু বলিলেন যে, একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিয়াছেন।… উদ্যানের এক কোণায় প্রকাণ্ড এক বৃক্ষ তলায়… দেখিলাম… সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন।… বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।… সহাসিমুখে করমর্দন কার্যটি শেষ হইলে তিনি পকেট হইতে একটি নোটবুক বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি

কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছিত কণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।"

৮

সাহিত্য ও কলা-সৃষ্টির নৈপুণ্য বা সমঝদারি, ঐ যেন ঠাকুর-বাড়ির লোকেদের জন্মার্জিত ক্ষমতা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্যচক্র গড়ে ওঠে; সেটা সংবিধানসম্মত সভা নয়— সেটা মজলিশ, আড্ডা। আড্ডায় যেমন আসেন অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি সেকালের খ্যাতনামারা, তেমনি আসেন অখ্যাত সমঝদার ও চাটুকারেরা— আসর জমান তাঁরাই। অক্ষয়চন্দ্রের কাছ থেকে সকলে শোনেন ইংরেজি সাহিত্যের 'আধুনিক' কবিদের কথা— অর্থাৎ তাঁদেরই কথা গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে (১৮৭০) পাশ্চাত্য সাহিত্যের তালিকায় যাঁরা আধুনিক ছিলেন।

তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে পাশ্চাত্য কাব্যবিচারের একটা উচ্চ মান তুলে ধরে কত কথাই বোঝাতেন। ইংরেজিতে সমালোচনাসাহিত্য যে একটা বিরাট ব্যাপার, তার বিচারপদ্ধতিও বিচিত্র— এ-সব তত্ত্ব বালক রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রের কাছ থেকেই প্রথম শোনেন। অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী' কাব্যের প্রভাবও 'বনফুল' কাব্যে স্পষ্ট।

ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠদের মধ্যে কথা হল বাড়ি থেকে একটা মাসিক পত্র বের করলে হয়। ভাই-বোনেরা মিলে বাড়িতেই তো কত লেখক; বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেও লেখা জোগাড় হবে। ১২৮৪ সালের বাংলাদেশে কয়খানাই-বা সাময়িক পত্র ছিল, বঙ্গদর্শন মাত্র চার বৎসর চ'লে এক বছর বন্ধ ছিল— নূতন বৎসরের সূচনা থেকে আবার বের হচ্ছে। কলিকাতার 'আর্য্যদর্শন' ও ঢাকার 'বান্ধব' ছাড়া নাম-করা সাহিত্যপত্রিকা আর ছিল না। অবশেষে 'ভারতী' নাম দিয়ে ১২৮৪ শ্রাবণ মাসে (১৮৭৭) পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হল; দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হলেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন ষোলো বৎসর; নতুন পত্রিকার আবির্ভাবে বালকের লেখনী হতে অজস্র রচনা বের হতে থাকল। জ্ঞানাঙ্কুরে

গদ্যরচনার সূত্রপাত হয় সমালোচনা নিয়ে ; ভারতীতেও সমালোচনা লিখেই আরম্ভ হল গদ্য রচনা। সমালোচনার লক্ষ্যস্থল মাইকেলের মেঘনাদবধ-কাব্য। প্রতিভার ঔদ্ধত্যে এখানে বিচারবুদ্ধি আবিষ্ট ; তাই মধুসূদনের অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করে তরুণ লেখক প্রতিষ্ঠালাভের সর্বাপেক্ষা সহজ পথ ধরেছিলেন। কবি উত্তরকালে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে উক্ত সমালোচনার নিজেই ঐরূপ সমালোচনা করেছেন। তা ছাড়া ১৩১৪ আষাঢ়ে প্রথম প্রকাশিত ও 'সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধের শেষ দিকে বাংলাসাহিত্যে 'মেঘনাদবধকাব্য' সৃষ্টির হেতু ও তাৎপর্য কী তা অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি-যোগে পরিষ্কার দেখেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন। তবু বলতে হবে, ঝোঁকের মাথায় লেখা হলেও, ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে ভাববার কথা কিছু ছিল— সমস্ত লেখাটাকেই বাতিল করা যায় না বাল্যরচনা ব'লে।

ভারতীর প্রথম সংখ্যাতেই 'ভিখারিনী' গল্পটি বের হয় ; গল্প হিসাবে তুচ্ছ, তবুও ছোটো গল্পের ঠাট খানিকটা বজায় ছিল স্বীকার করতে হবে। 'করুণা' উপন্যাসও শুরু হয়, কিন্তু শেষ হয় নি। উপন্যাসটি তাঁর এই সময়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাব্যেরই অনুরূপ ; গল্পাংশ অতি তুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথের এই-সব রচনা স্থায়ী গ্রন্থ আকারে কখনো মুদ্রিত হয় নি।[১] তবু চন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় প্রখ্যাত ক্রিটিক 'করুণা'র গুণগান করেছিলেন।

এই ষোলো বছর বয়সে লেখা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' আজও বাঙালি গান করে। যে ভাষায় এগুলি লেখা তাকে বলে ব্রজবুলি ; ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র পুঁথিগত এই ভাষায় দুই-একটা পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে পুরোপুরি বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙে গানগুলি লিখলেন, তাতে লোক ঠকানো যেত। কবি তাঁর এক বন্ধুকে বলেওছিলেন, আদি ব্রাহ্মসমাজ-লাইব্রেরিতে এই পুঁথিখানা পাওয়া। বন্ধু বিশ্বাসও করেন।

কবি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম" :

১ 'ভিখারিনী' ও 'করুণা' বর্তমানে গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত (১৩৬৯)

গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস-লোকলাজে
সজনি আও, আও লো।

...

দেখ সজনি, শ্যামরায়
নয়নে প্রেম উথল যায়—
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনি বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ—
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে॥

একটা লেখা হতেই নিজের উপর বিশ্বাস জন্মালো। একটার পর একটা আরও অনেকগুলি লিখে চললেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বৈষ্ণবকবিতা পড়তে বালকের খুব ভালো লাগত; পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, রস, ভাব সমস্তই তাঁকে মুগ্ধ করত। বলা বাহুল্য, তাঁর এই কাব্যপাঠ কাব্যরস-উপভোগের জন্য; বৈষ্ণবতত্ত্ব বোঝবার বয়স ও আগ্রহ তখনো হয় নি। তাঁর অসংখ্য কবিতায় বৈষ্ণবী ভাবভাষা এমনভাবে মিশিয়ে আছে যে, লোকে ভুল ক'রে ভাবতেও পারে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ অর্থে বুঝি বৈষ্ণব ছিলেন।

ভারতীতে প্রকাশিত বিচিত্র রচনার মধ্যে 'কবিকাহিনী' নামে কাব্য-নাট্যখানি উল্লেখ করার মতো; কারণ, এই বই হচ্ছে বালকের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ (১৮৭৮)। তবে কবি এই বই ফিরে আর কখনো ছাপান নি। বহু বৎসর পরে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র 'অচলিত' খণ্ডে স্থান পেয়েছে (১৯৪০)।

এই কাব্যনাট্য সম্বন্ধে কবি তাঁর মাঝবয়সে বলেছিলেন, "যে বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা।"

সে যুগে 'কবিকাহিনী' সমাদর লাভ করেছিল; 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের মতন বিখ্যাত সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে উদয়োন্মুখ কবি বলে অভ্যর্থনা করেছিলেন।

৯

হিমালয় থেকে ফেরার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। বালককে লেখাপড়া শেখাবার অনেক রকম পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। এখন রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় সতেরো বৎসর— তিনি আর বালক নন। বাড়ির লোকের মহা উদ্বেগ, কী করা যায় রবিকে নিয়ে। অবশেষে ঠিক হল বিলাতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনা যাক। সে যুগে বড়োলোকের ছেলে লেখাপড়া না শিখলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করলে, তাকে বিলাতেই পাঠানো হত। তিনি কোনোরকমে লন্ডন শহরে কয়টা বছর টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে, একটা ইন্‌স্ অব্ কোর্টে নাম লিখিয়ে, খানা খেয়ে, ইংরেজি আদব-কায়দা-দুরস্ত হয়ে ব্যারিস্টার-রূপে দেশে ফিরতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিও তেমন আয়ত্ত হয় নি; বিলাতে গিয়ে করবেন কী? তাই ঠিক হল, বিলাত-যাত্রার পূর্বে ক'টা মাস আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে থেকে ইংরেজিটা সড়গড় করে নেবেন।

আহমদাবাদে শাহিবাগে জজসাহেবের বিরাট বাড়ি, মোগলযুগের ছোটো-খাটো প্রাসাদ; বাড়ির নীচেই সবরমতী নদী। সত্যেন্দ্রনাথ দুপুরে আদালতে (তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা বিলাতে)— শাহিবাগের নির্জন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের দিন কাটে মেজদাদার লাইব্রেরিতে। সারাদিন ইংরেজি পড়েন। অভিধানের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করেন; যেটার ভাষা বোঝেন না, কল্পনাবলে তার ভাবটা পূরণ করে নেন।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখা চলছে ভারতীর জন্য— গ্যেটে দান্তে পেত্রার্কা ও ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে সমালোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ। সেগুলি মৌলিক কিছু নয়, ইংরেজি বই থেকে সংকলন মাত্র।

নির্জন বাড়ির ছাদে একা একা ঘোরেন, মনের মধ্যে কত কবিকল্পনা জাগে, গানের সুর ভেসে আসে, ভাষা দেন আপন মনে। তাঁর স্বরচিত

সুরের প্রথম গীতিগুচ্ছ এখানে লেখা হল— 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়' 'বলি ও আমার গোলাপবালা' এবং অন্যান্য গান। কবিতা যা লেখেন তার মধ্যে ইংরেজি তর্জমাই বেশি, সংস্কৃত ও মারাঠি থেকেও কিছু করেন।

আমেদাবাদে একা-একা ইংরেজি বলা-কহা অভ্যাস হচ্ছে না। তাই বোম্বাইয়ে সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই পাণ্ডুরঙ্গ পরিবারের ইংরেজিআনার জন্য খুব খ্যাতি। সেই বাড়ির এক 'পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে' আন্না তড়খড় "ঝক্‌ঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছেই ইংরেজিআনা মক্‌স করেন, আর তিনি যে কবি সে কথাটাও ভাবে-ভঙ্গীতে জানিয়ে দেন। কবিকাহিনী তর্জমা ক'রে পড়ে পড়ে শোনান। শুনতে শুনতে তার অনেক অংশ মেয়েটির মুখস্থ হয়ে যায়। কবি বড়ো বয়সে এই কাব্য সম্বন্ধে যাই বলুন, আঠারো বছর বয়সে তার প্রতি তাঁর যথেষ্ট মায়া ছিল। সুদর্শন কবির প্রতি আনা খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কবিকে বললেন, "তুমি আমার একটা নাম দাও", কবি তাঁর নাম দিলেন 'নলিনী'। একটা কবিতায় ওই নামটি গেঁথে দিলেন—

"শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি।"

আনা কবির গান প্রায়ই শোনেন; সেই বাংলাগানের সুর অথবা তরুণ কবির কণ্ঠস্বর তাঁকে মুগ্ধ করে; বলেন, "তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।"

বৃদ্ধবয়সে কবি বলেছেন, "সে মেয়েটিকে আমি ভুলি নি বা তার সে আকর্ষণকে কোনো লঘু লেবেল মেরে খাটো করে দেখি নি কোনোদিন। আমার জীবনে তার পরে নানান অভিজ্ঞতার আলোছায়া খেলে গেছে, বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন, কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব ক'রে যে, কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি— তা, সে ভালোবাসা যেরকমই হোক-না কেন।"

'শৈশবসংগীত' কাব্যের কয়েকটি কবিতার মধ্যে উল্লিখিত কৈশোর-ভালোবাসার আভাস পাওয়া যায়। কবি লিখছেন, "জীবনযাত্রার মাঝে

মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না।"

১০

সত্যেন্দ্রনাথ দীর্ঘ ছুটি নিয়ে বিলাত যাচ্ছেন; তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শিশুসন্তানদের নিয়ে পূর্বেই বিলাতে চলে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মেজদাদার সঙ্গে চললেন (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর ২০)। জাহাজে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। ইতালীর ব্রিন্দিসি বন্দরে নেমে ডাঙা-পেরোনো পথে তাঁরা চললেন; আল্‌প্‌সের সুরঙ্গ পার হয়ে ফ্রান্‌সের ভিতর দিয়ে প্যারিসে এলেন। তখন সেখানে বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী চলছে। জার্মানদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হবার পর রাজতন্ত্রশাসনের অবসান করে ফ্রান্‌স্‌ নূতন প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেছে; ফরাসীদের জাগ্রত নবজীবনের সূচনায় তারা সব জাতিকে ডেকেছে প্যারিসের উৎসব-ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ সেই মহাপ্রদর্শনীর উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন।

ইংলন্‌ডে পৌঁছে তাঁরা সোজা চলে গেলেন ব্রাইটনে; সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ আছেন। কলিকাতা ছেড়ে ছয়-সাত মাসের পর স্বজনের মুখ এই দেখলেন; বিশেষতঃ ছোটো ভাইপো সুরেন ও ভাইঝি ইন্দিরাকে পেয়ে কবি খুব খুশি হলেন।

ব্রাইটনে থেকে গেলেন; সেখানকার এক পাবলিক ইস্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল। এই প্রিয়দর্শন যুবকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হতে শহরের নরনারীর দেরি হল না। নাচের সভায় নিমন্ত্রণ হয়, ভোজ-সভায় যান। কয়দিনের মধ্যে বিলাতি নাচে বেশ অভ্যাস হয়ে গেল; বিলাতি গানও অনেক শিখলেন। এইভাবে ব্রাইটনে কিছুকাল সুখেই কাটল।

এই সময় তারকনাথ পালিত একদিন সেখানে এলেন। ইনি সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু, কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যারিস্টার; তিনি বিলাতে এসেছেন তাঁর বালক-পুত্র লোকেনকে লন্‌ডনের য়ুনিভার্সিটি কলেজে পড়াবার ব্যবস্থা করতে। রবিকে এ ভাবে মফস্বলের পাবলিক

ইস্কুলে পড়তে ও বউদিদির অঞ্চলচ্ছায়ায় আরামে থাকতে দেখে সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি বললেন, এ ভাবে থেকে তো বিলাতের কোনো শিক্ষাই সে পাবে না। তখন তাঁরই আগ্রহে রবীন্দ্রনাথকে লন্‌ডনে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হল। এক ইংরেজ গৃহস্থের বাড়িতে, সে দেশের প্রথামত, টাকা দিয়ে বোর্ডার হলেন।

লন্‌ডনের য়ুনিভার্সিটি কলেজে লোকেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হল। যথাসময়ে লোকেন ভারতীয় সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করে বাংলা দেশে ফিরে যান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লোকেন রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম বন্ধুবর্গের অন্যতম ছিলেন; রবীন্দ্রসাহিত্যের এমন সমঝদার ও রবীন্দ্রনাথের এমন অনুরক্ত সুহৃৎ— বিলাত-ফেরত ঐ শ্রেণীর মধ্যে সে যুগে আর কেউ ছিল না।

য়ুনিভার্সিটি কলেজে ইংরেজি পড়াতেন হেন্‌রী মর্লি; ইনি সাহিত্যিক ও রাজনীতিক জন মর্লি, যিনি এক সময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতসচিব ছিলেন, তাঁরই ভাই। অধ্যাপক হেন্‌রী মর্লির পড়ানোর পদ্ধতি, তাঁর স্নেহ ও শাসন, রবীন্দ্রনাথকে খুবই মুগ্ধ করে। বৃদ্ধবয়সেও যখনই বিলাতের কথা অথবা অধ্যাপনার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হত কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে হেন্‌রী মর্লির কথা বলতেন, যদিও তাঁর কাছে মাস-তিনের বেশি পড়েন নি। কবি লিখেছেন, "এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন।"

লন্‌ডন-বাস-কালে পার্লামেণ্টের অধিবেশন দেখতে যান; সেখানে গ্ল্যাড্‌স্টোনের ওজস্বিনী বক্তৃতা শোনেন ও বৃদ্ধ ব্রাইট্‌কে শান্ত ভাবে বসে থাকতে দেখেন। বৃদ্ধের সৌম্যমূর্তি দূর দেশের বাঙালি যুবকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

লন্‌ডনে রবীন্দ্রনাথ যে ভদ্রলোকের বাড়ির বাসিন্দা রূপে ছিলেন তাঁর নাম স্কট। অল্পদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্কট-পরিবারের পরম আত্মীয়ের মতো হয়ে গেলেন। সেই বাড়ির দুটি মেয়ে, দুই বোন, কবির প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিল। সন্ধ্যাসংগীতের 'দুদিন' নামে একটি কবিতাতে তার ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট। কবি কবুল করেছেন যে, দুটি মেয়েই তাঁকে ভালোবাসত;

তবে তাঁর পক্ষে সেদিন সে কথা স্বীকার করবার মতো 'সৎ সাহস' হয়তো ছিল না। এক যুগ পরে, ত্রিশ বৎসর বয়সে যখন আর-একবার এক মাসের জন্য বিলাতে যান, লন্ডনে স্কটদের সেই বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁদের খোঁজে— কিন্তু তখন কে কোথায়! এ যেন "খুঁজিতে গেছিনু কবে··· মোর পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে।"

যাত্রাপথের তথা বিলাতে পৌঁছিয়ে সেখানকার বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে ও সে সম্পর্কে নানা মতামত ব্যক্ত ক'রে পত্রধারা পাঠাচ্ছেন ভারতীতে। আসলে সেগুলিকে সাহিত্যিক ডায়েরি বলা যায়— লেখা পত্রাকারে, যেমন পরবর্তী কালের 'রাশিয়ার চিঠি' 'জাভাযাত্রীর পত্র' প্রভৃতি। বিলাতে নারীসমাজের স্বাধীনতা সব থেকে বিভ্রান্ত করে ভারতীয়দের। রবীন্দ্রনাথের যে বয়স তাতে তিনি মুগ্ধ না হয়েছিলেন এমন নয়। কারণ, পত্রপ্রবন্ধগুলিতে বিলাতের নারীস্বাধীনতার ও নরনারীর অবাধ মেলামেশার সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত অকুণ্ঠিত লেখনীতে প্রকাশ পাচ্ছিল। দেশে অভিভাবকেরা বালকের এই-সকল প্রগল্‌ভ উক্তি ও মতামত পাঠ করে চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন। ভারতীর পাতায় তরুণ রবির মতামত ও তারই সঙ্গে পাদটীকা বা সংযোজনরূপে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সংরক্ষণশীল সমালোচনা একত্র ছাপা হচ্ছিল। আশি বৎসর আগের লেখা হলেও এখনও পড়তে ভালো লাগবে। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে দেশে ফিরে আসবার জন্য নির্দেশ পাঠালেন।

দেড় বৎসর বিলাতে থেকে, কোনো বিদ্যা আয়ত্ত না করে, কোনো ডিগ্রি না নিয়ে, ব্যারিস্টারি পড়া আরম্ভ না করেই রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন— তখন তাঁর বয়স বছর উনিশ।

বিলাত থেকে ফেরবার দেড় বছর পরে ভারতীতে প্রকাশিত চিঠিগুলি 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। তার ভূমিকায় লিখলেন,

এই গ্রন্থ পড়ে কারো কোনো উপকার হোক বা না হোক, একজন বাঙালি ইংলন্ডে গেলে কী ভাবে তার মতামত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তার একটি ইতিহাস পাওয়া যাবে।

সাহিত্যিক দিক থেকে এই বইয়ের বিশেষ মূল্য আছে। খুব সম্ভব

রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম ; বাংলা চলতি ভাষার সহজ-প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে অভ্রান্তভাবে বিদ্যমান।

১১

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়েছিলেন লাজুক নম্র বালক, ফিরলেন প্রগল্‌ভ যুবক। আহমদাবাদে মাস ছয়-সাতের স্থিতি ধ'রে প্রায় দুই বৎসর পরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এলেন। ঠাণ্ডা দেশের জল-হাওয়ায় বালকের স্বাস্থ্য সুন্দর এবং বর্ণ উজ্জ্বলতর হয়েছে। এখন স্বজনসমক্ষে কথা বলতে, মত ব্যক্ত করতে, বিলাতি গান শোনাতে কোনো সংকোচ নেই। এবার দেশে ফেরার পর সব থেকে আদর-আপ্যায়ন পেলেন বউঠাকুরানী কাদম্বরীদেবীর কাছ থেকে। ইনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ যখন নিতান্ত বালক তখনই বধূরূপে আসেন এ বাড়িতে। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁর মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ গিয়ে পড়েছিল দেবরের উপর। তিনি রবিকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি। রবীন্দ্রের জীবনে তিনি ছিলেন কল্যাণী ধ্রুবতারার মতো নিস্পন্দ, নির্নিমিখ। রবীন্দ্রসাহিত্যের বহু কবিতায় ও গানে তাঁর স্মৃতি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল বেশে ফুটে উঠেছে।

দেশে ফিরে দেখেন বাড়িতে হৈ হৈ ব্যাপার : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'মানময়ী' নাটক লিখেছেন, তারই অভিনয়ের আয়োজন চলছে। অক্ষয় চৌধুরী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশী ও বিলাতী সুর মন্থন ক'রে নূতন নূতন গান তৈরি করছেন। মহড়ায় রবীন্দ্রনাথ জুটে গিয়ে একটা গানও লিখে দিলেন : "আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি।" এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ মদনের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইন্দ্রের ও কাদম্বরীদেবী উর্বশীর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

এত সব উত্তেজনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের মন যেন শান্তি পাচ্ছে না। বিলাত থেকে কিছুই না করে, কিছুই না হয়ে ফিরেছেন, সে গ্লানিতে মন খুবই অবসাদগ্রস্ত। সমসাময়িক একখানি পত্রে লিখছেন, "বাংলাদেশে ফিরে এলাম। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারি দিক থেকে প্রসারিত

সহস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, আপন মনে সৌন্দর্যের মরীচিকা-রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব— এই-সমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ করে পড়ে আছি।”

বিলাতে থাকতে খুচরো কবিতা দু-চারটা মাত্র লেখেন আর ‘ভগ্নহৃদয়’ বলে একটা কাব্যের পত্তন সেখানে করেন— খানিকটা ফেরবার পথে জাহাজে ব’সে ও বাকিটা দেশে ফিরে শেষ করেন। এ লেখায় নিজেরই মনের আনন্দ হোক, বিষাদ হোক, প্রকাশ পেয়েছে— কারো কোনো তাগিদে লেখা নয়— এ কেবল আপন মনের সৌন্দর্যমরীচিকা বা বিজন স্বপ্ন অথবা অলস কবিত্বমাত্র।

কিন্তু কর্তব্যের তাগিদে বা ফর্মাশে লিখতে হল মাঘোৎসবের জন্য ব্রহ্মসংগীত। সেই সাতটি গান গীতবিতানের অন্তর্গত হয়েছে; এখন রবীন্দ্রের বয়স উনিশ বৎসর; এর পর প্রায় ষাট বৎসরের মধ্যে তিনি কত শত ব্রহ্মসংগীত বা ধর্মসংগীত যে লিখেছেন তার বিশদ বিবরণ দেওয়া কঠিন। কোনো বিশেষ দেবতার নাম না ক’রে, ঈশ্বরবিশ্বাসী সর্বমানবের গ্রহণযোগ্য ধর্মসংগীত লেখা আরম্ভ হয় ব্রাহ্মসমাজে; এ বিষয়ে ঠাকুর-পরিবারের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়, আর রবীন্দ্রনাথের দানের কোনো তুলনাই নেই।

এই বয়সের লেখা গীতিনাট্য ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’র আদর ও আকর্ষণ আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে বাংলা দেশে। ঠাকুর-বাড়িতে গানের আবহাওয়া ছিল বললে যথেষ্ট বলা হয় না— ছিল গানের ও আর্টের একটা ভরপুর পাগলামি। সচরাচর গান বেঁধে তাতে স্বর-যোজনা হচ্ছে রীতি; কিন্তু এঁদের পদ্ধতি ছিল উল্টো। এই প্রসঙ্গে কবি বলেন, “জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো-যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব-মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত।… আমি ও অক্ষয়বাবু [অক্ষয় চৌধুরী] অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথা-যোজনার চেষ্টা করিতাম।” কখনো কখনো ভগিনী স্বর্ণকুমারীও এই কাজে যোগ দিতেন।

ঠাকুর-বাড়িতে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' হয়, আসেন কলিকাতা শহরের খ্যাতনামা লোকেরা। রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফেরার পর তারই বার্ষিক অধিবেশনে একটা নাটক-অভিনয়ের কথা হল; অনুরোধ করা হল রবীন্দ্রনাথকে কিছু লিখতে। সেই তাগিদে লেখা হল 'বাল্মীকিপ্রতিভা'।

এই নাটিকার মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাব খুব স্পষ্ট; তখনকার দিনে তিনিই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার পূর্ণতা। বিহারীলালের নিকট বিষয়বস্তুর প্রেরণা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে সুরসৃষ্টি ও সুরযোজনার আনুকূল্য পেয়ে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র জন্ম হল। অভিনয় হল ঠাকুর-বাড়িতেই; রবীন্দ্রনাথ সাজলেন বাল্মীকি, বালিকা-সরস্বতীর অংশ নিলেন হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা। এই প্রতিভাদেবীর সঙ্গে পরে বিবাহ হয় আশুতোষ চৌধুরীর। পরের যুগে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়কলায় যে অসামান্যতা দেখান তার উন্মেষ দেখা গেল এই ক্ষুদ্র নাটিকা-অভিনয়ের দিন। সেদিনকার উৎসবে বিদ্বজ্জনগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র (৪৩), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৭), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (২৮) প্রভৃতি। গুরুদাসবাবু তো মুগ্ধ হয়ে একটি গান লিখলেন :

উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার
ইত্যাদি।

হরপ্রসাদ তাঁর 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের শেষ দিকটায় রবীন্দ্রনাথের আখ্যান ও কবি-আদর্শকে অনুসরণ করেছিলেন, এ কথা সমসাময়িকরা বলেছিলেন। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' পাঠ্যযোগ্য নাট্যকাব্য নয়। সংগীতের একটা নূতন পরীক্ষা— অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনলে এর কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নয়। আসলে এটি সুরে-তালে-বাঁধা নাটিকা; স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য এর অতি অল্পস্থলেই আছে। কয়েকটি গান বিলাতি সুরে ঢালা; এও একটা বড়ো রকমের পরীক্ষা।

এ ভাবে জীবন কাটাতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু, স্থির হল রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরতে হবে। এবার সঙ্গে চলেছেন ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। অদৃষ্টলিপি খণ্ডাবে কে? মাদ্রাজ পর্যন্ত

গিয়ে দুজনেরই মত বদলালো। সত্যপ্রসাদ সদ্যোবিবাহিত, সুতরাং ঘরে ফিরে আসবার একটা হৃদ্‌গত কারণ অবশ্যই থাকতে পারে; সত্যপ্রসাদ ফিরলেন বলেই রবীন্দ্রনাথকেও ফিরতে হল।

দুজনে অপরাধীর মতো দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে মুসুরীতে গেলেন। মহর্ষি কাকেও কোনো তিরস্কার করলেন না। মনে হল, তিনি খুশি হয়েছেন, আর এ ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছাই প্রত্যক্ষ করেছেন।

দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের দুখানি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল— 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড'। 'ভগ্নহৃদয়' উৎসর্গ করেছিলেন কাদম্বরী-দেবীকে বেনামে; অর্থাৎ, তিনি যে-নামে অন্তরঙ্গদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন তারই আদ্য অক্ষর দিয়ে অসম্পূর্ণ নামটি উৎসর্গপত্রে লেখা। আর দ্বিতীয় বই 'রুদ্রচণ্ড' উৎসর্গ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে; উৎসর্গ-কবিতায় বিলাতযাত্রার ভাবী বিচ্ছেদবেদনা অত্যন্ত প্রকটভাবে ব্যক্ত। আমরা পূর্বেই বলেছি, আমাদের ধারণা, এই নাট্যকাব্য এগারো-বছর বয়সে লেখা 'পৃথ্বিরাজপরাজয়ে'র সংস্করণ মাত্র— অত্যন্ত কাঁচা লেখা। এই-সব কাব্য ও নাটক তখনকার দিনের সাহিত্যিকদের কাছ থেকে বাহবা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রায় গ্যেটের ভাষাতেই পরে বলেছিলেন যে, তখন আমার বয়স আঠারো ছিল, তা নয় আমার আশেপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। গ্যেটেও বলেছিলেন "When I was eighteen all my country was eighteen—"

'ভগ্নহৃদয়' বড়ো গীতিকাব্য (৩৪ সর্গ), নাটকাকারে লিখিত। সমালোচক বলেন, "এই শিথিলবদ্ধ কাব্যে ঘটনার ত্রুটি ভাবনা দিয়া পুরাইয়া লইবার চেষ্টা 'কবিকাহিনী' ও 'বনফুলের' চেয়ে অনেক বেশি।"

'ভগ্নহৃদয়' কাব্য আজ আমরা পড়ি না। কারণ, উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনেক অবিস্মরণীয় কাব্য আমরা পেয়েছি। অথচ সে যুগে এই কাব্য কতই-না চমৎকার মনে হয়েছিল; কাব্যোৎসাহী অনেক যুবক এর বহু অংশই মুখস্থ বলতে পারতেন।

এই কাব্যপ্রকাশ উপলক্ষে মানী লোকের কাছ থেকে কবি অযাচিত

৩

আর অভাবিত সম্মান-সমাদর পেলেন। একদিন সুদূর ত্রিপুরা-রাজধানী আগরতলা থেকে এসে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের খাস মুন্‌শি রাধারমণ ঘোষ তরুণ কবির সঙ্গে দেখা করে বললেন যে, মহারাজ 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে প্রীত হয়েছেন, আর তাঁর নির্দেশে এই কথাটি কবিকে জানাতেই তিনি জোড়াসাঁকোয় এসেছেন। তরুণ কবির পক্ষে আশাতীত পুরস্কার। ত্রিপুরা-রাজাদের সঙ্গে কবির এখনো সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি— ঘনিষ্ঠতা হয় পরে। কবির মর্তজীবনের শেষ বৎসরে ত্রিপুরা-দরবার থেকে তিনি শেষ সম্মান পান— 'ভারত-ভাস্কর' উপাধি।

১২

তরুণ কবির উদ্দেশহীন জীবনের দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির পূর্বতন জমজমাট ভাবটি এখন শিথিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য দর্শন গণিত নিয়ে মগ্ন, নিজের পুত্রদের শিক্ষাদীক্ষার তদারকেও উদাসীন। সত্যেন্দ্রনাথ চাকুরির খাতিরে সপরিবারে বোম্বাই প্রদেশে প্রবাসী। হেমেন্দ্রনাথ বাড়িতে থাকেন বটে, তবে তাঁর বৃহৎ পরিবার— বহু সন্তান-সন্ততি নিয়ে কবির সেজবৌদিদি সর্বদাই বিব্রত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীদেবী নিঃসন্তান, তাই তাঁদের কাছেই রবীন্দ্রনাথের যত-কিছু আদর-আবদার। তরুণ কবির ভাবের সাধনায় ও কল্পনায় তাঁরা ছিলেন অনুকূল সুহৃৎ ও সঙ্গী। তাঁরা একবার স্বামী-স্ত্রীতে কোথায় বেড়াতে যান; রবীন্দ্রনাথ একেবারে সঙ্গীহীন হয়ে পড়লেন। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাব্যধারা অকস্মাৎ এক নূতন পথে উৎসারিত হল। এতদিন যে অভ্যাসে সংস্কারে বেষ্টিত ছিলেন, হঠাৎ সেটা খসে পড়তেই কাব্য যেন মুক্তগতি নূতন ছন্দে নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিল; সেই কাব্যগুচ্ছ 'সন্ধ্যাসংগীত'। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে এই পর্বের কবিতাগুচ্ছকে 'হৃদয়-অরণ্য' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এতদিন কবিমনের আনন্দ-বেদনা 'বনফুল' 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়'-এর নায়ক-নায়িকাদের জবানিতে প্রকাশ পাচ্ছিল, এবার নিজের ভাষায় নিজের জবানিতে প্রকাশিত হল 'সন্ধ্যাসংগীতে'। এই আত্মচেতনার কারণেই

ছন্দে এল সাবলীল গতি, দেখা দিল বৈচিত্র্য; এক মুহূর্তে কবি যেন আপনাকে খুঁজে পেলেন। এই কাব্যখণ্ডের অধিকাংশই লেখা কবির বিশ বৎসর বয়সে, সাহিত্যের বিচারে খুবই কাঁচা। রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত কাব্য-গ্রন্থাবলীতে, 'সন্ধ্যাসংগীতে'র-পূর্বে রচিত, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ছাড়া, সমস্ত রচনাই নাকচ হয়েছিল। শেষ জীবনে 'সন্ধ্যাসংগীত'কেও বাদ দিতে চেয়েছিলেন; অনেকের প্রতিবাদে সেটি করতে পারেন নি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ কাব্য পড়ে খুশি হন এবং এক দিন এক বিবাহ-সভায় দ্বারদেশে বঙ্কিমকে প্রদত্ত মালা তিনি যুবক রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করলেন, তাতে তরুণ লেখক পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

১৩

মুসৌরী থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নিলেন চন্দননগরের গঙ্গাতীরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছোটো সংসারের মধ্যে। কবি লিখেছেন, "সেই সময় আমি প্রথম অনুভব করেছিলুম যে, বাংলাদেশের নদীই বাংলাদেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে।" মধ্যজীবনে পদ্মা ও পদ্মার চর তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে যে কী পরিমাণ প্রেরণা সঞ্চার করেছিল তা আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব।

চন্দননগর-বাস-কালে রবীন্দ্রনাথ অনেক গদ্য রচনা লেখেন; 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে সেগুলি মুদ্রিত হয়। রচনাগুলি কোনো বাঁধাধরা পদ্ধতির নয়, 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতার মতো যা-খুশি তাই নিয়ে লেখা। তখন জীবনটা একটা ঝোঁকের মুখে চলছে, তাই দায়িত্বহীন ভাবনা-কল্পনার বাধা নেই।

সম্পূর্ণ নূতন জিনিসও লিখলেন, সেটা হল 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস (১৮৮১-৮২)। এটা লেখেন বিশ বৎসর বয়সে। বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) লেখা হয় মাত্র পনেরো বছর পূর্বে।

'বৌঠাকুরানীর হাট'-এর গল্পাংশ প্রতাপাদিত্যের জীবনী থেকে গৃহীত; প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপপরাজয়' (১৮৬৯) যা ছোটোবেলায় মা-বউদিদিদের

আসরে পড়ে শোনাতেন, সেই সুবৃহৎ গ্রন্থের অনুবর্তন করে এই নভেল লেখা ; কবি ঐ গ্রন্থ ছাড়াও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী নানা সূত্রে সংগ্রহ করেন।

কবি এই উপন্যাস সম্বন্ধে বড়ো বয়সে বলেছেন, "প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে" এই সময়টাতে তাঁর লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন নূতন ছবি, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে বেরোল। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল 'বৌঠাকুরানীর হাট' গল্পে। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চারিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। যাই হোক, এ গল্পটা বের হলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা করে পত্র দেন।

এই উপন্যাস-রচনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে কবি এর গল্পাংশ নিয়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক (১৯০৯) লেখেন এবং তারও বিশ বৎসর পরে সেটাকে ভেঙে লেখেন 'পরিত্রাণ' (১৯২৯), মাঝে 'মুক্তধারা' (১৯২২) নামে যে-একটা নাটক লেখেন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তার দলবল তাতে স্থান পেয়েছে। কোনো কোনো ঘটনার মিল আছে, আর স্বরূপেও অনৈক্য নেই।

ভারতীতে 'বৌঠাকুরানীর হাট' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছাপা চলছে বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ ও পুস্তক-সমালোচনা। মেঘনাদবধের উপর মনের ঝাঁজ এখনো কমে নি ; তাই এক প্রবন্ধে লিখলেন যে, মহাকাব্যের মধ্যে কোনো মহান্ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একটা মহান্ ভাব বা আদর্শ গড়ে ওঠে— মেঘনাদবধের মধ্যে তা নেই। তস্করের মতো প্রাসাদে প্রবেশ করে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করাকে মহৎ ঘটনা বলা যায় না। মেঘনাদবধ-কাব্যের নরক-বর্ণনা পাশ্চাত্য কাব্যের অনুকরণ মাত্র— কাব্যের অন্তর্গত বিষয় নয়, সম্পূর্ণ অবান্তর। সমালোচনার মধ্যে স্পষ্ট বিরোধিতা থাকলেও, ভাববার অনেক কথা আছে।

এই সময়ে 'বাউলসংগীত' নামে একখানি বইয়ের সমালোচনা-প্রসঙ্গে

দেশবাসীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বললেন, সকলে মিলে যদি এই শ্রেণীর সংগ্রহকার্যে মন দেন তবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রচুর উপকার হবে। তা হলে "আমরা আমাদের দেশের লোকদের ভালো করিয়া চিনিতে পারি, তাহাদের সুখদুঃখ আশাভরসা আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত থাকে না।" ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ স্থাপিত হলে তিনি দেশবাসীকে আর-একবার এই দিকেই দৃষ্টি দিতে বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সংগ্রহ-কার্যে প্রবৃত্ত হন। সেই থেকে বাংলা দেশে এই-সব লোকসংগীত ও ছড়ার সংগ্রহ সম্পাদন ও প্রকাশন -বিষয়ে প্রবৃত্তি। সূত্রপাত এই ভারতীর যুগে।

ভারতী প্রায় পাঁচ বছর চলছে। কিন্তু এই শ্রেণীর পত্রিকা পরিচালনা করতে গিয়ে সকলেই দেখতে পাচ্ছেন যে, একটা সাহিত্যসংসদ পিছনে না থাকলে নিয়মিত লেখা সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সকলেই অনুভব করছেন যে, বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ -প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন আছে, অথচ লিখতে গেলে পরিভাষা খুঁজে পাওয়া দায়। তাই স্থির হল যে, একাডেমি-জাতীয় একটা প্রতিষ্ঠান (কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন) স্থাপন করতে হবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গেলে তিনি বললেন, "হোমরা-চোমরাদের কাছে যেয়ো না— কাজ পণ্ড হবে।" যাই হোক, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সভা বসল ; কলিকাতার বিশিষ্ট শিক্ষিত লোকেরা এলেন ; সংবিধান রচিত হল ; সভাপতি সম্পাদক প্রভৃতি নির্বাচিত হলেন। সভাপতি হলেন বাংলার জ্ঞানবিজ্ঞানের সব্যসাচী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ; সম্পাদক কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন ও রবীন্দ্রনাথ।

কাজ করতে গিয়ে দেখেন বিদ্যাসাগরের কথাই ঠিক। দোরে দোরে ঘুরে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হল ; তিনি এক প্রবন্ধে লিখলেন, "যে বিজ্ঞ সদনুষ্ঠানকে উপহাস করে তাহা অপেক্ষা যে সরল ব্যক্তি সদনুষ্ঠানে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছে সে মহৎ।" এই সমাজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হলে পরিভাষা-প্রণয়নে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৪

'বৌঠাকুরানীর হাটে'র রচনা শুরু হয় চন্দননগরে; শেষ হল যখন তাঁরা কলিকাতার সদর ষ্ট্রীটের এক ভাড়াবাড়িতে এসেছেন। সেখানে একদিন সকালে এক অভূতপূর্ব আনন্দ-অনুভূতি হয়, সে কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বিশদভাবেই বলেছেন। ফলে "আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।" সেদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি লিখলেন— নির্ঝরের মতোই যেন স্বতঃ উৎসারিত হয়ে বয়ে চলল। এর পরে লেখেন 'প্রভাত-উৎসব'; সেটিও ঐ একই ভাবের আবেশে ও অনুধ্যানে লেখা।

কয়েক বছর পরে এক পত্রে লিখছেন, "'প্রভাতসংগীত' [কাব্যখণ্ড] আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস, সেইজন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাছ-বিচারের বাধাব্যবধান নেই। এখনো আমি সমস্ত পৃথিবীকে একরকম ভালোবাসি—কিন্তু সেরকম উদ্দামভাবে নয়।" কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন কালে (১৯০৩) এই কবিতাগুচ্ছের নামকরণ করেন 'নিষ্ক্রমণ', অর্থাৎ সন্ধ্যাসংগীতের অন্ধকারলোক বা 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে জ্যোতির্লোকের মধ্যে 'নিষ্ক্রমণ'। মস্ত একটা মুক্তি হল, নিজের থেকে নিজের মুক্তি— "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া"।

শরৎকালে (১৮৮২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের সঙ্গে দার্জিলিং গেলেন। সদর ষ্ট্রীটের বাসায় যে অনুভূতি হয়েছিল, আশা করেছিলেন, মহান্ হিমালয়ের আশ্চর্য শোভার মধ্যে তা বহুগুণিত করে পাবেন; কিন্তু সে ধ্বনি আর কানে বা প্রাণে শুনতে পেলেন না। শুনলেন ও লিখলেন 'প্রতিধ্বনি'।

এবার কলিকাতায় ফিরে উঠলেন লোয়ার সারকুলার রোডের এক বাসায়। বিদ্বজ্জনসমাগমের বাৎসরিক উৎসবটা এখনো চলছে। স্থির হল, উৎসব উপলক্ষে একটা নাটকের অভিনয় করতে হবে। ভারটা স্বভাবতঃই পড়ল রবীন্দ্রনাথের উপর; তিনি লিখলেন 'কালমৃগয়া' নাটক। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনয় হল (১৮৮২, ডিসেম্বর ২৩)। রবীন্দ্রনাথ

অন্ধমুনি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথ সাজেন। এতে যে-সব গান ছিল তার কয়েকটি বিলাতি সুরে ঢালা। 'কালমৃগয়া' দীর্ঘকাল পুনর্মুদ্রিত হয় নি, 'কালমৃগয়া'র অনেকগুলি দৃশ্য ও গান 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র নূতন সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়। আজকাল 'গীতবিতানে' (তৃতীয় খণ্ড) এবং স্বরবিতানে (ঊনত্রিংশ খণ্ড) ছাপা হয়ে 'কালমৃগয়া' শিশুমহলে অভিনীত ও আদৃত হচ্ছে।

১৫

রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন বাইশ বৎসর। এখনো সংসারে প্রবেশ করেন নি, তাই বড়োভাইদের সংসারে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীদেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চললেন বোম্বাই প্রদেশের কারোয়ারে; সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে বদলি হয়ে এসেছেন।

কারোয়ার কর্ণাটের প্রধান নগর, সমুদ্রের খাড়িতে অবস্থিত, অতি মনোরম স্থান। কারোয়ার-বাস পর্বটা কবির জীবনে ব্যর্থ যায় নি; এক দিকে কবিতা গান ও নাটক অন্যদিকে বিচিত্র গদ্যপ্রবন্ধ প্রায় যুগপৎ চলেছে। গদ্য-রচনার মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষ। কারোয়ার-বাস-কালে তাঁর এ সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা হল 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। এটি তাঁর হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়।

"বইটি কাব্যে ও নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে।"

এই সময়ে 'আলোচনা' নাম দিয়ে যে ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির হয় তার গোড়ার দিকে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র ভিতরকার ভাবটির তত্ত্বব্যাখ্যা লেখবার চেষ্টা দেখা যায়। "সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া

আলোচনা করা হইয়াছে।... আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত [২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত] আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।" এই আইডিয়াটির দুইটি রূপ— একটি অন্তর্বিষয়ী সাধনার অঙ্গ যার মন্ত্র বলা যেতে পারে "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"; অপরটি বহির্বিষয়ী কর্মসাধনার অঙ্গ, সেখানকার বাণী "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' এই দুই আইডিয়া সর্বপ্রথম একটু স্পষ্ট হয়েছে।

১৬

কারোয়ার থেকে ফিরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরা চৌরঙ্গির নিকট সারকুলার রোডের উপর এক বাগানবাড়িতে উঠলেন। বাড়ির দক্ষিণে মস্ত একটা বস্তি। রবীন্দ্রনাথের ঘর থেকে সেই বস্তি দেখা যায় ছবির মতো। সেই দৃশ্য ছাপিয়ে মনের মধ্যে যে ধ্বনি সৃষ্ট হচ্ছে তারই রূপ প্রকাশ পেল 'ছবি ও গান' কাব্যে। আর ভারতীতে বের হচ্ছে নানা প্রবন্ধ যা 'আলোচনা' নামে গ্রন্থাকারে পরে প্রকাশিত হয়। 'ছবি ও গানে'র সুর গম্ভীর, কিন্তু রেখা গভীর নয়। গদ্যপ্রবন্ধগুলি আপাতদৃষ্টিতে হালকা; কিন্তু তার ভিতরে আছে বিদ্রূপের কষাঘাত। সবটাকে ধারণায় নিতে পারলেই তৎকালীন সমগ্র মানুষটির কিছু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

'ছবি ও গানের' এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের কেশে ও বেশে, প্রসাধনে ও দেহসজ্জায় এমন-সকল ভাবাতিশয্য প্রকাশ পেত যা দেখে লোকে বলতে পারত লোকটা কবিত্বের খ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আসলে এই সময়টাতে চোখ দিয়ে মনের জিনিসকে ও মন দিয়ে চোখের দেখাকে দেখতে পাবার ইচ্ছা হয়েছিল প্রবল। দুঃখ করে বলেছিলেন যে, তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারলে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়ে উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করতে পারতেন। পুঁজি বলতে কথা ও ছন্দ। তখনো কথার তুলিতে ভাবের রেখা স্পষ্ট হচ্ছে না, কেবলই রঙ ছড়িয়ে পড়ছে চার ধারে।

গদ্যপ্রবন্ধগুলির নাম দেখলেই বোঝা যাবে কী ভাব থেকে সেগুলি

লেখা— 'লেখাকুমারী ও ছাপাসুন্দরী', 'গোঁফ ও ডিম', 'চেঁচিয়ে বলা', 'জিহ্বা-আস্ফালন', 'ন্যাশনাল ফাণ্ড', 'টৌনহলের তামাশা', 'অকালকুষ্মাণ্ড', 'হাতে-কলমে' ইত্যাদি। এই-সব প্রবন্ধে ভাষা তীক্ষ্ণ, প্রায়শই ব্যঙ্গে ও শ্লেষে পূর্ণ। তন্মধ্যে একটি রচনার বিশেষ একটি কথা স্মরণীয়। দেশের মধ্যে শিক্ষাপ্রসার সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া, **সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক**। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনোই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।" এই বাইশ বৎসর বয়সের কথা তিনি জীবনে শেষ পর্যন্ত প্রচার করেছিলেন। এইজন্যই বিশ্বভারতীতে 'লোকশিক্ষাসংসদ' স্থাপন করে বাঙালির ঘরে ঘরে বাংলায় লেখাপড়া চর্চার ব্যবস্থা করে দেন।

১৭

বাংলায় প্রবাদ আছে— জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল (১৮৮৩, ডিসেম্বর ৯) অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। সম্বন্ধ হল অপ্রত্যাশিত কুলে— ঠাকুর-বাড়ির এক অধস্তন কর্মচারির কন্যা, বারো বছর বয়সের মেয়ে। পিরালী ঘরে তখনো মেয়ে আসত যশোহর-খুলনা থেকে; এঁরাও ছিলেন সেখানকার পিরালী ব্রাহ্মণ। বিবাহ হল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। মেয়ের নাম ভবতারিণী। এ ধরণের নাম ঠাকুর-বাড়িতে অচল, তাই ইতিপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী হয়েছিলেন কাদম্বরী, এবার রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী ভবতারিণী হলেন মৃণালিনী— রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাম 'নলিনী'রই প্রতিশব্দ। যাই হোক, এই বালিকা-বধূকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে অন্য সকলের সমতুল্য করবার জন্য যথাবিধি চেষ্টা চলল; এমন-কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে লারেটো খৃস্টান স্কুলেও তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহশীল ও কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ছিলেন।

বিবাহের পাঁচ মাস পরে পরিবারের উপর দিয়ে একটা বড়োরকম ঝড় বয়ে গেল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরীদেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করলেন; কারণ অজ্ঞাত। তবে শোনা যায় পারিবারিক মনোমালিন্যই

এর কারণ। রবীন্দ্রনাথের উপর এ আঘাতটা প্রচণ্ডই হয়েছিল। রবিকে তিনি কতটা যে স্নেহ করতেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর বৌঠাকুরানীকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁর সমসাময়িক রচনা 'পুষ্পাঞ্জলি' পাঠ করলে জানা যায়; তার পরে সারা জীবন ধরেও তাঁর উদ্দেশে কত কবিতা ও গানই না লিখেছেন। কবিমানস স্থূল ও প্রত্যক্ষকে উপলক্ষ ক'রে ভাবের ও কল্পনার আকাশে 'আরো-সত্যে'র ঊর্ধ্বলোকে অনায়াসে পৌঁছে গিয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন এক জায়গায় অদ্ভুতভাবে নিরাসক্ত; তাঁর মতে "ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ"। তৎকালীন একটি কবিতাতেই বললেন:

হেথা হতে যাও পুরাতন।
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।

বারে বারে পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নূতনকে আহ্বান করেছেন। তিনি গান রচনা করে সুর দিতেন; দুদিন পরে সে সুর ভুলে যেতেন। লোকে অনুযোগ করলে বলতেন, "ভুলে যদি না যেতাম তবে তো একটাই সুর হত সব গানের, রামপ্রসাদী সুরের মতো।" বিস্মৃতি ও অনাসক্তি এ দুটোই মহৎ গুণ; নইলে স্মৃতিভারে জর্জরিত মনে নূতনের অভ্যুদয় হত না। কবিদের মন অনাসক্তির উপাদানে গড়া বলেই সাহিত্যসৃষ্টি অব্যাহত থাকে।

মৈত্রেয়ীদেবী কবির বৃদ্ধবয়সে তাঁর নিকট থেকে কাদম্বরীদেবী সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে তাঁর গ্রন্থে লিখছেন, "বিস্মিত মনে তাই ভাবি, এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পরে যে স্নেহের স্মৃতি এমন ওতপ্রোতভাবে তাঁর জীবনে জড়িয়ে ছিল, তাঁর কল্পনায় মাধুর্য বিস্তার করত, অসংখ্য কবিত্বের কেন্দ্র হত, সে না-জানি কী প্রভাবমণ্ডিত ছিল! কিংবা কবির মন তার আপন আলোতেই সৃষ্টি করে জগৎ, বাইরে তার অবলম্বন উপলক্ষ মাত্র। তবুও এ কথা মনে না করে পারা যায় না, এমন অভূতপূর্ব বিরাট প্রতিভার মধ্যে এত গভীর দীর্ঘকালস্থায়ী প্রভাব যিনি বিস্তার করতে পারেন— তিনি কম প্রতিভাশালিনী নন।"

১৮

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দটা স্মরণীয়। কেশবচন্দ্র সেন এই বৎসরের সূচনায় মারা যান। ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসের অসাধারণ ভগবৎভক্তির কথা কলিকাতায় ভদ্রসমাজের নিকট তিনি বলেন। বহু শিক্ষিত লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন।

এই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি -প্রমুখ পণ্ডিতেরা হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলে কতকগুলি আজগুবি মতামত অর্ধশিক্ষিত লোকেদের বুঝিয়েছিলেন। তাঁদের প্রতিপাদ্য ছিল যে, সমাজপ্রচলিত সমুদয় আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার বিজ্ঞানসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ মনীষীগণ অজ্ঞেয়বাদী কোঁতের কল্যাণধর্মকে হিন্দুধর্মের আদর্শ বলে প্রচার করেছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু সে যুগের বিশিষ্ট চিন্তাশীল ও ক্ষমতাবান লেখক। এঁরা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী ও হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যাকার্যে ও সমর্থনে উদ্‌গ্রীব। 'নবজীবন' ও 'প্রচার' নামে দুটি মাসিক পত্রিকা এই নবচেতনার মুখপত্ররূপে আবির্ভূত হল। উভয় পত্রিকারই বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ সাহিত্যিকেরা ছিলেন পৃষ্ঠপোষক।

এই দুই পত্রিকার কয়েকটি প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ; বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এই নিয়ে সাময়িক পত্রের আসরে বহু কথা-কাটাকাটি চলে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, "রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত সুলেখক মহৎস্বভাব এবং বিশেষ প্রীতি যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি দুই একটি কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্ত্তব্য, তবে যে কয় পাতা লিখলাম, তাহার কারণ রবির পিছনে এক বড় ছায়া দেখিতেছি।" ছায়ার অর্থ আদি ব্রাহ্মসমাজ। সুখের বিষয় এ-সব আলোচনার কথা লোকে ভুলে গেছে এবং তার বিশদ উল্লেখ আজ নিরর্থক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন—আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজ সাধারণভাবে খুবই হীনবল হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজকে পুনরায় জাগিয়ে তোলবার জন্য যুবক রবীন্দ্রনাথকে ঐ সমাজের সম্পাদক ও দ্বিজেন্দ্রনাথকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সম্পাদক নিযুক্ত করলেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজের সম্পাদক হয়ে সমাজের নানা কাজে মন দিলেন।

১৯

ব্রাহ্মসমাজের কাজই কখনো কবি-সাহিত্যিকের চরম কর্তব্য হতে পারে না ; তাঁর সাহিত্যজীবনচক্রে প্রবেশ করেছেন নূতন নূতন বন্ধু। অক্ষয় চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে নূতন বন্ধুগোষ্ঠী মিলছে— প্রিয়নাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র ছাপলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতসংকলন 'রবিচ্ছায়া' ; শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে কবি মিলিতভাবে প্রকাশ করলেন 'পদরত্নাবলী' ; আশুতোষ চৌধুরী কবির 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলি সাজিয়ে দিলেন ছাপবার জন্য।

প্রসঙ্গত বলে রাখি এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করে প্রকাশ করবেন ভেবেছিলেন ; কিন্তু কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এ নিয়ে কাজ করছেন জানতে পেরে, কবি তাঁকে তাঁর পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের বই বিজ্ঞাপিত হয়েও আর প্রকাশিত হল না।

আশুতোষ কলিকাতা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ; বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন। তাঁর মনের ভিতরে যে সাহিত্যের হাওয়া বইত তার মধ্যে সমুদ্রপারের অজানা বাগানের নানা ফুলের গন্ধ মিলিত মিশ্রিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে সেই নূতন কাব্যসাহিত্যের ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার খবর পেতেন, যেমন বাল্যকালে পেয়েছিলেন অক্ষয় চৌধুরীর কাছ থেকে, প্রৌঢ় বয়সে পেয়েছিলেন অজিত চক্রবর্তীর কাছ থেকে, শেষ বয়সে পেতেন অমিয় চক্রবর্তীর নিকট থেকে। আশুতোষ

চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদেবীকে বিবাহ করেন ; এ দিক দিয়েও নিকট আত্মীয়তার কারণ ছিল।

যৌবনে কবির সাহিত্যের নিত্যসঙ্গী ছিলেন প্রিয়নাথ সেন ; প্রিয়নাথ ছিলেন আইনব্যবসায়ী সলিসিটর্স-ক্লার্ক ; কিন্তু অন্তরে ছিলেন সাহিত্য-রসিক। "দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়ো রাস্তায় ও গলিতে তাঁর সদাসর্বদা আনাগোনা" ছিল ; তাঁর কাছে বসে "ভাব-রাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য" কবির কাছে উদ্‌ভাসিত হত। এঁদের নিয়ে কবির ঘরের কোণে আড্ডা জমে, গল্পে গানে সময় চলে যায়, বলা চলে :

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে।

২০

সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য কলিকাতায় এসে আছেন। এখন ঠাকুর-বাড়িতে অনেকগুলি শিশু ও বালক। কয়েকজন তাদের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে— দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথের পুত্র হিতেন্দ্রনাথ প্রভৃতি, আর পাঁচ নম্বর বাড়ির গগনেন্দ্র সমরেন্দ্র অবনীন্দ্র তিন ভাই। এই-সব ছেলেদের জন্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' নামে এক মাসিক পত্র -প্রকাশের সংকল্প করলেন। তিনি ভালো করেই জানতেন কাগজের সম্পাদনা তিনি করলেও তার মাসিক রসদ যোগাবেন তাঁর কনিষ্ঠ দেবর রবি। হলও তাই। রবীন্দ্রনাথের কর্মহীন জীবনে একটা কাজ জুটল। ছেলেদের জন্য লিখতে লাগলেন গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, হাস্যকৌতুক, বহু বিচিত্র রচনা।

'শিশু' নামে যে কাব্যখণ্ড আমরা এখন দেখি তার এক ঝাঁক কবিতা এই সময়ের রচনা (১২৯২), আর-এক ঝাঁক লেখা হয় আলমোড়ায় ১৩১০ সালে। এই দুই ঝাঁক কবিতা একত্র করে মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র সপ্তম খণ্ড 'শিশু' নামে প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯০৩)। শিশুমনের কথা এই যেন প্রথম বাংলাভাষায় রূপ পেল ; এ কবিতা

নীতিবচন হিতোপদেশ নয়— রূপে, রসে, ছন্দে শিশুর মন হরণের কাব্য।

ছেলেদের জন্য ত্রিপুরা-রাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাস লিখলেন 'রাজর্ষি'। 'মুকুট' নামে ছোটো গল্পটিও ত্রিপুরার কাহিনী। পরে 'রাজর্ষি'র কথাবস্তু নিয়ে 'বিসর্জন' নাটক লেখেন ও 'মুকুটে'র গল্পাংশ অভিনয়োপযোগী করে দেন।

বাংলা সাহিত্যে সব থেকে অভিনব জিনিস হল 'হাস্যকৌতুক'। কবি এর আইডিয়া পান পাশ্চাত্য শারাড (charade) -নামক একপ্রকার নাট্য-খেলা থেকে। বাঙালির এমন স্কুল নেই যেখানকার ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' নাটকের কথা না জানে এবং দু-চারটার অভিনয় না করেছে কোনো-না-কোনো উৎসবে।

বালক মাসিক পত্রের লেখার সঙ্গে সঙ্গে চলছে ভারতীতে প্রকাশিত রচনাধারা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের (১২৯২) বালকে 'মুকুট' গল্প ও শিশু-দের উপযোগী কবিতা ছাপা হয়, সেই সময়েই ভারতীতে প্রকাশিত হল 'পুষ্পাঞ্জলি' ও 'রসিকতার ফলাফল'— প্রথমটি তাঁর বৌঠাকুরানী কাদম্বরী-দেবীর স্মরণে শোকাশ্রু, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যঙ্গকৌতুক।— বহুস্তর জীবনের অদ্ভুত অনুভূতি ও আত্মপ্রকাশ।

২১

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে বাংলা দেশে হিন্দুসমাজের মধ্যে অনেক-কিছু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। পুরাতন মত ও বিশ্বাসের জীর্ণ মলিন কাঁথা ফেলে দেবার জন্য নবীন প্রগতিপন্থীদের যেমন উগ্রতা, সেই জীর্ণসজ্জায় তালি দিয়ে ও ধোলাই ক'রে পুরাতনকে বজায় রাখবার জন্য প্রবীণ 'সনাতনী'দের তেমনি মমতা। এই প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র'গুলি 'সমাজ' গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। ঠাকুরদা ও নাতির মধ্যে পত্রবিনিময়ের ছলে মতামত নিয়ে ঠোকাঠুকি। কালান্তরের হলেও, সেগুলি আজ অবধি সুখপাঠ্য। তা ছাড়া, জীর্ণতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবার লোক এখনো এ দেশে তো কম নয়।

হিন্দুসমাজের সংস্কারক ও সংরক্ষকদের মধ্যে সব থেকে মতভেদ দেখা দিয়েছে মেয়েদের বিবাহ ও শিক্ষা নিয়ে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারহেতু মেয়েদের বিবাহের বয়স যাচ্ছে বেড়ে; আট বছরে গৌরীদান করলে আর পড়াশুনা হয় না। আজ আমাদের ঘরে ঘরে বয়স্ক অবিবাহিত মেয়ে, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা হয় না। কারণ, সকলেই কাচের ঘরে বাস করেন, কে কাকে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করবেন? কিন্তু, সত্তর-আশি বৎসর পূর্বে এ-সব বিষয় নিয়ে সাহিত্যিকদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আবার তাঁদের মধ্যে ও সমাজসেবীদের মহলে পিছু-হাঁটা লোকের অভাব ছিল না, যেমন আজকেও নেই। সমাজের এই সংকটমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুবিবাহ' নামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে 'সায়েন্স এসোসিয়েশন' হলে পড়লেন; তীব্রভাবে বাল্যবিবাহসমর্থকদের মত খণ্ডন করলেন। বিবাহাদি প্রশ্ন ছাড়া সে যুগের বহু নির্বিচার মতবাদ নিয়ে যে-সব আলোচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তা সাহিত্যে স্থায়ী হয়ে থাকবে না, কিন্তু যে-সব ভ্রান্ত মতবাদের ধ্বংস এখনো হয় নি, নানা ছদ্ম নামে ও বেশে আজও সেগুলি বাঙালিকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছে বলেই আজও রবীন্দ্রনাথের লিপিবদ্ধ ভাবনা-চিন্তার যথেষ্ট মূল্য আছে।

১২৯০ সালে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন নূতন তন্ত্রসাধনা শুরু করে নাম নিলেন 'কৃষ্ণানন্দ'। শোনা গেল তিনি কল্কি অবতার! অবতার হলেই চেলার অভাব হয় না, বাঙালি তা হাড়ে হাড়ে জানে। ধর্মের নামে, অবতারের নামে, গুরুর নামে, মূঢ় ধর্মপিপাসুরা যে পরিমাণে শোষিত হয়, বোধ হয় কোনো দুরাচারী সম্রাট্ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খাজনার ব্যবস্থার দ্বারাও ততখানি রক্তমোক্ষণ করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই-সব অবাস্তব ধর্মমোহের উপদ্রব ও আস্ফালন নীরবে সহ্য করা কঠিন ছিল; তাই গদ্যে পদ্যে নাটকে প্রহসনে তিনি আক্রমণ চালালেন। একখানি পত্র-কবিতা থেকে কয়েকটি পংক্তি সংকলন করছি:

> ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে।
> ছুঁচলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
> তাঁরা বলেন, আমি কল্কি— গাঁজার কল্কি হবে বুঝি—
> অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।

'আর্যামি' নবতম শব্দ এসেছে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের নয়া আবিষ্কার আর্য জাতিতত্ত্ব থেকে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করে লিখলেন :

মোক্ষমুলার বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।
মনু নাকি ছিল আধ্যাত্মিক,
আমরাও তাই, করিয়াছি ঠিক—
এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্,
শাপ দি পৈতে ছুঁয়ে।

এই বিদ্রূপ চরমে উঠলো আরেকটি কবিতায় :

রব উঠেছে ভারতভূমে হিঁদু মেলাই ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন ভয় নেইক আর।···
লিখছে দোঁহে হিঁদু শাস্ত্র এডিটোরিয়াল
দামু বলছে মিথ্যে কথা, চামু দিচ্ছে গাল···
এমন হিঁদু মিলবে নারে সকল হিঁদুর সেরা,
বোসবংশ আর্যবংশ সেই বংশের এঁরা।···
কলির শেষে প্রজাপতি তুলেছিলেন হাই,
সুড়সুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন আর্য দু'টি ভাই,
আর্য দামু, চামু।

সুখের বিষয়, এই ব্যর্থ সংস্কারচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ বেশি সময় ও শক্তি নষ্ট করেন নি। তিনি সংস্কারক নন, তিনি কবি। মাঝে মাঝে মানবকল্যাণের কথা ভেবে যদিও বিতর্কের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন, উত্তেজনা কেটে গেলেই নিজের কবিজীবনের মধ্যেই ফিরে আসেন। তাঁর জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বারে বারেই দেখা গেছে।

২২

"জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে"। যৌবনের দায়িত্বহীন জীবন যাপন করছেন। অর্থোপার্জনের প্রশ্ন তখনো ঠাকুর-বাড়ির যুবকদের চঞ্চল করে তোলে নি। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা শহরের অভিজাত শ্রী ও শৌখিনতার মূর্তি, যুবকদের অনুকরণের ও ঈর্ষার পাত্র। আপন মনের আবেগে কবিতা লেখেন, শখ করে লেখাপড়া করেন। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলে গান করেন মজলিসে। ফরমাশ এল কলিকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশনের জন্য (১৮৮৬) গান লিখে দিতে হবে, লিখলেন, "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।" অনুরোধ এল সেটা গাইতে হবে, গাইলেন মর্মস্পর্শী মধুর কণ্ঠে।

হঠাৎ শখ হল গাজিপুরে যাবেন। এর আগে একবার শখ হয়েছিল গোরুর গাড়ি করে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা শেরশাহী সড়ক দিয়ে সোজা বেড়াতে যাবেন পশ্চিমে। শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠে নি। এবার সপরিবারে চললেন। সপরিবার বলতে বোঝায় পনেরো বছর বয়সের স্ত্রী ও এক বছরের কন্যা বেলা। এত জায়গা থাকতে গাজিপুর বাছবার কারণ কী সে সম্বন্ধে নিজে যা বলেছেন সেটাই উদ্ধৃত করে দিই—"বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার কাছে রোমান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল।··· অনেক দিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম ভারতের কোনো-এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিশুদ্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে। ··· শুনেছিলুম গাজিপুরে গোলাপের ক্ষেত। তারি মোহে আমাকে প্রবল ভাবে টেনেছিল।" গাজিপুরে এসে দেখেন সেখানে "ব্যাবসাদারের গোলাপের ক্ষেত"। সেখানে "বুলবুলের আমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই"। হারিয়ে গেল কবি-মনের রঙিন ছবি।

কিন্তু, বাইরে যা দেখতে পেলেন না ভিতরে তার অনেক বেশি পেলেন। 'মানসী' কাব্যের অনেকগুলি কবিতা এখানে লেখা হল, মোট আটাশটি। 'মানসী' কাব্যখণ্ডে দীর্ঘ তিন বৎসরের কবিতা সঞ্চিত হয়েছে সত্য, তবু 'মানসী'র প্রসঙ্গ যখনই উঠত কবি গাজিপুর-প্রবাসের কথাই স্মরণ করতেন।

এখানকার একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কবির বাসার কাছে ইংরেজ

সিভিল সার্জেনের বাসা। কবির সঙ্গে পরিচয় হলে ডাক্তার জানতে চাইলেন কবি কী লেখেন। তখন তিনি মুক্তছন্দ 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি ইংরেজিতে তর্জমা করে তাঁকে শোনান। সাহেব কী বুঝেছিলেন আমরা জানি না। তবে, ইংরেজিতে নিজের কবিতা-তর্জমার এই চেষ্টা প্রথম বলেই উল্লেখযোগ্য।

বর্ষা শুরু হলে গাজিপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরলেন। কখনো থাকেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, কখনো থাকেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে উড্‌স্ট্রীটে বা বির্জিতলার বাসায়। 'বালক' এক বছর চলে বন্ধ হয়ে গেল ; ভারতীর সঙ্গে মিশে গিয়ে নাম হল 'ভারতী ও বালক'। রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর বাহিরের তাগিদ কমে গেল।

অনুরোধ এল কলিকাতার মহিলা-প্রতিষ্ঠান 'সখিসমিতির' কাছ থেকে যে, শুধু মেয়েদের অভিনয়-উপযোগী একটা নাটক চাই। তাই লিখলেন 'মায়ার খেলা'। বাল্মীকিপ্রতিভা থেকে এ অন্য ধরণের জিনিস। এতে নাট্য মুখ্য নয় গীতই মুখ্য। ঘটনাস্রোত ক্ষীণ, হৃদয়াবেগই প্রবল। কবি যখন 'মায়ার খেলা' লেখেন তখন গানের রসেই সমস্ত মন তাঁর অভিষিক্ত হয়ে ছিল।

বেথুন কলেজ-হলে অভিনয় হয়, মেয়েরা অভিনেতা, মেয়েরাই দর্শক। মেয়েদের সে এক নূতন অনুভূতি— এমনটি পূর্বে কখনো হয় নি।

২৩

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। ছেলেমেয়ের স্কুল বন্ধ হলে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বোম্বাই প্রদেশে সোলাপুরে চলেছেন স্বামীর কাছে। রবীন্দ্রনাথও সপরিবারে তাঁর সঙ্গে চললেন। তাঁর বড়োমেয়ের বয়স আড়াই বছর, শিশুপুত্র চার মাসের। পৃথক্ সংসার পাতার মতো স্ত্রীর বয়স নয়, আর দুটি শিশু নিয়ে সম্ভবও নয়। তাই মেজদাদার সংসারটাই বড়ো রকমের আশ্রয়।

সোলাপুরে এঁরা মাসখানেক থাকেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'রাজা ও রানী' লেখা হয়। এই নাটক এক সময়ে বাংলা নাট্যমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। বহু বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, নাটকটা

তাঁর মনোমত নয়। তার কারণ, "এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল— এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি"। নূতন করে লিখতে গিয়ে 'রাজা ও রানী'র সংস্কার হল না, হল 'তপতী'র সৃষ্টি। যথাস্থানে সে কথা আসবে।

সোলাপুর থেকে তাঁরা আসেন পুণায়; থাকতেন খিড়কির শহরতলির এক বাড়িতে। পুণায় এসে নূতন এক অভিজ্ঞতা হল। একদিন বিদুষী রমাবাঈয়ের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। স্ত্রীলোকের অধিকার ও শক্তি সম্বন্ধে রমণীকে বক্তৃতা করতে শুনে মহারাষ্ট্রীয় বীরপুরুষেরা আর থাকতে পারলেন না; তাঁরা পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন— তর্জন-গর্জনে অবলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে অভিভূত করে জয়গর্বে বাড়ি ফিরে গেলেন। "বর্গীর উৎপাতে বক্তৃতা আর হয়ে উঠল না"। এই ঘটনা দর্শনের পর রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে নারীপ্রগতি ও নারীর মুক্তি-আন্দোলন নিয়ে অনেক আলোচনা করেছিলেন (ভারতী, আষাঢ় ১২৯৬)।

২৪

সোলাপুর থেকে ফিরলেন বর্ষার মাঝামাঝি সময়ে। 'রাজা ও রানী' প্রকাশিত হল (২৫ শ্রাবণ ১২৯৬)। রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভাবছিলেন দিন এ ভাবেই যাবে। তা হল না।

দেবেন্দ্রনাথের বয়স হচ্ছে; তিনি দেখলেন, রবিকে কোনো কাজের মধ্যে টানতে না পারলে আর চলবে না। জমিদারির কাজকর্ম কাউকে তো দেখতেই হবে। বড়োছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক মানুষ, বৈষয়িক কাজের পক্ষে অযোগ্য। কর্তব্যবোধে জমিদারির কাজ দেখতে গিয়ে দান ক'রে, খাজনা মকুব ক'রে, লোকসান ঘটিয়ে ফিরে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথ সরকারী কাজে দূরে থাকেন; ছুটিতে আসেন কয়দিনের জন্য, তাঁর পক্ষে জমিদারি-তদারক সম্ভবপর নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিঃসন্তান— সংসারের কাজে তাঁর আঁট কম— ভোগ করবে কে? হেমেন্দ্রনাথ গতায়ু; বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ বায়ুরোগগ্রস্ত। সুতরাং পুত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জমিদারি দেখবার মতো আর কেউ নেই।

জমিদারির কাজ শেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে কলিকাতার সেরেস্তায় বসতে হল। পরে উত্তরবঙ্গে ও শিলাইদহে যেতে হল; সেখানে নদীর ঘাটে নৌকায় থাকেন। জীবনের নূতন অভিজ্ঞতা মন্দ লাগছে না। লিখছেন, "পৃথিবী বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়।" নূতন পরিবেশে নূতন রচনা লেখবার প্রেরণা পেয়েছেন চিরকাল। সাজাদপুরের নির্জন কুঠিতে সেই সুযোগ ছিল; এখানে বসে লিখলেন 'বিসর্জন' নাটক (মাঘ-ফাল্গুন ১২৯৬)। উৎসর্গ করলেন ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে; তিনিই একখানি খাতা বেঁধে খুল্লতাতের হাতে দিয়ে একটা নাটক রচনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উৎসর্গপত্রে আছে:

তোরই হাতে বাঁধা খাতা
তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে।

বালকে প্রকাশিত 'রাজর্ষি' (১২৯২) উপন্যাসের প্রথমাংশ নিয়ে 'বিসর্জন' লেখা হয়। নাটকের কতকগুলি চরিত্র নূতন, যেমন, গুণবতী অপর্ণা নয়নরায় চাঁদপাল প্রভৃতি। রাজর্ষির 'বিল্বন' বিসর্জন নাটকে অনুপস্থিত; এরকম আরো আছে।

'বিসর্জন'-প্রকাশ নিয়ে মন যখন উত্তেজিত ঠিক সেই সময়ে রাষ্ট্রনীতির কালবৈশাখী এসে সাময়িকভাবে সমস্ত ওলটপালট করে দিয়ে গেল। ১৮৯০ অব্দ। বিষয়টা হচ্ছে এই— বড়োলাটের কর্মসংসদে মুষ্টিমেয় সদস্য থাকেন, তার অধিকাংশই ইংরেজ, সেখানে ভারতীয়দের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে কি না সেটাই ছিল সেদিনের বৃটিশ শাসকদের প্রশ্ন। এ ছাড়া সরকারি উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের ঔচিত্য সম্বন্ধেও ইংরেজ মহলে গবেষণা চলছিল।

রবীন্দ্রনাথ ভারত-সরকারের নীতির প্রত্যক্ষ সমালোচনা করে 'মন্ত্রী-অভিষেক' প্রবন্ধ পড়ে এলেন এমারেল্ড থিএটারে (১৫ মে ১৮৯০)। তাঁর কথা হল "গবর্মেণ্টের দ্বারা মন্ত্রীনিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রী-অভিষেক অনেক কারণে আমাদের নিকট প্রার্থনীয় মনে হয়"— অর্থাৎ ডিমক্রেসির পক্ষে প্রবল ওকালতি। এই প্রবন্ধপাঠের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর

পরে কবি লিখেছিলেন, "যখন মন্ত্রী-অভিষেক লিখেছিলুম তার পরে এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে··· তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচাতুম—পায়ের শিকল আরো ইঞ্চিখানেক লম্বা করে দেবার জন্য। আজ বলছি দাঁড়ও নয়, শিকলও নয়—পাখা মেলব অবাধ স্বারাজ্যে। তখন সেই ইঞ্চি-দুয়েকের মাপের দাবি দিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখরাঙানির জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ ছিল আমার ওকালতি সেকালের পরিমিতভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে।"

২৫

নগরের উত্তেজনা কেটে যেতেই কবি চলে গেলেন বোলপুরে; সেখানে মাঠের মধ্যে 'শান্তিনিকেতন' নামে যে-একটা দোতলা বাড়ি ছিল সেটাকে কেন্দ্র করে দুই বৎসর পূর্বে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৯ অক্টোবর ১৮৮৮) এবং তারও কিছু পূর্বে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে মহর্ষির ন্যাসপত্র সম্পাদিত হয়েছিল (৮ মার্চ ১৮৮৮)। মন্দির তখনো নির্মিত হয় নি।

আজ থেকে সত্তর বৎসর পূর্বের শান্তিনিকেতন এখন কল্পনায় আনা যায় না। 'শান্তিনিকেতন' দ্বিতল গৃহটি ছাড়া এই তেপান্তর মাঠে আর কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। বোলপুর থেকে আসবার পথের ধারে দু-পাঁচখানা চালা-ঘর ছাড়া কিছু চোখে পড়ত না। এবার শান্তিনিকেতনে আসার পর কবির সঙ্গে কাব্যলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ হল; কয়েকটি কবিতা লেখেন, তার মধ্যে বিশেষ-ভাবে স্মরণীয় 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত'।

বোলপুর থেকে জমিদারিতে যেতে হল। কিন্তু সেখানে মন বসছে না। নীরবে শুনতে হয় মৌলবীর 'বক্তৃতা', নায়েবের কৈফিয়ত, প্রজাদের নালিশ-ফরিয়াদ— তারই মধ্যে সময় পেলে পড়তে চেষ্টা করেন গ্যেটের ফাউস্ট, মূল জর্মানের সঙ্গে মিলিয়ে। পড়া এগোয় না এই প্রতিকূল আবহাওয়ায়। একটা নাটকের খসড়া করলেন; তাও এগোচ্ছে না। মন উড়ু-উড়ু।

চললেন সোলাপুরে মেজদাদার কাছে। সেখানে গিয়ে শোনেন,

তিনি ও লোকেন পালিত বিলাত যাচ্ছেন ফার্লো নিয়ে। কবির মন উধাও হল, সঙ্গ নিলেন তাঁদের। 'উচ্ছৃঙ্খল' কবিতায় নিজের মনের কথাই যেন ব্যক্ত করেছেন :

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ,
অনিয়ম শুধু আমি।...
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে,
কত কাজ করে কত কলরবে,
চিরকাল ধরে দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী,
শুধু আমি নিজ বেগ সামালিতে নারি,
ছুটেছি দিবসযামী।

এটি নিছক কাব্য নয়, রবীন্দ্রজীবনের যথার্থ তথ্য। স্বীকার করতেই হয়—যখন যে ভাবেই বলুন "আমি সুদূরের পিয়াসী", সে কথা তাঁর বর্ণে বর্ণে সত্য।

এবারকার বিলাত-সফর (২২ অগস্ট - ৩ নভেম্বর ১৮৯০) সাড়ে তিন মাসের। তার মধ্যে বেয়াল্লিশ দিন যেতে আসতে জাহাজে কাটে ; লন্ডনে বাসকাল এক মাস মাত্র। হঠাৎ বিলাত-যাত্রার কারণও যেমন মনের অস্থিরতা, হঠাৎ ফিরে আসার কারণও তেমনি রহস্যময়। এই সাড়ে তিন মাস সফরের ফলে বাংলাভাষা পেল 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' নামে একটি রোজনামচা। এমন সরস রচনা বহুকাল বের হয় নি।

সম্প্রতি 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' নূতন কলেবরে বের হয়েছে। এই সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ছাড়া ডায়ারির মূল 'খসড়া'টিও পরিশিষ্টে সংকলিত হওয়ায় রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুগণ বিশেষ উপকৃত বোধ করবেন। 'সাধনা'য় বা প্রথম সংস্করণের গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাবনা চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে একটি পরিচ্ছন্ন সাহিত্যিক বেশে উপস্থিত করেছেন—অর্থাৎ সে স্থলে আমরা প্রধানতঃ কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথেরই সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু এই নূতন প্রকাশিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে (অর্থাৎ মূল ডায়ারি থেকে) ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভেরও সুযোগ হয়। 'য়ুরোপযাত্রীর

ডায়ারি'র 'ভূমিকা' অংশে (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপযাত্রীর প্রথম খণ্ডরূপে প্রচারিত) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম তুলনামূলক আলোচনা পাঁওয়া যায়। কাল-বদলের হাওয়ায় বাঙালি তথা ভারতীয়দের সমাজ ও সংস্কার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে ; তবু রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে পুরাতন মন্তব্যাদি আজও কালাতিক্রম-দোষে দুষ্ট হয় নি। আজও তা থেকে অনেক ভাববার বিষয় পাওয়া যাবে।

বিলাত থেকে ফিরে আসার পর পূর্ব কয়েক বৎসরের মধ্যে রচিত কবিতাগুলি সংকলন ক'রে 'মানসী' প্রকাশ করলেন (ডিসেম্বর ১৮৯০)। 'মানসী' কাব্য কেবল যে রবীন্দ্রমানসের নূতন রূপায়ণ তা নয়, বাংলা ছন্দেরও পরম মুক্তি ও স্বচ্ছন্দ গতি। এই কাব্যে 'উপহার' বলে একটা কবিতা আছে, কিন্তু সে যে কার উদ্দেশে রচিত তা বলা কঠিন। মৃণালিনী দেবীর উদ্দেশে হতে পারে, নাও হতে পারে।

৬২

১৮৯১ খৃষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন ত্রিশ বৎসর। তিন বৎসর পূর্বে এই ত্রিশ বৎসর বয়সের আগমন সম্বন্ধে লিখেছিলেন, ত্রিশ অর্থাৎ ঝুনো-অবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে। শস্যের সম্ভাবনা নেই বলে আপশোষ করেছিলেন সেই সাতাশ বৎসর বয়সে। এখন ত্রিশ বৎসর এল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য।

জমিদারিতে যাওয়া-আসা চলছে ; স্থায়ীভাবে থাকছেন না। কলিকাতার মায়ায় ও মোহে সেখানে প্রায়ই আসছেন। একবার এসে শোনেন বন্ধুমহলে নতুন এক সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশের আয়োজন চলছে ; তিনিও খুব উৎসাহের সঙ্গেই যোগ দিলেন। বন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে লিখছেন, "আমাদের 'হিতবাদী' বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্ছে। একটা বড়ো রকমের কোম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্ছে।" নানা বিভাগের ভার নানা লোকের উপর অর্পিত হয় ; রবীন্দ্রনাথ হন সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক।

নূতন পত্রিকার প্রেরণায় লেখনীতে বান এল; ছোটোগল্পের সূত্রপাত হল সাপ্তাহিক হিতবাদীর কল্যাণে। ভারতীতে ছোটোগল্পের আভাস ছিল 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা'র মধ্যে। এবার ছোটোগল্প পরিণত রূপ নিল। পল্লীগ্রামের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে গত কয়েক বৎসরে রবীন্দ্রনাথের অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে— সাধারণ মানুষকে, গ্রামের মানুষকে দেখবার সুযোগ তো পূর্বে পান নি। এখন তাদের দেখছেন, জানছেন, তাদের বুঝতে চেষ্টা করছেন। সেই অভিজ্ঞতা সেই সহজ দরদ থেকে এবারকার ছোটোগল্পগুলি লেখা হল। পল্লী-অঞ্চলের দেখা-শোনা লোকই গল্পের পাত্রপাত্রী। সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে গল্প বাংলাসাহিত্যে এই প্রথম। তাদের সুখদুঃখ হাসিকান্না ইতিপূর্বে এমন করে কেউ বলে নি।

হিতবাদীতে পর পর বের হয় ছয়টি গল্প— 'দেনা-পাওনা' 'গিন্নি' 'পোস্ট্-মাস্টার' 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' 'ব্যবধান' ও 'রামকানাইয়ের নিবু্দ্ধিতা'। গদ্য-রচনার মধ্যে 'অকাল বিবাহ' নামে প্রবন্ধটি সাহিত্যের বাজারকে বেশ গরম করে তুলেছিল। লেখাটি চন্দ্রনাথ বসুর বিবাহ-বিষয়ক মতবাদ নিয়ে কথা-কাটাকাটি। এই প্রবন্ধে কবি বলেন যে, অকাল বিবাহ বলতে শুধু যে মেয়েদের অসময়ে বিবাহ বুঝায় তা নয়, পুরুষ যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না ক'রে বিবাহ করে তবে অকাল বিবাহ বলতে হবে।

কয়েকমাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "দেশের আর্থিক অবস্থায় এমন পরিবর্তন হয়েছে যে··· আমাদের একান্নবর্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মতো বোধ হচ্ছে। সেই সঙ্গে ক্রমশঃ আমাদের স্ত্রী-লোকদের অবস্থা পরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে।··· স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তিত না হলে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে ইংরেজি যে জানে এবং ইংরেজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মতো দাঁড়াচ্ছে অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস ও কাজ আর-এক জনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন।" রবীন্দ্রনাথের এই-সব মত সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'য়ুরোপীয় ছাঁচের প্রকৃতি' দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ

সম্বন্ধে চন্দ্রনাথের এই উক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে আধুনিকতাকে গ্রহণ করবারও একটা প্রেরণা ছিল; তাকে য়ুরোপীয় ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? রবীন্দ্রনাথ বললেন, "হিন্দুপ্রকৃতির সহিত য়ুরোপীয় প্রকৃতির কোনো বিরোধ নাই, কেবল বর্তমান কালের হীনদশাগ্রস্ত ভারতের নির্জীব গোঁড়ামি ও কিম্ভূতকিমাকার বিকৃত হিন্দুআনিই যথার্থ অহিন্দু।"

২৭

হিতবাদীর সঙ্গে কবির সম্পর্ক ছিল মাস-তিনেক মাত্র। কর্তৃপক্ষের ফর্মাশমত সারবান সাহিত্য লিখতে কবি নারাজ হলেন। পত্রিকার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেলে বোধ হয় ব্যঙ্গ করে লিখলেন 'সাহিত্যের নমুনা' 'প্রত্নতত্ত্ব' প্রভৃতি রচনা। এগুলি প্রকাশিত হয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি -সম্পাদিত নূতন 'সাহিত্য' (১২৯৮) মাসিকপত্রে; এগুলিতে ঠেস্ ছিল বস্তুবাদী সাহিত্যের আদর্শ সম্পর্কে।

কলিকাতায় স্থির হয়ে থাকা হয় না— বার বার যেতে হয় উত্তরবঙ্গে জমিদারি-তদারকে। একবার যেতে হল উড়িষ্যায়। উড়িষ্যায় নীলমণি ঠাকুর কর্ম উপলক্ষে থাকার কালে সেখানে অনেক ভূসম্পত্তি খরিদ করেছিলেন। সব সম্পত্তি এখনো পর্যন্ত এজমালিতে আছে। এজমালি বলতে বুঝায় দেবেন্দ্রনাথের অনুজ স্বর্গত গিরীন্দ্রনাথের অংশ, কালে যার মালিক হন গগনেন্দ্রনাথেরা। তাঁদের অংশের বাড়ি ছিল পাশেই পাঁচ নম্বরে, এখন যেখানে হয়েছে রবীন্দ্রভারতী। দেবেন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বেই গিরীন্দ্রনাথ-পুত্রদের অংশের জমিদারি পৃথক্ করে দেন; তবে ভ্রাতুষ্পুত্রদের অকালমৃত্যু হলে গগনেন্দ্রপ্রমুখ নাবালকদের সম্পত্তি এজমালিতে দেখাশোনার ব্যবস্থা করেন। উড়িষ্যার জমিদারি পড়েছিল হেমেন্দ্রনাথদের অংশে। হেমেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পর তাদের অংশও মহর্ষি পৃথক্ করে দেন। তবে সমস্ত দেখাশুনা চলত একই দপ্তর থেকে। এই-সব কাজের তাগিদে রবীন্দ্রনাথকে উড়িষ্যা যেতে হল। আজকাল তো হাওড়ায় রাত্রের ট্রেনে চাপলেই সকালের মধ্যে কটক পুরী পৌছনো যায়। কিন্তু তখন রেলপথ নির্মিত হয়

নি ; নদী ও খাল -পথে স্টিমার ও নৌকা ছিল যানবাহন, আর ছিল হাঁটাপথ শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত।

'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে উড়িষ্যা-সফরের অতি সুন্দর ও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। পাণ্ডুয়া নামে এক গ্রামে কাছারিবাড়িতে এসে কয়দিন থাকলেন। সেই নিরালায় বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র খসড়া করলেন (২৮ ভাদ্র ১২৯৮)। কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে 'অনঙ্গ-আশ্রম' নামে নাটকের ভাবটা ঘুরছিল।

উড়িষ্যা থেকে ফিরেই উত্তরবঙ্গে আবার যেতে হয়েছে জমিদারির কাজে। বোধ হয় ভালো লাগছে না এ ভাবে কলিকাতার সমাজ থেকে নির্বাসন। নৌকায় আছেন ; এক দিন লিখছেন, "উপবাস করে আকাশের দিকে তাকিয়ে অনিদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক ক'রে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যহৃদয়কে কথায় কথায় বঞ্চিত ক'রে, স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাই নে।... দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা আমার কাজ নয়।"

এটি ত্রিশ বৎসর বয়সের সুস্থ সবল যুবকের মনের ভাবনা— এই তাঁর চরম বাণী কি না, অথবা এ বাণীর দূরগামী তাৎপর্য কী, তা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের আলোচনায় ক্রমশ পরিস্ফুট হবে।

২৮

উড়িষ্যায় ও উত্তরবঙ্গে ঘুরে পূজার সময়ে কলিকাতায় ফিরে দেখেন ভ্রাতুষ্পুত্রেরা বাড়ি থেকে একখানা মাসিক পত্রিকা বের করবার আয়োজনে ব্যস্ত। উদ্যোক্তাদের অগ্রণী সুধীন্দ্রনাথ— দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র। বি. এ. পাস করেছেন, সাহিত্যের রসজ্ঞতা বেশ আছে ; তিনি হলেন সম্পাদক। তবে ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সকলেই জানেন যে পত্রিকার খোরাক জোগাবেন 'রবিকা'। পত্রিকা প্রকাশের সংবাদটায় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ খুবই দেখা গেল। কারণ, তাঁর ইচ্ছা একখানা কাগজকে সকল দিক থেকে মাসিকপত্রের আদর্শস্থানীয় করে তোলেন। অনেক কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার অথচ বড়ো লেখকেরা সবাই নীরব ; আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পুরাতন কথাই নূতন ক'রে

সাজিয়ে সাহিত্যের বাজারে ফেরি করছেন। সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য বৈচিত্র্য ও সত্য লোপ পেতে বসেছে। তাই দিন-কতক খুব কঠিন কথাই পরিষ্কার ক'রে বলার দরকার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের কথা পরে 'সবুজপত্রে'র যুগেও বলেছিলেন।

১২৯৮ অগ্রহায়ণে বিচিত্র রচনা নিয়ে 'সাধনা' প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথের রচনাই বেশি— গল্প, ডায়ারি, প্রবন্ধ, পুস্তকসমালোচনা প্রভৃতি। এক বৎসরে (১৮৯১-৯২) এগারোটি গল্প লিখলেন— বলা যেতে পারে হিতবাদীর গল্পধারার অনুক্রমণ। অধিকাংশ গল্পই ট্রাজেডি। প্রথম গল্প 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'— প্রমত্তা পদ্মার ছবি দিয়ে কাহিনীর আরম্ভ, মানুষের ব্যর্থ জীবনের বেদনায় তার শেষ। 'সম্পত্তিসমর্পণ' 'কঙ্কাল' 'জীবিত ও মৃত' 'স্বর্ণমৃগ' 'জয়পরাজয়'— সবই ট্রাজেডি। 'দালিয়া' ইতিহাসের ক্ষীণধারা অবলম্বনে রচিত— নিদারুণ পরিণামের কাছাকাছি এসে মেলোড্রামাটিক-ভাবে মিলনান্ত হয়েছে। (এই গল্পটিকে কেন্দ্র করে বিলাতে একজন ইংরেজ নাটক লেখেন *The Maharani of Arakan*; সেখানে তার অভিনয়ও হয়।) 'ত্যাগ' গল্পের মধ্যে নায়ক আশ্চর্য সাহস দেখিয়ে অভিভাবককে বললেন যে, তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করবেন না, তিনি জাত মানেন না। আমরা বলব, "জাত মানি না", এ কথা বলায় লেখকেরও সংসাহস প্রকাশ পেয়েছিল; কারণ, আদি ব্রাহ্মসমাজ পর্যন্ত 'জাত' মেনে চলতেন এবং রবীন্দ্রনাথও বহুকাল সে সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন নি।

বৃদ্ধবয়সে কবি 'মুক্তির উপায়' গল্পটির নাট্যরূপ দেন। আর, 'একটি আষাঢ়ে গল্প অবলম্বনে' 'তাসের দেশ' লেখেন, সেও শেষ বয়সে।

২৯

অগ্রহায়ণ মাসে সাধনা বের হল। পৌষ মাসে বোলপুর-শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল (৭ পৌষ ১২৯৮); উৎসবে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়ে গান করেন; কিন্তু উপাসনাদি ব্যাপারে এখনো জড়িত হন নি। এর ঠিক দশ বৎসর পরে ঐ দিনে কবি সেখানে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন (১৩০৮)।

উৎসবের পরে তাঁকে আবার যথারীতি জমিদারিতে যেতে হয়েছে। বহুদিন কাব্যলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ মেলে নি। গত বৎসর 'মানসী' প্রকাশিত হয়েছিল (পৌষ ১২৯৭)। এবার শিলাইদহে ফাল্গুন মাসে ভরা বসন্তের দিনে হঠাৎ লিখলেন "গগনে গরজে মেঘ ঘনবরষা" ; যদিও কোথাও বিন্দুমাত্র বারিপাতের লক্ষণ নেই। রসের বানে সোনার তরী ভেসে এল।

কী কুক্ষণে 'সোনার তরী' কবিতাটি লিখলেন! এই একটি কবিতা নিয়ে বাংলা সাময়িক সাহিত্যে যে পরিমাণ অমৃত ও গরল মথিত হয়ে উঠেছিল, তা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি রচনা সম্বন্ধে কী পূর্বে কী পরে কখনো হয় নি। আশ্চর্যের বিষয় সমালোচনার ঝড় বয়েছিল বহু বৎসর পরে। আসলে কবিতা উপলক্ষ মাত্র, কবিই আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেশের শিক্ষিত-সমাজের বড়ো একটা অংশ স্বীকার করে নিচ্ছিল বলেই আর-এক দলের পক্ষে সেটাকে হেয় প্রমাণ করবার একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল।

'সোনার তরী'র অনেক কবিতা লেখা হয় এই সময়ে। সঙ্গে সঙ্গে চলছে সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ, অর্থাৎ গল্প ও নানা বিষয়ে গদ্যরচনা। কিন্তু যত লেখাই লিখুন, কবিতা লিখতে পারলেই মনটা ভরে—"একটা কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয়, হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না।"

৩০

১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। কলিকাতায় 'ভারতীয় সংগীতসমাজ' স্থাপিত হল। এই সমাজ একাধারে বিলাতি ঢঙের ক্লাব ও ধনীদের বৈঠকী মজলিস। এতকাল সংগীত ও অভিনয় আবদ্ধ ছিল ধনীজনের শৌখিন আসরে ; সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। পরে বীণাবাদিনী আশ্রয় পেয়েছিলেন পেশাদারী থিএটার-মহলে ; সেখানে অবশ্য পয়সা থাকলে কারো প্রবেশাধিকারে কেউ বাধা দিতে পারত না। বড়োলোকের দরবার ও পেশাদারের থিএটার উভয় থেকেই দূরে সরিয়ে এনে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতন যুগের তাগিদে সংগীতসমাজের বা শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্তদের এই ক্লাবের জন্ম হল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ থেকেই এই সমাজের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। এখানে অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'গোড়ায় গলদ' প্রহসন। নিজেই তালিম দেন— বিলাত-ফেরত বাঙালি-সাহেবদের অভিনয় শেখানো, সে বড়ো সহজ কাজ নয়। উচ্চারণ ঠিক করা, ভাবভঙ্গি শেখানো— স্রোতের উজানে নৌকা ঠেলার মতোই কঠিন।

'গোড়ায় গলদে'র পাণ্ডুলিপি থেকে মহড়া হচ্ছে; প্রয়োজনমত অদল-বদল চলছে। অভিনয়কালে শেষ অঙ্কের শেষে খুব কৌতুককর ঘটনা ঘটল। চন্দ্রবাবু যুবকদের বললেন যে, তাঁদের সভায় রবিবাবু আসছেন। সত্যই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে কোমরে চাদর জড়িয়ে গান ধরলেন:

ওগো, তোমরা সবাই ভালো,
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে সেই আমাদের ভালো—
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।

এই আকস্মিকতার জন্য উপস্থিত সামাজিকেরা আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না; সুতরাং তাঁদের আনন্দ অকল্পনীয়।

'গোড়ায় গলদ' ছাপা হল ১২৯৯ ভাদ্র মাসে, সেই মাসেই 'চিত্রাঙ্গদা' মুদ্রিত হয় অবনীন্দ্রনাথের হাতে চিত্রাঙ্কিত হয়ে[১]; শিক্ষানবীশ অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আগ্রহে ছবিগুলি আঁকেন। রবীন্দ্রনাথ বইখানি উৎসর্গ করেন তরুণ অবনীন্দ্রকে।

৩১

জমিদারিতে যথাসময়ে যান; সেখানে পাঁচরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, পাঁচরকম লোকের সঙ্গে মিশতে হয়— সমস্তটা মিলিয়ে খুব খারাপ লাগে না। নৌকায় করে ঘুরতে ঘুরতে এলেন রাজশাহী। সেখানে তখন লোকেন পালিত জেলা-জজ। লোকেন বাল্যবন্ধু, সাহিত্যের সমঝদার ও একান্ত-সৌন্দর্য-উপাসক। সাধনার পৃষ্ঠায় দুই বন্ধুর মধ্যে সাহিত্য সম্বন্ধে যে পত্রবিনিময় হয়েছিল তা এতকাল পরেও পাঠের অযোগ্য বলে গণ্য হবে না।

এই সময়ে রাজশাহীতে আছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যিনি 'সিরাজদ্দৌলা'

১ 'চিত্রাঙ্গদা'র এই বিশেষ সংস্করণটি সম্প্রতি (ভাদ্র ১৩৭৩) বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ করেছেন।

ও 'মীরকাসেম' সম্বন্ধে বই লিখে অমর হয়েছেন। আছেন আরো অনেক সাহিত্যিক। তাঁদের অনুরোধে 'শিক্ষার হেরফের' নামে প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথ 'রাজশাহী এসোসিয়েশন'-এ পাঠ করলেন (১৮৯২)।

ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান সম্বন্ধে এমন আর কোনো সুচিন্তিত আলোচনা হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। দেশের লোকে যখন ইংরেজি-রচনার মহামোহে আচ্ছন্ন আর তারই তারিফ করতে ব্যস্ত, বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুপারিশ করা তখন অত্যন্ত সাহসিকের কাজ সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ বললেন, বিশ-বাইশ বৎসর পর্যন্ত যে ইংরেজি শিক্ষা আমরা পাই তা আমাদের মনের বহিরাবরণরূপেই থাকে, বিদ্যা ও ব্যবহারের মধ্যে দুর্ভেদ্য ব্যবধান ঘোচে না—সে শিক্ষায় কোনো জৈব প্রক্রিয়ায় জীবনের প্রয়োজনীয় কোনোরূপ ভাবান্তর বা রূপান্তর ঘটে না। রবীন্দ্রনাথের মতে এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান হতে পারে যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন হয় শিক্ষার সর্বস্তরে আর দেশের সর্বত্র।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে শিক্ষাসংক্রান্ত বিচিত্র প্রশ্নের আলোচনা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু লেখককে তাঁর বলিষ্ঠ-যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে পত্র দিলেন। কিন্তু সাধারণ দেশবাসী তাতে সাড়া দিল না ; আর ইংরেজ সরকারের কানে এ-সব কথা পৌঁছল না বললেই চলে।

রাজশাহী থেকে নাটোরের জমিদার, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করলেন কবি। আটক পড়লেন দারুণ দাঁতের ব্যথায়। কবি ব'লে রেহাই দেয় না রোগ। যা হোক, শিলাইদহে ফিরলেন, কিন্তু "প্রাণে গান নাই"—কবিতাও আসছে না। এক পত্রে লিখেছেন, "কবিতা অন্যান্য ললনার মতো একাধিপত্যপ্রয়াসিনী।··· এইজন্যে আমি কিছু মনের অসুখে আছি। বাস্তবিক এ জীবনে কবিতাই আমার সর্বপ্রথম প্রেয়সী—তার সঙ্গে বেশি দিন বিচ্ছেদ আমার সয় না।" এরই কয়দিন পরে লেখেন 'মানসসুন্দরী'—রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

'মানসসুন্দরী' নিয়ে যতই উচ্ছ্বাস করুন, বাস্তব জগতের সমস্যাকেন্দ্র থেকে তা অনেক দূরে ; মনোজগতের কল্পনা আর বাহ্যজগতের বাস্তবতার

মধ্যে মিলন হওয়া কঠিন। স্ত্রী সোলাপুর থেকে পত্র লিখলেন যে, তিনি শিশুদের নিয়ে অবিলম্বে ফিরে আসছেন, সেখানে আর ভালো লাগছে না। জায়ের সংসারে আর কতদিন থাকা যায়! কবি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন; স্ত্রীকে লিখলেন, "আমি বেশ জানি যতদিন তোমরা সোলাপুর থাকবে ততদিন তোমাদের পক্ষে ভালো হবে। ছেলেরা অনেকটা শুধরে এবং শিখে এবং ভালো হয়ে আসবে—এইরকম আমি খুব আশা করেছিলুম। যাই হোক, সংসারের সমস্তই তো নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়।"

৩২

কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সংসার পাততে হয়েছে; সোলাপুর থেকে মৃণালিনী দেবী পুত্রকন্যাদের নিয়ে ফিরেছেন। মাঘোৎসবের জন্য যথারীতি ব্রহ্মসংগীত রচনা শেষ ক'রে জমিদারি দেখবার জন্য আবার উড়িষ্যায় যেতে হল। এবার সঙ্গে চলেছেন বলেন্দ্রনাথ; ইনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ বীরেন্দ্রনাথের পুত্র। বলেন্দ্রের বয়স এখন বাইশ বৎসর; সাহিত্যে কবির সাকরেদি করছেন, বিষয়াদি কাজেও তাঁকে হাতেখড়ি দেওয়া হচ্ছে।

কটকে তাঁরা উঠলেন বিহারীলাল গুপ্তের বাটীতে। ভারতীয় সিবিল সার্বিসের দ্বিতীয় দলে ছিলেন বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিহারীলালের পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কটক থেকে স্ত্রীকে এক পত্রে লিখেছেন, "বিহারীবাবুর অনেকটা আমার মতো ধাত আছে দেখলুম; তিনি সকল বিষয়ে ভারী ব্যস্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন!··· তিনি আমার মতো খুঁৎখুঁৎ খিট্‌খিট্ করেন না—সেটা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে একটা মহা সুবিধা।"

কবি কটকে থাকতে থাকতেই, একদিন তাঁদের বাড়িতে এক ভোজ-সভায় রাভেন্‌স কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের নিমন্ত্রণ হয়; খাবার-টেবিলে বসে সাহেব-অধ্যক্ষ ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মন্তব্য করেন যেটা কবির অন্তস্তলকে বিদ্ধ করে। দেশে তখন জুরিপ্রথার সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন হচ্ছে। সাহেবের মতে ভারতীয়দের নৈতিক

জীবনের মান অত্যন্ত নিচু, এবং তারা জীবনের পবিত্রতা (sacredness of life) সম্বন্ধে উদাসীন, এজন্য জুরিপ্রথায় তাদের সংখ্যা কমানোই দরকার। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখছেন, "একজন বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে বাঙালির মধ্যে ব'সে যারা এরকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না, তারা আমাদের কী চক্ষে দেখে! সম্ভবতঃ এই দিনের কথা স্মরণ করে কিছুকাল পরে 'অপমানের প্রতিকার'-শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন। বহু বৎসর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে প্রহার করলে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' ছাত্রশাসন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন, এ প্রসঙ্গে সেটিও স্মরণীয়।

কটক থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে সকলে মিলে চলেছেন পুরী, যত পুরীর নিকটবর্তী হচ্ছেন ততই পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাচ্ছেন। হঠাৎ একটা জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘননীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল। কবি লিখছেন, "পুরীতে এসে পৌঁছে সামনে অহর্নিশি সমুদ্র দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন হরণ করছে।" কবি বিহারীলালদের সঙ্গে সার্কিট হাউসে উঠেছেন, সে-বাড়ি সমুদ্রতীরেই।

পুরী থেকে ভুবনেশ্বর মন্দির দেখতে যান; মুগ্ধ হয়ে লিখলেন, "একটা কী যেন নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে।..."

জমিদারির নানা স্থানে ঘুরছেন নৌকায়, পাল্কিতে। কাছারি-বাড়িতে থাকেন। তার মধ্যে কবিতা লিখছেন—'সোনার তরী'র কয়েকটি সেরা কবিতা এরূপ ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় লেখা।

৩৩

ফাল্গুনের (১২৯৯) শেষে কলিকাতায় ফিরে অল্পকালের মধ্যে উত্তরবঙ্গে যেতে হল; এবার সেখানে গিয়ে লিখলেন 'বিদায়-অভিশাপ' নাট্যকাব্য—কচ ও দেবযানীর কাহিনী। বাংলা সাহিত্যে এ শ্রেণীর কাব্যনাট্য-রচনা বোধ হয় এই প্রথম; আমাদের মনে হয় এটি ব্রাউনিঙের নাটকীয় ভঙ্গির

কবিতার প্রভাবে রচিত। ব্রাউনিঙের কবিতা কবি খুব ভালো করে পড়েছিলেন—বৃদ্ধবয়সে সে-সব কবিতা শান্তিনিকেতনের ছাত্র অধ্যাপকদের পড়ে শোনাতেন।

'বিদায়-অভিশাপ' যেদিন লেখেন সেদিনই এক পত্রে লিখছেন (১৩০০, শ্রাবণ ২৬) "আমি অনেক দিন থেকে ভেবে দেখেছি পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ।" সত্যই তাই। পুরুষ যদি খাপছাড়া না হবে, তবে আদর্শের অজুহাতে সুন্দরী উপযাচিকার প্রেম-নিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করে বিদায়কালে অভিশাপ মাথায় নিয়ে কর্তব্যের পাথারে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে যাবে কেন? কবির রচনার মধ্যে এ সময়ে জীবনের অনেক প্রশ্নের আলোচনা চলছিল, 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' তার সাক্ষ্য।

কলিকাতায় ফিরে দেখেন রাজনৈতিক নানা ঘটনা উপলক্ষে ভদ্রমহলে বেশ উত্তেজনা। রবীন্দ্রনাথ এ-সব থেকে আপনাকে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। এই-সব সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি প্রবন্ধ এই সময় থেকে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; পুরাতন ভারতীর মধ্যেও কতকগুলি আধা-রাজনৈতিক প্রবন্ধ আছে। তবে তখন বয়স কাঁচা—গভীরভাবে, গম্ভীরভাবে আলোচনা করার মানসক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি। সাধনার প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ ইংরেজ-রাজনীতির সমালোচনা—গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি উপস্থিত করবার অভিজ্ঞতা এখনো অর্জিত হয় নি, সে হবে আংশিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পর্বে। যথাস্থানে তার আলোচনা করা যাবে।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ১৮৯৩ বা ১৩০০ সাল। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ১৮৬১ অব্দে প্রথম 'ভারত কাউন্সিল্‌স্ এক্‌ট' (Indian Councils Act) পাস হয়; তার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ১৮৯২ অব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের নয়া আইন সংশোধিত হয়—ভারতের রাজনীতিকদের দাবি ছিল প্রতিনিধিমূলক শাসন-প্রবর্তনের। সে-সব তো পূরণ হলই না, বরং তার উপর পরিষদের কয়েকটি আসনের জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারানীতি খুব ভালোভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সরকারি চাকুরিতে ভারতীয়দের ঢোকবার পথে অনেক বাধা সুনিপুণ ভাবে প্রয়োগ করা হল। শিলিং ও টাকার বিনিময়মূল্যের মধ্যে এমন অর্থনৈতিক কারচুপি

করা হল যে, তাতে ভারতীয়দের কোটি কোটি টাকা লোকসান হবার সম্ভাবনা দেখা গেল। এই-সব এবং আরো অনেক ব্যাপারে শিক্ষিত ভারতীয়ের মন বিষিয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সরকারি পেনশন-ভোগী 'রায়বাহাদুর' পর্যন্ত লিখলেন, "যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিতজেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্বগৌরব মনে করিব, ততদিন জাতিবৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই, এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে।" দেশের মনোভাব এইরূপ। রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামে এক প্রবন্ধ লিখলেন; কথা হল বঙ্কিমচন্দ্র এই সভার সভাপতি হবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি লিখেছেন সেটা বঙ্কিম আগে শুনতে চাইলেন; বোধ হয় তাঁর আশঙ্কা ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা ভাষার আতিশয্যে পাছে পেনাল কোডের এলেকায় পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের বাড়িতে গিয়ে সেটা শুনিয়ে এলেন। সভা হল বীডন স্ট্রিটের 'চৈতন্য লাইব্রেরি'তে, সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই শেষ সাক্ষাৎ; কয়েক দিন পরেই বঙ্কিমের মৃত্যু হয়। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' ছাড়া এ সময়ে আরও কতকগুলি প্রবন্ধ তিনি লেখেন, যেমন: 'ইংরেজের আতঙ্ক' 'সুবিচারের অধিকার' 'রাজা ও প্রজা' 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রভৃতি। এই-সব প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের তীব্র দেশাত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে প্রতি রচনার প্রতি ছত্রে। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য। ভারতবর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে, সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে উপযোগী নহে।"

ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ শমিত করবার উপায় কবির মতে— "ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকটকর্তব্য সকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া। ·· আমাদের অভাবের শূন্যতা না পুরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই।"

আত্মশক্তিকে প্রতিষ্ঠা ও শিল্পউন্নতি দ্বারা স্বয়ংপূর্ণতা লাভ হচ্ছে কবির প্রকৃত মনোভাব।

দেশের সমস্যা নিয়ে মন যেমন ক্ষুব্ধ বিদেশে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার-অবিচারের কথা পড়ে মন তেমনি ব্যথিত। কোথায় দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জুলুদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশের অত্যাচারের সংবাদ, মাটাবিলি উপজাতির রাজা লবেঙ্গুলোর অসহায়ভাবে রাজ্য ত্যাগ করে পলায়ন-কাহিনী— বাঙালি কবির হৃদয়কে স্পর্শ করে।

ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগতজনে। কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্ অন্ধ কারা-মাঝে
অনাথিনী মাগিছে সহায়!

এই সময় থেকে ভারতের রাজনীতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করল; সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের সমাজজীবনেও তার বিষক্রিয়া দেখা দিল। মহারাষ্ট্র দেশে সর্বপ্রথম হিন্দুজাতীয়তা-আন্দোলনের জন্ম হয়। লোকমান্য তিলক তার প্রবর্তক; শিবাজী-উৎসব, সার্বজনিক গণপতিপূজা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে উগ্র-হিন্দুজাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে। গোরক্ষিণী-সভা স্থাপিত হয়; সেটাই হল হিন্দুধার্মিকতার প্রতীক। অচিরকালের মধ্যে মুসলমানের পক্ষে ধর্মের জন্য গোবধ অতি আবশ্যক, ও হিন্দুর পক্ষে গোবধনিবারণ ধর্মরক্ষার জন্যই অনিবার্য হয়ে উঠল। রক্তারক্তি শুরু হল। গোরু মারতে ও গোরু বাঁচাতে গিয়ে বিস্তর মানুষ মরতে লাগল। ইংরেজ ইচ্ছা করলে এই বিরোধ মিটিয়ে দিতে পারত, "কিন্তু অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কংগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুমুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।"

এই নীতির চরম ও মর্মান্তিক-রূপ প্রকাশ পেল ১৯৪৬ খৃস্টাব্দের অগস্টে এবং ইংরেজ-কূটনীতির পরম জয় হল ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ভারত খণ্ডনের দ্বারা।

রবীন্দ্রনাথ বড়ো আশা নিয়ে বলেছিলেন যে, এই-সব আঘাতে হিন্দুর সর্বশ্রেণীর মন ক্রমশ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলেছিলেন, "বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠাস্থানকে অধিক আশঙ্কা করি।"

এত বৎসর পরে আজও আমরা কি নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ে বলতে পারি— স্বদেশই দেশবাসী সকলের ধ্রুব আশ্রয়স্বরূপ হয়েছে?

৩৪

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের উষাকালে যে দুইজন সাহিত্যিক তাঁর আদর্শস্থল ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলাল, তাঁদের মৃত্যু হল দেড় মাসের ব্যবধানে।

বঙ্কিমের মৃত্যুর (৮ এপ্রিল, ১৮৯৪) পর কলিকাতায় শোকসভা হয়; সেখানে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পড়তে উদ্‌যোগী হয়ে নবীনচন্দ্র সেনকে ঐ সভায় অধিনায়কত্ব করতে অনুরোধ করেন। নবীনচন্দ্র লিখে পাঠালেন যে, সভা করে শোকপ্রকাশের তিনি বিরোধী, কারণ তিনি হিন্দু বলে 'শোকসভা'র অর্থ বোঝেন না— ওটা বিলাতি ঢঙ্।

যাই হোক, শোকসভা হল, সভাপতি হলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২৮ এপ্রিল)। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমাদের দেশে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি লোকহিতৈষী কোনো মহান্ ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রকাশ্য সভায় শোকজ্ঞাপন একটা সামাজিক কর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কবির কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা তাঁর ভাষণে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকটিত হয়েছে, এর পরেও বহু স্থানে নানা উপলক্ষে তিনি বঙ্কিম সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলেছেন।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর মৃত্যু হয় ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। তাঁর স্মরণে কোনো জনসভা হয় নি; রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি একটি বড়ো প্রবন্ধ লিখে নিবেদন করেন। তিনি বাল্যকালে লিরিক কাব্যের প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন বিহারীলালের রচনা থেকে।

কলিকাতার এই-সব কাজ মিটিয়ে কবি কয়দিনের জন্য কার্সিয়ঙ গেলেন

ত্রিপুরার মহারাজের নিমন্ত্রণে। এই মহারাজাই রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে তাঁকে অভিনন্দন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিলেন তার কারণ, তাঁর ইচ্ছা, বাংলা বৈষ্ণবপদাবলী ভালোভাবে প্রকাশ করা। তার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের উপর তিনি অর্পণ করেন; পরিকল্পনা গৃহীত হয়; কিন্তু মহারাজের অকাল মৃত্যুতে তা আর কার্যকরী হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো করে বৈষ্ণবসাহিত্য পড়েছিলেন; ব্রজবুলির দুরূহশব্দার্থ-সমাধানে খাতা ভর্তি করে অনেক গবেষণাও করেছিলেন— এক সময়ে বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদন করে গ্রন্থপ্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বিদ্যাপতি সম্পাদন করছেন জানাতে, তাঁকে পূর্বোক্ত খাতাখানি দিয়ে দেন; সে আর ফেরত পাওয়া যায় নি।

৩৫

১৩০১ সালের গোড়ায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়; সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রথম বৎসরে সহকারী-সভাপতি হন নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। পারিভাষিক উপসমিতিতেও তিনি ছিলেন। লোকসাহিত্য-সংগ্রহ সম্বন্ধে তিনি দেশের শিক্ষিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। নিজেও সে কাজে লেগে গেলেন। এই-সব সংগ্রহ অবলম্বনে সাধনায় লোকসাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন।

নবীনচন্দ্র সেন এই সময়ে রানাঘাট মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ যাবার সময় (২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) একবার নবীনচন্দ্রের আহ্বানে রানাঘাটে নামেন। এই উপলক্ষে নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনীতে বত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ণনা আছে, তা আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"দেখিলাম সেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি সুন্দর, কি শান্ত, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ, মস্তকের মধ্যভাগে বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশশোভা; কুঞ্চিত অলকশ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণদর্পণোজ্জ্বল ললাট, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও শ্মশ্রু -শোভান্বিত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত দীর্ঘ ও

সমুজ্জল চক্ষু ; সুন্দর নাসিকায় মার্জিত সুবর্ণের চশমা। বর্ণগৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরান ও চাদর। চরণে কোমল পাদুকা, ইংরাজী পাদুকার কঠিনতার অসহ্যতাব্যঞ্জক।”

সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের ছড়া ও বিশেষভাবে ‘মেয়েলি ছড়া’র সংগ্রহে মন দেন। এই সম্বন্ধে একটা বেশ বড়ো প্রবন্ধ লিখলেন ও সেটা পড়লেন ‘চৈতন্য লাইব্রেরি’তে ; এবারও সভাপতি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের একটা নূতন দিক খুলে দিলেন সাহিত্যিকদের সমক্ষে। লোকসাহিত্যের মধ্যে কী প্রাণ, কী সৌন্দর্য ও কী স্বাভাবিকতা আছে, তা কবি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। দক্ষিণারঞ্জন ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ সংগ্রহ করলে রবীন্দ্রনাথ তার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সেই থেকে বাঙালির দৃষ্টি গেল লোকসাহিত্যের দিকে।

কখনো জমিদারিতে, কখনো কলিকাতায় যাতায়াত করতে করতে মন বিশ্রাম চায়। কলিকাতায় থেকে “ভাববার, অনুভব করবার, কল্পনা করবার, মনের ভাব প্রকাশ করবার অবসর এবং উত্তেজনা অল্পে অল্পে চলে যায়···ভিতরে ভিতরে দিন-রাত্রির একটা অবিশ্রাম খুঁৎখুঁৎ চলতে থাকে।” এলেন তাই বোলপুরে ; তখন দ্বিতল অতিথিশালা ও মন্দির ছাড়া ঘরবাড়ি কোথাও নেই, দিগন্ত পর্যন্ত মাঠ ধূ ধূ করছে। আশ্রমের আম-আমলকীর গাছ তখনো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি। এই জনশূন্য মাঠের মধ্যে জাজিম-পাতা দোতলায় সমস্ত দরজা খোলা, একলা আছেন। পড়ছেন, লিখছেন আপনমনে। এই নির্জন পরিবেশের মধ্যে আপনার স্বভাবের বিশ্লেষণ করে একখানি পত্রে লিখছেন :

“আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে, এবং ভেবে দেখতে দুঃখবোধ হয়— সাধারণতঃ মানুষের সংসর্গ আমাকে বড়ো বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়— আমার চারি দিকেই এমন একটা গণ্ডি আছে আমি কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারি নে।···অথচ মানুষের সংসর্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক তাও নয়— থেকে থেকে সকলের

মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে—মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ সেও যেন প্রাণ-ধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্ছে এমন নিতান্ত আত্মীয় লোকের সহবাস, যারা সংকটের দ্বারা মনকে শ্রান্ত করে দেয় না, এমন-কি যারা আনন্দ দান ক'রে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়া-গুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।"

এই পত্রখানিতে রবীন্দ্রনাথের যে স্বভাবের বিশ্লেষণ রয়েছে তাঁর সারা জীবনের ঘটনাবলীতে তার প্রতিফলন। জীবনের সন্ধ্যায় 'ঐকতান' কবিতায় ('জন্মদিনে' কাব্যে) এই কথাই বলেছেন।

৩৬

সাধনা পত্রিকার চতুর্থ বৎসরে ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণে সম্পাদনের ভার এসে পড়ল রবীন্দ্রনাথের উপর। সে কাজ খুব মনোযোগের সঙ্গেই শুরু করলেন,—গল্প প্রবন্ধ সাময়িকী সবই লিখছেন। এখনকার প্রবন্ধের মধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে গ্রন্থ-সমালোচনা। বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থ-সমালোচনা আরম্ভ করেন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে। রবীন্দ্রনাথ তো সমালোচনা লিখেই তাঁর গদ্যরচনার শুরু করেন জ্ঞানাঙ্কুরের পৃষ্ঠায়। এবারকার গ্রন্থ-সমালোচনার আদর্শ, পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্যের অনুরূপ উন্নত মান প্রতিষ্ঠা।

সাধনার চার বৎসরে রবীন্দ্রনাথ যে অজস্র রচনা লিখেছেন, তাই নিয়েই একটা বই লেখা যায়। এ পর্বের যে রচনা কালের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে, তা হচ্ছে তাঁর ছোটো গল্প ও পঞ্চভূতের ডায়ারি। তিন খণ্ড গল্পগুচ্ছে ও 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থে সংকলিত কবির মোট গল্পের সংখ্যা ৮৭; তার মধ্যে সাধনায় চার বছরে লেখেন ৩৬টি!

কিন্তু সম্পাদকীয় কাজ যে উদ্যমে আরম্ভ করেছিলেন তা নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, আর ভালো লাগছে না, মন গিয়েছে অন্য কাজে। সাধনার ঋণভার বহন করা কঠিন হয়ে উঠেছে। বিদ্রূপ করে লিখলেন :

লাগিব দেশের হিতে
গরমে বাদলে শীতে,

কবিতা নাটকে গীতে
করিব না অনাসৃষ্টি।…

কিছু পরেই বলছেন :

অসম্ভব আশাতীত
অনাবশ্য অনাদৃত
এনে দাও অযাচিত
যত কিছু অনাসৃষ্টি।

শুধু অসম্ভব আশাতীতকে আবাহন করেই যদি খুশি থাকতেন তো ছিল ভালো। কিন্তু অযাচিত অনাসৃষ্টি কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ এখন যুবক; তাঁদের ইচ্ছা ঠাকুর বংশে ধনাগম হয়েছিল যে পথে সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ তাঁরাও ধরবেন। রবীন্দ্রনাথ ভাইপোদের এই দুঃসাহসিকতায় যোগ দিলেন; এবং এক পত্রে তার কৈফিয়ৎও লিখলেন, "কর্ম যে উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশরূপেই জানতুম। এখন জীবনে অনুভব করছি— কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা।…যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্ছি ততই কাজ জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে।… দেশ-দেশান্তরের লোক যেখানে বহু দূরে থেকে মিলছে সেইখানে আজ আমি নেমেছি।"

সেই কাজ হচ্ছে কুষ্টিয়ার ঠাকুর-কোম্পানির কারবার— ভূষি মালের কেনা-বেচা, পাটের বাজারে চোখ রাখা, আখমাড়া কল বসানো। এই-সব বিচিত্র কাজে কী উৎসাহ! 'নগরসংগীত' কবিতায় এই জীবনের উচ্ছ্বসিত জয়গান হচ্ছে :

ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘ
বন্ধনহীন মহা -আসঙ্গ
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ
আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্রশান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,

ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ,
বাহু বাড়াইব তপনে।

৩৭

সাধনা ১৩০২ আশ্বিন-কার্তিক যুগ্মসংখ্যা বের করে বন্ধ হল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লিখছেন, "আমি বহুকাল পরে আমার চিরবন্ধু আলস্যের প্রিয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি।" কিন্তু আলস্যের কথা মনগড়া স্বপ্নমাত্র। জমিদারি তদারকি, কুষ্টিয়ার ব্যবসায় দেখা তো আছেই। এই পর্বেই 'চিত্রা' কাব্যের কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিত হল— 'পূর্ণিমা' 'উর্বশী' 'বিজয়িনী' 'স্বর্গ হইতে বিদায়' 'সিন্ধুপারে' প্রভৃতি। এই বৎসরের ফাল্গুন মাসে 'চিত্রা' কাব্য প্রকাশিত হল।

রবীন্দ্রনাথ আছেন পতিসরের জমিদারিতে। সেখানকার নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য, অল্প তার পরিসর, মন্থর তার গতি— মজে আসবার অন্তিম দিন তার ঘনিয়ে আসছে।

চৈত্রের দুঃসহ গরমে নৌকায় আছেন; মন দিয়ে বই পড়ার মতো অনুকূল আবহাওয়াও নয়। বোটের জানালা বন্ধ— খড়খড়ি তোলা, তার মধ্য দিয়ে দেখা যায় বাইরের জগৎটা, সে যেন 'ছবি ও গান'-এর জগৎ আর-এক বার দেখে নিচ্ছেন আর-এক পরিবেশে। সে জগৎ অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডি দিয়ে ঘেরা। সে ছবি নিরলংকার ভাবে, ভাষায় অঙ্কিত। প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ এতদিন বহু কবিতায় প্রকৃতির জয়গান করেছেন— মানুষ সেখানে আছে গৌণ স্থান দখল করে। প্রকৃতিকে সুন্দর করবার জন্য মানুষের যেটুকু প্রয়োজন, সেইটুকুই স্থান ছিল তার। কিন্তু 'চৈতালি'র এই কবিতাগুচ্ছে মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের হাত ধরে একত্র প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জয়গানের প্রথম কাকলি শোনা গেল এই কাব্যখণ্ডে। এই সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন 'গল্পগুচ্ছে', তাদের ছবি আঁকলেন 'চৈতালি'র কবিতায়।

এমন সময়ে মহর্ষির নির্দেশে ঠাকুর এস্টেটের পার্টিশনের ব্যবস্থা করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আবার উড়িষ্যা যেতে হল।

এতদিন মহর্ষির মৃত ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের ও মৃতপুত্র হেমেন্দ্রনাথের ও তাঁর নিজ পুত্রদের অংশ এজমালিতেই দেখাশুনা হয়ে আসছে। মহর্ষির ইচ্ছা তাঁর জীবিতকালেই পার্টিশন হয়ে যায়। তাঁর হয়তো এ আশঙ্কা হয়েছিল যে, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ও দুই পৌত্র যে ব্যবসায়ে নেমেছেন, তা যদি লোকসানী কারবার হয়, তবে তা সমগ্র জমিদারিকে আঘাত করতে পারে। জমিদারির সম্বন্ধে খুঁটিনাটি রবীন্দ্রনাথেরই জানা ; কাজেই তাঁকে সব করতে হল। পাবনার সাহজাদপুর পরগনা পড়ল গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গগনেন্দ্রনাথদের ভাগে। কটকের জমিদারি দেওয়া হল হেমেন্দ্রনাথের পুত্রদের। এই-সব বৈষয়িক ব্যবস্থা করতে গিয়ে খানিকটা বিষ উছলে পড়ে ; তার চিহ্ন রয়ে গেছে 'চৈতালি'র শেষ দিককার কবিতায়। মনকে শান্ত রাখবার জন্য প্রার্থনা উঠছে বারে বারে।[১]

এই চলাফেরার মধ্যে উড়িষ্যায় 'মালিনী' নাট্যকাব্যটি লিখে ফেললেন। মনের মধ্যে কোথাও একটা মুক্তি না থাকলে এমনভাবে নিরন্তর আনাগোনা, হৈহুল্লোড়ের মধ্যে এমন রসরূপ কল্পনা সম্ভবপর হত না।

'মালিনী' ও 'চৈতালি' পুস্তক-আকারে ছাপা হল কাব্যগ্রন্থাবলীতে (আশ্বিন ১৩০৩)— রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সংকলন। এটা প্রকাশ করেন ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৮

এখন পত্রিকার দায় নেই, লেখার তাগিদ নেই— লেখনী যেন স্তব্ধ। কুষ্টিয়ার ব্যবসায় চলছে, তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন ভালোভাবেই— রাহুর প্রেমের কঠিন নিগড় :

তুই তো আমার বন্দী অভাগী,
বাঁধিয়াছি কারাগারে।

১ রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর বৃদ্ধ বয়সে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জমিদারি পার্টিশন করে নিতে হয়েছিল। এবং সময়মত করেছিলেন বলেই তাঁর নিজের অংশ রক্ষা পায় ; তা না হলে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুরেন্দ্রনাথের জমিদারি অংশের সঙ্গে তাঁদের অংশও সহমৃত হত।

প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।

এই শৃঙ্খল থেকেও মুক্তি পান— বন্ধুরা যখন কিছু লেখবার জন্য অনুরোধ করেন। লিখলেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (চৈত্র ১৩০৩)— চার বৎসর পূর্বে লিখেছিলেন 'গোড়ায় গলদ' বন্ধুদেরই তাগিদে— অনাবিল হাস্যরসের মধ্যে কেদার -তিনকড়ির কাণ্ড দেখে তাদের উপর রীতিমত রাগ করার উপায় থাকে না।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রকাশিত হবার এক মাসের মধ্যে 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' প্রকাশিত হল ; ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতের সঙ্গে বিচিত্র আলাপ-আলোচনা। বাংলা ভাষায় এ ধরণের কোনো বই এর পূর্বে বা পরে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। আমেরিকান লেখক ওয়েন্ডল্ হোম্‌সের 'পোয়েট অ্যাট দি ব্রেক্‌ফাস্ট্ টেব্‌ল্' প্রভৃতি গ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মাত্র, আসলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

৩৯

১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজশাহী জেলার নাটোর শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর বার্ষিক অধিবেশন। নাটোরের জমিদার মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ সম্মেলনের আহ্বায়ক। রবীন্দ্রনাথ মহারাজার বিশেষ বন্ধু, তাই তিনিও সেখানে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর-বাড়ির বহু যুবকও সঙ্গ নিলেন ; সেখানে রাজোচিত আয়োজন হবে সকলেই জানতেন— এ যুগের রাজসূয় যজ্ঞ।

প্রাদেশিক সম্মেলনী, আজকালকার প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনীর পূর্বরূপ। সে সময়ে, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষ দিকে, রাজনীতি ছিল উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আবদ্ধ। সভার বক্তৃতা, প্রস্তাব, তর্কবিতর্ক প্রভৃতি সব-কিছুরই ভাষা ছিল ইংরেজি। সব-কিছু বলা কহা হত ইংরেজ প্রভুদের শোনাবার জন্য ; দেশের লোককে দেশের ভাষায় দশের কথা বোঝাবার প্রয়োজন তখনো নেতারা অনুভব করেন নি। নাটোর সম্মেলনীর সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সিবিল সার্বিসের লোক। তিনি যথানিয়মে তাঁর সভাপতির ভাষণ ইংরেজিতে লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ যুবকের দল ইংরেজি ভাষায় সভার কার্য পরিচালনার ঘোর বিরোধী। তিনি লিখছেন, "জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে সভায় বাংলা ভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [W. C. Bonnerjee, কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি] মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ ঠিক করেছিলেন স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ দিতে উঠে তিনি তাঁর মনের ঝাল ঝাড়বেন। কিন্তু বিধি বাম, তা হল না। সভার দ্বিতীয় দিন বিকালে ভীষণ ভূমিকম্পে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। প্রাণ নিয়ে কোনো-গতিকে সকলে কলকাতায় ফিরে আসেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' বইয়ে নাটোর-সম্মেলনের অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

রাজনীতিক্ষেত্রের এই ঘটনাটি কবির সমসাময়িক জীবনের সামান্য অংশমাত্র, আসলে এটা 'কল্পনা'র, গানের ও নাট্যকাব্য রচনার পর্ব। গানের পালা শেষ হলে দেখা দিল গল্প বলার পালা। নাট্যকাব্য বাংলা সাহিত্যে কবির অভিনব সৃষ্টি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১২৯১), 'চিত্রাঙ্গদা' (১২৯৮), 'বিদায়-অভিশাপ' (১৩০১), 'মালিনী' (১৩০৩) অনেক দিনের ফাঁকে ফাঁকে লেখা। এবার পর পর লিখলেন— 'গান্ধারীর আবেদন' 'সতী' 'নরকবাস' 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। আর লিখলেন অনেকগুলি কাহিনীমূলক কবিতা। সবগুলি লিখিত হয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দের কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়, কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের সত্য কতটুকু তার সার-কথা বললেন নারদমুনির মুখ দিয়ে :

নারদ কহিলা হাসি, সেই সত্য যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

কবিকে এই কথাই একদিন বলতে শুনি খৃষ্ট সম্বন্ধে। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী একটা বড়ো বই লিখে খৃষ্টের অনৈতিহাসিকত্বের প্রমাণ জড়ো করেছিলেন— নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে সে-সব সংগৃহীত। কবি তাঁকে বলেছিলেন, মানুষ যে-খৃষ্টের সৃষ্টি করেছে তাই চলছে এবং চলবে; কারণ, সেটা তার ধ্যানলব্ধ সত্য। "ঘটে যা, তা সব সত্য নহে।"

৪০

১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের উপর ভারতী পত্রিকা -সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়ল। পূর্বের দুই বৎসর সম্পাদন করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী। তার পূর্বে দশ বৎসর সম্পাদক ছিলেন স্বর্ণকুমারী নিজে এবং তারও পূর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ। একুশ বৎসর পূর্বে ১২৮৪ সালে ভারতীর আরম্ভ; তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ষোলো বৎসর; এখন ১৩০৫ সালে তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ।

পত্রিকার ভার পেলেই লেখনী সচল হয়ে ওঠে। আবার গল্প, কবিতা, পুস্তকসমালোচনা, বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ যথানিয়মে লেখা চলল।

ঊনবিংশ শতক শেষ হতে চলেছে; গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জনতার মধ্যে নূতন রূপ নিয়েছে। ১৮৯৩ থেকে মহারাষ্ট্র দেশে বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রেরণায় যে হিন্দু জাতীয়তাবোধ দেখা দিয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় যে-সব ঘটনা ঘটে তার আভাস পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে প্লেগ মহাব্যাধির নূতন আমদানি হলে, ইংরেজ সরকার হতবুদ্ধি হয়ে এমন-সব আইন জারি করলেন যা লোকের কাছে জুলুম বলে মনে হল— ব্যাধির থেকে তার ঔষধ আরও উৎকট! ইতিপূর্বে পুনায় ইংরেজদের প্রতিরোধ করবার জন্য গুপ্তসমিতি স্থাপিত হয়েছিল; তার দুজন সদস্য চাপেকার দু-ভাই মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি-বৎসরের দিন প্লেগ-অফিসার ও ম্যাজিস্ট্রেট দুই সাহেবকে গুলি করে মারলেন। বালগঙ্গাধর তিলককে সরকার ঠাওরালেন এ-সবের প্ররোচক; তাঁর এক বৎসর কারাদণ্ড হল।

ভারতের সর্বত্রই, বিশেষ করে বাংলাদেশে ও বোম্বাই প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে, পত্রিকাওয়ালারা ভারত-সরকারের জুলুমবাজির তীব্র সমালোচক; তাঁদের ভাষা অনেক জায়গায় বেপরোয়া, ঘটনাগুলিও সর্বত্র অবিকৃত নয়। গবর্মেণ্ট্ এই-সব 'দায়িত্বহীন' লেখা বন্ধ করবার জন্য 'সিডিশন বিল' আনলেন। তখন কলিকাতায় বড়লাটের রাজধানী; ওই বিল আইনে পাস হবার আগের দিন টাউন-হলে বিরাট সভা হল। রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করলেন (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫)।

দেশের মধ্যে অসন্তোষ জমে উঠলে তাকে প্রকাশ করতে দিতে হয়— এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। তিনি বললেন সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হবে, স্বাভাবিক নিয়ম -অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করতে পারবে না। রুদ্ধবাক্ সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকা আমাদের পক্ষে বড়োই ভয়ঙ্কর অবস্থা। কবির মতে "কঠিন আইন ও জবর্‌দস্তিতে সম্পূর্ণ উল্টা ফল" ফলে। তিনি বললেন, রাজার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধতা রাজদ্রোহ নামে চলে, আর প্রজার বিরুদ্ধে রাজপুরুষদের অত্যাচারকে প্রজাদ্রোহ বলা যাবে না কেন? এ বড়ো কঠিন শব্দ ও উক্তি— প্রজার স্বার্থবিরোধী রাজকার্য প্রজাদ্রোহিতা!

কয়দিন পরেই ঢাকায় প্রাদেশিক সম্মেলন (১৮-২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫); সভাপতি রেভারেণ্ড্ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকিল; ধর্মে নিষ্ঠাবান্ খৃষ্টান ও অন্তরে দেশপ্রেমিক। সে যুগের রীতি-অনুসারে সভাপতির ভাষণ ইংরেজিতে পঠিত হল; কিন্তু বাংলায় তার সারসংকলন করে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবিই উদ্‌বোধনসংগীত গান করেন।

৪১

সাহিত্যসৃষ্টি, রাজনীতির সমালোচনা— এ-সবই তো জীবনের বাহিরের কথা; কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথ? তাঁর তো সমস্যা সাধারণ মানুষেরই সমস্যা। ছেলেমেয়েরা বড়ো হচ্ছে— তাদের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মত আছে বলে তিনি কলিকাতার স্কুলে তাদের পাঠাতেন না। যদিও ঠাকুর-বাড়ির অন্যান্য অধিকাংশ শিশু যথারীতি স্কুলে যেত, কলেজে পড়ত।

জোড়াসাঁকোর বাড়ি বহুগোষ্ঠীপূর্ণ, নানা আদর্শে শিশুরা মানুষ হচ্ছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এখন বৃদ্ধ— জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সব সময় থাকেন না। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা নয় যে, এই অবস্থায় স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিয়ে আর এখানে বাস করেন। ঢাকা থেকে শিলাইদহে ফিরে এসে স্ত্রীকে লিখলেন, "আমি কলিকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণমন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।"

এই মনোভাবের কথা একটি কবিতার মধ্যে প্রকাশ পায়:

নগরের হাটে করিব না বেচা-কেনা
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে ;
পাব না কিছুই রাখিব না কারো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।

১৩০৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে কবি তাঁর পরিবারবর্গ শিলাইদহে আনলেন ; ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা করলেন ঘরেই। এর তিন বৎসর পরে (১৩০৮) শান্তিনিকেতনে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ; তার নাম দেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। যথাস্থানে এই বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ আসবে।

৪২

কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ে শনি লেগেছে ; বলেন্দ্রনাথ অসুস্থ, সুরেন্দ্রনাথ উদাসীন, রবীন্দ্রনাথ ভারতী নিয়ে ব্যস্ত। নিজের সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দ ও পারিবারিক সমস্যার নিরানন্দ—এই সরু মোটা দুটো তারে সুর মেলাতে তাঁর দিন যাচ্ছে। ব্যাবসার দিকে চোখ পড়ল যখন, তখন দেখা গেল—তার শাঁস ফোঁপরা হয়ে গেছে। বলেন্দ্রনাথের 'অতিবিশ্বাসী' ম্যানেজার ফেরার ; দেখা গেল সত্তর হাজার টাকার উপর ঋণ পড়েছে। সমস্ত ঝুঁকি এসে রবীন্দ্রনাথের উপর পড়ল।

কিন্তু ব্যবসায়ের এ ঋণ হয়তো স্বাভাবিক ভাবেই শোধ হত, যদি রবীন্দ্রনাথ কারবার গুটিয়ে ফেলবার জন্য ব্যস্ত না হতেন। কবির জীবনে বহুবার দেখা গিয়েছে যে, তাঁর জীবনের নিষ্ফলতার সমস্ত স্মৃতি তিনি নির্মমভাবে মুছে ফেলতেন, অতীতের কোনো চিহ্ন তাদের করুণ কাহিনী বলবার জন্য কোথাও যেন না পড়ে থাকে। লেখা যখন কেটেছেন, এমন করে কেটেছেন যে কারও সাধ্য নেই তার ফাঁক দিয়ে কোনো-কিছু পড়তে পারে, তার থেকে চিত্র ফুটে উঠেছে, তথ্য বের হয় নি এতটুকু। তাই তাড়াতাড়ি কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ের পর্বটাকে মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য এত ঔৎসুক্য। সাহিত্যের মধ্যে কোথাও তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ব্যবসায়ের ঋণ শোধ করবার জন্য অন্য জায়গায় ঋণ করলেন ; এই ভাবে একটা চালু ব্যবসায় নষ্ট হল। ইতিমধ্যে ১৩০৬ ভাদ্রে, ত্রিশ বৎসর বয়সে, বলেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে; মাত্র চার বৎসর পূর্বে এই প্রতিভাবান প্রিয়দর্শন যুবকের বিবাহ হয় (মাঘ ১৩০২)। 'নদী' কবিতা যা শিশুদের জন্য লিখেছিলেন, সেইটি বই করে ছাপিয়ে কবি সেটি বলেন্দ্রনাথকে বিবাহ-দিনে উৎসর্গ করেছিলেন।

৪৩

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে ছেলেমেয়েদের জন্য ছোটো একটি স্কুল খোলা হয়েছে। ইংরেজি পড়াবার জন্য এলেন লরেন্স্ নামে এক ইংরেজ, চালচুলোহীন পাগলা মেজাজের লোক। গণিত শেখাতে এলেন জগদানন্দ রায়; তালুকের এক কর্মচারী। সংস্কৃত শেখাবার জন্য নিযুক্ত হলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। রবীন্দ্রনাথও সন্তানদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সময় দেন।

ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ শান্তি-উদ্‌বেগের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যলক্ষ্মীর দেখা মিলছে। তবে সে দর্শনে বড়ো-কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে না— লিখছেন 'কণিকা', দু পংক্তি থেকে দশ পংক্তির কবিতা! ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নেমে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে কারবার করতে করতে দেখেছেন ভিতরে ভিতরে কত ফাঁকি আছে— ভণ্ডামির উপর ভদ্রতার-পালিশ-দেওয়া মুখোস প'রে কেমন সব ঘুরে বেড়ায়। তাই এবারকার ছোটো কবিতা-কণাগুলি বিদ্রূপে শাণিত হয়ে আঁতে গিয়ে বেঁধে। 'চাণক্য শ্লোক' বলে যা চলিত আছে তার সঙ্গে তুলনা করলে তাৎপর্যে বা ঔজ্জ্বল্যে ম্লান হবে না এই 'কণিকা' কাব্যখানি। বইখানি উৎসর্গ করলেন ময়মনসিংহের জমিদার সুহৃৎ প্রমথনাথ রায়চৌধুরীকে, সে যুগে তাঁর কবিখ্যাতি ছিল।

১৩০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে লিখতে শুরু করেছেন গল্পকবিতা, যা মুদ্রিত হয় প্রথমতঃ 'কথা' কাব্যে, পরে 'কথা ও কাহিনী'র মধ্যে। রবীন্দ্রসাহিত্যসৃষ্টির স্রোতোধারার মধ্যে থেকে-থেকেই দেখা যায় গল্প বা কাহিনী বলবার আবেগ। কখনো গদ্যে কখনো পদ্যে তাকে রূপ দেন— "ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে ছাড়া"। এবার কুড়িটি গাথা-কবিতা লিখলেন।

শিলাইদহে বাসা বাঁধলেও কলিকাতায় আসতে হয় নানা কাজে।

কলিকাতার যুবকসমাজের অনেক কাজ 'রবিবাবু'কে না হলে হয় না। ১৩০৬ সালের শেষ দিকে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের একটা গণ্ডগোল মেটাবার জন্য তাঁকে আসতে হল। গত ছয় বৎসর পরিষদের কার্যালয় আছে গ্রে স্ট্রীটে শোভাবাজার-রাজবাটীতে। নবীন দল ধনীগৃহে গিয়ে সভাসমিতি করার বিরোধী; তাঁদের ইচ্ছা পৃথক্ বাড়িতে পরিষদ স্থানান্তরিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের ভোটে নবীন দলের জয় হল (৩ ফাল্গুন ১৩০৬); তাঁরা নূতন ভাড়াটে বাড়িতে উঠে এলেন। তার পর শুরু হল পরিষদের জন্য নূতন জমি খোঁজার পালা। পাওয়া গেল সারকুলার রোডে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জমি— তিনি সেটি দান করলেন পরিষদকে। পরিষদের পক্ষে গ্রহীতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম।

৪৪

কথা ও কাহিনী লিখতে লিখতে কবির মনে কী একটা বিদ্রোহের ভাব এল। মন আসান খুঁজছে, মুক্তি চাইছে। ক্ষণিক দিনের পুলকে ক্ষণিকের গান গাইবার জন্য মন ব্যাকুল হল। "কত-না যুগের কাহিনী"র জন্য মন আর উতলা নয়। অন্তরের 'কল্পনা'লোকে, অতীতে অনাগতে, স্বপ্নবিহারও অনেক হয়েছে। মন মুক্তি খুঁজছে বর্তমানেই— প্রতিক্ষণের অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে -পূর্ণ ধরিত্রীর সহজ আনন্দ উপভোগে।

তাই ভারতী থেকে কিছু লেখবার জন্য যখন তাগিদ এল তখন যে গদ্য-কাহিনী হাত থেকে বের হল তা রূপ নিল 'চিরকুমার-সভা' নামে রঙ্গ-রচনায়। আর, কবিতা এল 'ক্ষণিকা'র নূতন রূপে, হালকা ছন্দের ওড়না উড়িয়ে।

ক্ষণিকার কবিতাগুলি ১৩০৭ সালের গোড়ায় লেখা। কখনো শিলাইদহে কখনো কলিকাতায়—মাঝে কয়দিন দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন ত্রিপুরার মহারাজার সঙ্গে, সেখানেও কয়েকটা লেখা হয়। বইখানা উৎসর্গ করলেন তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু লোকেন পালিতকে, যাঁর বাইরে থাকে হাসির ছটা, ভিতরে থাকে আঁখির জল।

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম; আপাতদৃষ্টিতে লঘু

ভাবে হালকা ছন্দে যা বলতে চেয়েছেন, তা সূচিত করছে গূঢ় গভীরতর বাণী।

'চিরকুমারসভা' প্রহসনাত্মক উপন্যাস হলেও তার সবটাই নিছক হাসি-তামাশা নয়— গভীর সমস্যার কথা অন্তঃশীল হয়ে বয়ে চলেছে।

চিরকৌমার্য সমাজের আদর্শ হতে পারে কি না প্রহসনাকারে এই সমস্যাটা বিবৃত হয়েছে। এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ বাংলাদেশে নূতন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়ছিলেন— এই প্রহসন কি সেই মতবাদের সমালোচনা? 'ক্ষণিকা'র একটি কবিতাতেও লিখেছিলেন :

আমি হব না তাপস, হব না, হব না,
যেমনি বলুন যিনি।

এখানে হাস্যপরিহাসের সুরে যা বললেন অল্পকাল পরে গভীর অধ্যাত্মবোধ থেকে তাই বলেছেন 'নৈবেদ্য' কাব্যে :

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

৪৫

নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সংসার তো সব লোকেই করে— রবীন্দ্রনাথও করতেন। (তাঁর মতো কর্তব্যপর স্বামী ও স্নেহশীল পিতা কমই দেখা যায়)। সেই সঙ্গে অন্যের জন্য চিন্তা, অন্যের দুঃখমোচনের চেষ্টা তাও করতেন। রোগীর সেবা যথেষ্ট করেছেন, কিন্তু হাসপাতালে যেখানে অনেক রোগীর নানা দুঃখ পুঞ্জীভূত সেখানে যেতেন না— কোথায় তাঁর বাধত। কেউ কোনো কাজ করছে জানতে পারলে তাকে নানা ভাবে সাহায্য করা, কেউ কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে জানলে তার জন্য গ্রন্থাদি কিনে দেওয়া— এ-সবই তিনি সাধ্যমত করতেন। কত সাহিত্যিককে তিনি গল্পের প্লট দিয়েছেন, কত লোকের রচনা পঙক্তির পর পঙক্তি দেখে দিয়েছেন, কত লোকের গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ করে শুদ্ধ করেছেন, কত লোককে উৎসাহ দেবার জন্য তাঁদের গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন— তার সবিস্তার গবেষণা এখনো হয় নি। সেটি হলে রবীন্দ্রচরিত্রের একটা নূতন দিকের সন্ধান পাওয়া যাবে।

আমাদের আলোচ্য-পর্বে বিংশ শতকের গোড়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজের

পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু ছুটি নিয়ে বিলাতে গবেষণায় নিযুক্ত। তাঁর গবেষণা-কাজ যাতে বিলাতে বাধাহীনভাবে চলতে পারে তার জন্য রবীন্দ্রনাথের কী উদ্‌বেগ! সে যুগে এদেশীয় অধ্যাপকগণ যে গবেষণা করবেন, তা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কল্পনার অতীত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ভারতের ভাবী গৌরব দেখছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে। তাই তিনি জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে লিখলেন, "তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি— আর কোনো পথ ভারতবর্ষের পথ নহে— তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিস দান করিয়াছি, কিন্তু সে কথা কাহারো মনে নাই— আর-একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে, নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই।"

জগদীশচন্দ্র বিলাতে নিশ্চিন্তমনে গবেষণা কাজ চালাতে পারেন, তার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সরকার ছুটি দিতে নারাজ, অর্থসাহায্য তো দূরের কথা। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের শরণাপন্ন হলেন। মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন; তিনি তাঁর হাতে বিজ্ঞানীর জন্য দশ হাজার টাকা তুলে দিলেন। সেই অর্থসাহায্য পাবার জন্য ত্রিপুরা-দরবারে কবিকে কয়েকবার যাওয়া-আসা করতে হয়। এই অর্থ পাওয়াতে জগদীশচন্দ্র নিরুদ্‌বেগে বিলাতে কাজ করতে থাকলেন।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরের ইচ্ছা, ত্রিপুরার মহারাজা হিন্দুরাজার শ্রেষ্ঠ আদর্শে দেশ পালন করেন, মঙ্গলকর্মে মুক্তহস্ত হন। ত্রিপুরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে খুবই পিছিয়ে ছিল; মফস্বলে বাস করে মহারাজাও কলিকাতার সম্ভ্রান্তদের সহিত পরিচিত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আপ্যায়িত করে বাংলাদেশের মঙ্গল-কর্মে ব্রতী করবার জন্য চেষ্টা করলেন।

কলিকাতায় তাঁর সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হল। 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় করে তাঁকে দেখানো হল তাঁদেরই পূর্বপুরুষ গোবিন্দমাণিক্যের মহান্ আদর্শ। অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এইভাবে রাধাকিশোর মাণিক্য রবীন্দ্রনাথের 'পরে ক্রমেই অধিক শ্রদ্ধাশীল ও বহু বিষয়ে একান্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। রাজকুমারদের শিক্ষা, রাজ্যশাসন, মন্ত্রীনিয়োগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত ও রাজ্যগত অসংখ্য সমস্যা

সম্বন্ধে কবির সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন। কিন্তু কবি এক পত্রে লেখেন, "লক্ষ্মীমান পুরুষেরা নিজে মহদাশয় হলেও ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা এমন পরিবেষ্টিত যে ইচ্ছা করলেও তাঁদের শুভচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, তাঁদিগকে পৃথিবীর শুভকার্যে প্রবৃত্ত করা অসম্ভব।" মনে পড়ে কবি গ্যেটের জীবনীতে পড়েছিলাম—কবি গ্যেটেও হ্বাইমারের ডিউকের সভাসদ্-রূপে অনেক কিছু করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সূচির ছিদ্রপথে উট যেতে পারে, ধনীর স্বর্গে যাওয়া হয় না।

৪৬

১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে (১৯০১ খৃষ্টাব্দ) 'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায়ে প্রকাশিত হল ; রবীন্দ্রনাথ হলেন সম্পাদক। এখন তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসর। পত্রিকার বৈষয়িক ভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীশচন্দ্রের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ; তিনি মজুমদার এজেন্সি নাম দিয়ে কলিকাতায় এক গ্রন্থপ্রকাশালয় খুললেন। রবীন্দ্রনাথের বহু বইয়ের তাঁরাই প্রথম প্রকাশক। এই দোকান ও প্রকাশালয়কে কেন্দ্র করে 'আলোচনা-সভা' নামে একটি ক্লাব বা সাহিত্যিক আসর গড়ে ওঠে ; বহু সাহিত্যিক সাহিত্যসেবী ও সমঝদার সেখানে জমায়েত হয়ে সাহিত্যের একটা আবহাওয়া গড়ে তোলেন ; রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ এখানেই প্রথম পড়া হয়। বাংলাদেশে গ্রন্থ-প্রকাশন ও মুদ্রণকে কেন্দ্র করে যে প্রকার ক্লাব আজ বহু স্থলে দেখা যায় তার আরম্ভ বোধ হয় এখানেই।

নূতন পত্রিকার দায়িত্ব পড়লেই কবির মন সজাগ ও লেখনী সচল হয়, এটা আমরা পূর্বেও দেখেছি।

নূতন বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রবন্ধ কবিতা তো প্রকাশিত হচ্ছেই, নূতন সাহিত্যসৃষ্টি হল উপন্যাস—'চোখের বালি'। কিছুকাল পূর্বে 'বিনোদিনী' নামে একটা গল্পের খসড়া করে রেখেছিলেন ; বঙ্গদর্শন পত্রিকার চাহিদায় সেটাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন।

এতদিন রবীন্দ্রনাথ ছোটো গল্প লিখেছেন ; শেষে লেখেন 'নষ্টনীড়', (ভারতী ১৩০৮)। সেটা প্রথম দিকে 'উপন্যাস' বলেই চলিত হয়েছিল।

আমরা তাকে বলব গল্পোপন্যাস। অর্থাৎ, গল্প থেকে উপন্যাসে পৌঁছবার মাঝপথের অবস্থা। এবার বড়ো উপন্যাসে হাত দিলেন। 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী কাহিনী। মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাসের সূত্রপাত হল এখানেই। আর-এক দিন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস বাঙালি পাঠককে এমনি করেই উদ্‌ভ্রান্ত করে আবির্ভূত হয়েছিল।

উপন্যাস ছাড়া তাঁর এ সময়ের দেশাত্মবোধক গদ্যপ্রবন্ধগুলি এখনো লোকে পাঠ করে, কালান্তর বা যুগান্তর হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। তখন দেশের অবস্থা ক্রমেই জটিল হচ্ছে; লোকের দুঃখ কষ্ট বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় ইংরেজের শাসননীতিকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য জনশক্তিকে জাগ্রত ও সংহত করার যে প্রয়োজন, এ কথা সেদিন চিন্তাশীল লোকমাত্রই অনুভব করেছিলেন। এই জনশক্তি কী, কী ভাবে এই বিপুল অথচ দুর্বল সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, এটাই ছিল সমস্যা। সে সময়ের ভাবুকেরা মনে করতেন 'হিন্দুর হিন্দুত্ব' বা 'হিন্দু-জাতীয়তা' বলে একটা ভাবকে জাগ্রত করতে পারলেই ভারতের সমস্যার সমাধান হবে। তাই হিন্দুর জাতীয়তাবোধ জাগাবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় -প্রমুখ ভাবুকের দল লেখনী ধারণ করেছিলেন। এখানে একটা কথা জানা দরকার যে, এই নূতন গোষ্ঠীর চিন্তাধারা বা হিন্দুত্ববোধ ও পূর্ববর্তী শশধর তর্কচূড়ামণিদের হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা এক জিনিস নয়। আবার মহারাষ্ট্রীয়দের সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধও ভিন্ন জিনিস।

রবীন্দ্রনাথ এঁদের সঙ্গে নবহিন্দুত্বের পুনর্গঠন -সম্পর্ক ধ্যানধারণায় ভাবনায় এবং তার প্রকাশে ও প্রচারে মন দিলেন। ইতিপূর্বে 'নৈবেদ্য' কবিতাগুচ্ছে তিনি ঈশ্বর ও দেশ সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা লিপিবদ্ধ করছিলেন। এবার বঙ্গদর্শন পত্রে সেই কথাই গদ্যপ্রবন্ধে প্রকাশ করছেন। এক হিসাবে বলা যেতে পারে এই গদ্যপ্রবন্ধগুলি 'নৈবেদ্য'রই ভাষ্য। 'নৈবেদ্য'র কবিতা ও বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলি পাশাপাশি পড়া উচিত।

বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নূতন চিন্তার বিষয় পেল, সাহিত্যেও নূতন রূপ দেখা দিল। বর্ণাশ্রমধর্ম ই হিন্দুসমাজের ঐক্যভিত্তি এ কথা ঘোষণা করেও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "এ কথা যিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় আদর্শে

লোককে কেবল তপস্বী করে, কেবলই ব্রাহ্মণ করিয়া তোলে, তিনি ভুল বলেন এবং গর্বচ্ছলে মহান্ আদর্শকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ যখন মহান্ ছিল তখন সে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবেই মহান্ ছিল, তখন বীর্যে ঐশ্বর্যে জ্ঞানে এবং ধর্মে মহান্— কেবল মালা জপ করিত না।" রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণ আদর্শায়িত মহামানব ; তার অস্তিত্ব অতীতেও ছিল কি না জানি না ; তবে বর্তমান বিংশ শতাব্দে সে ব্রাহ্মণ দুর্লভ— কোনো ব্রাহ্মণের পক্ষেই সে আদর্শমত 'ব্রাহ্মণ' নাম গ্রহণ করা অসম্ভব।

৪৭

সাহিত্যরচনায় কবি যেমন নিঃসঙ্গ, সংসারের মধ্যেও তিনি তেমনি একা।

প্রায় তিন বৎসর হল, জোড়াসাঁকোর বহুজনপূর্ণ বাড়ি ও সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিলাইদহে আপনার মতো করে ছোটো নীড় বেঁধে সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু মৃণালিনী দেবীর পক্ষে শিলাইদহ হয়েছে 'নির্বাসনদণ্ড'। এই সমাজশূন্য ভদ্রপরিবেশশূন্য গ্রামের মধ্যে তিনি আদৌ সুখী নন, তজ্জন্য কবিরও বিশেষ উদ্‌বেগ। নানা কারণে গ্রামের 'অলস-জীবন'-যাপন আর সম্ভব হচ্ছে না। মেয়েরা বড়ো হচ্ছে, বিবাহের বয়স অদূরবর্তী। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের এন্‌ট্রান্‌স্ পরীক্ষার সময় এসে গেল। তাকে তালিম দেবার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন। কবি দেখছেন শিলাইদহ না ছাড়লে কোনোটাই হবে না। কিন্তু জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পরিবার নিয়ে থাকতে তিনি একেবারে নারাজ। স্থির করলেন শান্তি-নিকেতনে এসে বাস করবেন ; সেখানে একটা আবাসিক বিদ্যালয় খুলবেন— রথীন্দ্রনাথ সেখানে পড়বেন, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকবেন।

কলিকাতায় এসে জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা বা মাধুরীলতার বিবাহ দিলেন। জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী কবির প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র। শরৎচন্দ্র এম. এ., বি. এল. মজঃফরপুরে ওকালতি করেন। মেয়ের বয়সের তুলনায় জামাইয়ের বয়স বেশি। কিন্তু পীরালি ঘরে, তার উপর ব্রাহ্মপরিবারে, সহজে কেউ বিবাহ করে 'জাত' খোওয়াতে চান না। সুতরাং শরৎচন্দ্রের মতো জামাই ঠাকুর-বাড়িতে পাওয়া শক্ত। অন্য দিকে

বলবার কথা—তাঁরা 'সোনার বেনের বামুন', উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ তাঁদের ঘরে মেয়ে দেয় না, ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তাঁরাও পদস্থ হবেন। সুতরাং হয়তো বলা চলে, উভয় পক্ষেই সুবিধার মুখ চেয়ে বিবাহব্যবস্থা হল। এই বিবাহের ঘটকালি করেন প্রিয়নাথ সেন; পরিবারের রীতি-অনুসারে শরৎচন্দ্রকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বেলার বিবাহের এক মাসের মধ্যে মেজো মেয়ে রেণুকা বা রানীর বিবাহ হল এক ডাক্তারের সঙ্গে। তাঁর নাম সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এল. এম. এস. -পাস। বিবাহের পরেই ছেলেটিকে তার অ্যালোপ্যাথির ডিগ্রির উপর হোমিওপ্যাথিক-চূড়া চড়াবার জন্য আমেরিকা রওনা করে দিলেন। রানীর বয়স কম বলে ফুলশয্যার আগেই জামাইকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুই মেয়ের বিবাহ দুই মাসের মধ্যে হয়ে গেল। মৃণালিনী দেবীর ভাবখানা—মেয়েদের বিবাহ দিতে পারলেই খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়—ঝামেলা কমে।

বিবাহের সময় বড়ো মেয়ে বেলার বয়স চৌদ্দ বৎসর ও মেজো মেয়ে রেণুকার বয়স বারো বৎসর মাত্র। এক হিসাবে একে বাল্যবিবাহই বলব। অথচ রবীন্দ্রনাথ যৌবনে ভারতী, হিতবাদী প্রভৃতি কাগজে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে মতামত প্রচার করেছিলেন, তা আজ নিজ পরিবারে প্রয়োগ করতে পারছেন না। "কাব্য পড়ে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো" এ কথাটা কবি নিজেই বলেছেন—সে কী নিজেকে ভেবেই?

বাল্যবিবাহ ছিল ঠাকুরবাড়ির রেওয়াজ, ব্যতিক্রম হয় ইন্দিরাদেবী ও সরলাদেবীর বেলায়। তার কারণ এঁদের পিতারা জোড়াসাঁকোর আওতার বাইরে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যেরা অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিলেন মহর্ষির উপর নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান কবি হলেও সামাজিক মানুষ। পারিবারিক বন্ধন থেকে—সামাজিক সংস্কারের আকর্ষণ থেকে তখনো মুক্ত হতে পারেন নি। সংস্কার ও সংরক্ষণের সঙ্গে সংগ্রাম চলেছিল চিরদিন, একটা আপসের মনোভাব। সেটা প্রায় সুবিধাবাদের পর্যায়ে পড়ে। কখনো কখনো সেরূপ অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকেও মেনে নিতে হয়েছিল পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিকের চাপে।

৪৮

১৩০৮ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মধ্যে দুই মেয়ের বিবাহ হয়ে গেল; বেলা চলে গেলেন জামাতা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মজঃফরপুরে— তিনি সেখানে উকিল। রানী রয়ে গেল পিতৃগৃহে, স্বামী আমেরিকায়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এলেন স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে। উঠলেন 'শান্তিনিকেতন' অতিথিশালায়। সেখানে বারোমাস থাকা যায় না, সেটা ট্রাস্ট সম্পত্তি। তা ছাড়া সেখানে মাছ মাংস খাওয়া নিষেধ। তাই শান্তিনিকেতন জমির পূর্ব দিকে বোলপুর যাবার রাস্তার ধারে কয়েক বিঘা জমির একটা ফালি পড়েছিল, সেখানে একটা খড়ের চাল দেওয়া বাড়ি পত্তন করলেন। সেটা হল 'নূতন বাড়ি'। সে বাড়িতে এখন থাকেন বিশ্বভারতীর কয়েকটি কর্মী-পরিবার। এখানে এককালে মেয়ে-বোর্ডিং ছিল। তার পূর্বে শিশু-বিভাগও ছিল অনেক দিন।

শান্তিনিকেতনে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনার কথা কবি ভেবেছেন কিছুকাল থেকে; বৎসর-তিন পূর্বে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপন করবেন বলে একটা পাকা বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন, সেটাকে কেন্দ্র করে এই আবাসিক বিদ্যালয়ের পত্তন হল। সে বাড়ি এখন বিশ্বভারতী গ্রন্থসদনের অন্তর্গত। সামনের বারান্দা ও তিনখানি ঘর ছিল এই অট্টালিকার আদিরূপ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রমপ্রতিষ্ঠা ও মন্দিরস্থাপন করেছিলেন, কিন্তু এতদিন সেখানে কোনো স্থায়ী কাজ হয় নি। ১৩০৮ সনে ৭ই পৌষের উৎসবের দিন ব্রহ্মচর্যাশ্রম আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হল।

...পাঁচটি ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।... এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। ...[ব্রহ্মবান্ধব] তাঁর কয়েকটি শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন।" রবীন্দ্রনাথকে যে 'গুরুদেব' বলা হয় সেটি প্রবর্তন করেন ব্রহ্মবান্ধব। তবে এখানে একটা কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের 'গুরুদেব' নামের

মধ্যে সম্ভ্রমের ভাব থাকলেও, শঙ্কার ভাব তো ছিলই না— একটা কোনো দূরত্বের বোধও জাগাত না। আমরা তাঁকে সহজ মানুষ ভাবেই দেখতাম ; আর তিনিও কোনোদিন তাঁর 'গুরুত্ব' ও 'দেবত্ব' আমাদের উপর চাপাবার চেষ্টা মাত্র করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের 'বোর্ডিং-স্কুল'কে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রূপদান করলেন ব্রহ্মবান্ধব। রবীন্দ্রনাথ পত্রে ও প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের আদর্শ ব্যাখ্যা করছেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে শান্তিনিকেতনে বসে থেকে স্কুল চালানো ও আশ্রম গড়া সম্ভব ছিল না।

ব্রহ্মবান্ধব মাস-চার ছিলেন। রাজনীতি তাঁকে টানছে, তা ছাড়া এ ভাবে এক জায়গায় বসে কাজ করা তাঁরও স্বভাববিরুদ্ধ।

গ্রীষ্মাবকাশের পর 'হেড্‌মাস্টার' হয়ে এলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক যুবক গ্র্যাজুয়েট। কবির প্রাচীন ভারতের আদর্শে আশ্রমস্থাপনার পরিকল্পনা এই কয়মাসের অভিজ্ঞতায় খানিকটা ম্লান হয়ে এসেছে। তিনি ভেবেছিলেন, ছাত্রদের কাছে বেতন না নিয়ে আশ্রমবিদ্যালয় চালাবেন। মনে করেছিলেন, তাঁর আদর্শবাদে মুগ্ধ হয়ে দেশের লোকে টাকা দেবে ; কারণ, চার দিকেই তো হিন্দুত্বের জয়গান শোনা যাচ্ছে। তা হল না। গ্রীষ্মের পর আশ্রমে নয়, বোর্ডিং-স্কুলে— গুরু নয়, হেড্‌মাস্টার এলেন। ব্রহ্মচারীদের নিকট থেকে বেতনাদি গ্রহণের ব্যবস্থা হল। কারণ, দেখা গেল, ছাত্রদের তাপসকুমার সাজানো যায়, চেলীর কাপড় পরানো যায়, কিন্তু শিক্ষকেরা তো আর তপস্বী নন। তাঁদের সংসার আছে, অভাব আছে, আকাজ্ক্ষা আছে, তাঁদের অর্থের প্রয়োজন নিত্য। সুতরাং ছাত্র ও অভিভাবকগণের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করতেই হল। কবির স্বপ্নের আশ্রম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। তবে 'আশ্রম' শব্দটি বহু কাল চলে এসেছিল।

৪৯

কবি ভেবেছিলেন, শান্তিনিকেতনে নূতন বাড়িতে তাঁর ঘর-সংসার পাতবেন। কিন্তু ভবিতব্য অন্যরূপ। কবিপত্নী সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন ভাদ্র মাসে (১৩০৯)। কলিকাতায় নিয়ে যেতে হল।

সেখানে আধিব্যাধির মধ্যেও বিদ্যালয়ের ভাবনা ছাড়ে না। তার উপর দেশের কথাও ভাবতে হয়। দেশের দিকে তাকিয়ে দেখেন নূতন জবরদস্ত বড়োলাট লর্ড কর্জন মহারানী ভিক্‌টোরিয়ার মৃত্যুর পর রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয়রূপে দিল্লীতে দরবার ডাকছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে লেখেন 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধ। লর্ড কর্জন কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় বলেছিলেন যে, exaggeration বা অত্যুক্তি করা প্রাচ্যদেশীয় বিশেষত্ব। এই 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধ তারও জবাব বটে।

শান্তিনিকেতন থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে— বিদ্যালয়ের সমস্ত যেন খেলার মতো বোধ হচ্ছে। তাই কবি বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে অতি বিস্তারিত পত্র লিখে পাঠালেন (কার্তিক ১৩০৯)। এই পত্রের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধান রচনার চেষ্টা দেখা দিল। এর পর পরিচালনা-বিধির কত পরিবর্তনই হয়। শেষরূপ নিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে।

এরই মধ্যে 'কর্মফল' নামে গল্প লিখতে হল 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র জন্য অর্থের তাগিদে। স্ত্রীর ব্যাধি— যার সূত্রপাত হয় শান্তিনিকেতনে— তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মৃণালিনী দেবী বুঝতে পারছেন তাঁর দিন অবসানের দেরি নেই। তাই খুবই জিদ্ করে মেজো জামাইকে আমেরিকা থেকে আনালেন— রেণুকার ফুলশয্যা হয় নি যে এখনো! তিনি সে-কাজ যেন করে যেতে চান। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হল ১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ (২৩ নভেম্বর ১৯০২)— বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার ঠিক এগারো মাস পরে।

মৃত্যুকালে মৃণালিনী দেবীর বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ বৎসর; রবীন্দ্রনাথের বয়স একচল্লিশ। জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ বৎসর— এন্‌ট্রান্স্ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। মীরার বয়স দশ। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের বয়স আট বৎসর। বেলা ও রানীর তো বিবাহ হয়ে গেছে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতা লিখে মৃণালিনী দেবীকে

তাঁর শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করলেন, সেগুলি 'স্মরণ' কাব্যখণ্ডে সংগৃহীত আছে।

'উৎসর্গ' কাব্যের সমসাময়িক কয়েকটি কবিতাতেও এই সাশ্রু বেদনার ফল্গুধারা প্রবাহিত, যখন বলছেন :

মন্ত্রে সে যে পূত রাখীর রাঙা সুতো
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে—

মৃত্যুর রূপ প্রগাঢ় উপলব্ধির উদ্ভাসে দেখেছেন নানা ভাবে, বলেছেন :

নমি হে ভীষণ, মৌন রিক্ত,
এসো মোর ভাঙা আলয়ে।

ঐ সময়ের একটি কবিতায় লিখেছেন ;

পথের পথিক করেছ আমায়,
সেই ভালো ওগো সেই ভালো।...
সাথি যে আছিল নিলে কাড়ি,
কী ভয় লাগালে গেল ছাড়ি!
একাকীর পথে চলিব জগতে,
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

শোক তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। জীবনে বহু আঘাত পেয়েছেন— কোনো দুর্ঘটনায় তাঁকে শোককাতর ও বাইরের থেকে বিচলিত হতে দেখা যায় নি। তিনি জানতেন— সংসার কর্মভূমি, কর্তব্যস্থল ; তার অফুরন্ত চাহিদা তাঁকেই পূরণ করতে হবে।

সব থেকে বড়ো সমস্যা দেখা দিল মেজো মেয়ে রানীকে নিয়ে। রানী কিছুকাল থেকে অসুস্থ। প্রথমে মনে হয়েছিল গলক্ষত ; ক্রমে জানা গেল, যক্ষ্মা। কবি স্ত্রীর মৃত্যুর পর সকলকে শান্তিনিকেতনে আনলেন।

কিন্তু রানীর রোগ বেড়ে চলেছে। ডাক্তারেরা হাওয়া-বদলের জন্য বললেন, কবি রানীকে নিয়ে হাজারিবাগে গেলেন। ১৯০২।৩ সালে হাজারিবাগ যেতে হলে গিরিধি থেকে পুশ্‌পুশ-নামক ঠেলা-পাল্কিগাড়ি করে যেতে হত। এই পথে বহু বৎসর পূর্বে একবার এসেছিলেন বেড়াবার জন্য ; এবার চলেছেন ভারাক্রান্ত মনে পীড়িত মেয়েকে নিয়ে।

হাজারিবাগে কয়েক মাস থাকলেন। কিন্তু রানীর স্বাস্থ্য ভালো হল না। স্থির হল আলমোড়ায় যাবেন।

স্ত্রীর মৃত্যু, কন্যার অসুখ, সকল ঘটনার মধ্যে প্রতি মাসেই বঙ্গদর্শনের দাবি যথাযথভাবে পূরণ করে চলেছেন। হাজারিবাগ থাকতে থাকতে 'নৌকাডুবি' নামে নূতন উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন— ১৩১০ বৈশাখ সংখ্যা থেকে সেটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল। কবিতাও চলছে মাঝে মাঝে।

৫০

রুগ্‌ণ মেয়েকে নিয়ে হাজারিবাগ থেকে গিরিধি হয়ে আলমোড়া যাওয়া যে কী কষ্টের ব্যাপার তা এখন কল্পনা করা শক্ত। পাহাড়ে পৌঁছিয়ে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন, "সংসারের তরণীটি নানাপ্রকার তুফানের উপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছি— কবে একটা বন্দরে টেনে এনে নোঙর ফেলতে পারব জানি নে। ছেলেদের মধ্যে কেউ এক দিকে, কেউ আর- এক দিকে, আমার বিদ্যালয় এক দিকে এবং আমি আধিব্যাধি নিয়ে অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছি। বিচ্ছিন্ন সংসারটাকে এক জায়গায় জমাট করে নিয়ে বসবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়েছে।"

আলমোড়া যাবার সময় মীরা ও শমীন্দ্রকে বৌঠাকুরানী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে পাঠিয়ে দেন। রথীন্দ্রনাথ বোর্ডিঙে; বেলা মজঃফরপুরে স্বামী-গৃহে।

আধিব্যাধি যাই থাক্, কবির মন সাংসারিক দুর্ভাবনায় অসাড় হয় না; বঙ্গদর্শনের জন্য উপন্যাস প্রবন্ধাদির রচনা চলছে যথানিয়মে। কিন্তু সব থেকে মন ও সময় যাচ্ছে 'কাব্যগ্রন্থ' সম্পাদনে। ১৩০৩ সালে কাব্যগ্রন্থাবলী প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এবারকার কাব্যগ্রন্থের পরিকল্পনা অন্যরূপ। অনেকটা বিষয়বস্তু বা ভাবের বিবর্তনের দিক থেকে কবিতাগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করা হল। এ কাজে তার প্রধান সহায় হয়েছেন মোহিতচন্দ্র সেন। তাঁরই 'সম্পাদকতা'য় বইগুলি প্রকাশিত হচ্ছে মজুমদার লাইব্রেরি থেকে।

আলমোড়ায় বাসকালে এই কাব্যগ্রন্থে 'শিশু' সম্বন্ধে পুরাতন কবিতাগুলি

সংকলন করতে গিয়ে মনে হচ্ছে— সংগ্রহটি অসম্পূর্ণ। তাই নূতন এক ঝাঁক কবিতা লিখলেন— প্রায় ত্রিশটা। পুরাতন ও নূতন কবিতা সংগ্রহ করে হল 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ।

মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা দেবী কবিতাগুলি পড়ে কবিকে প্রশ্ন করে পাঠান যে, সব কবিতাই খোকার জবানিতে লেখা, খুকির নামে একটা কবিতাও নেই কেন। সুশীলা দেবীর দুটি ছোটো মেয়ে; তাই স্বভাবতই তাঁর মাতৃহৃদয়ে এই প্রশ্নটা জেগেছিল। এর জবাবে রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লেখেন, "আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে··· খোকা এবং খোকার মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী— তখন খুকি ছিল না— মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই [শমীন্দ্রনাথ] তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল, সেইজন্য লিখতে গেলেই খোকা ও খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মতো নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে— সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এইরকম খেলা খেলছে— তাকে নিবারণ করতে পারি নে।"

তিন মাসের উপর আলমোড়ায় থেকেও রানীর শরীরের উন্নতি হল না। কলিকাতায় ফিরে আসবার জন্য সে জিদ ধরল; বোধ হয় বুঝতে পারছিল যে, তার আয়ু শেষ হয়ে আসছে। কলিকাতায় ফেরার কয়েক দিনের মধ্যেই রানীর মৃত্যু হল (আশ্বিন ১৩১০)। দশ মাসের মধ্যে স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যু ঘটল। রানীকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন; কিন্তু কোথাও তার প্রকাশ নেই।

বঙ্গদর্শন পত্রের জন্য 'নৌকাডুবি' উপন্যাস নিয়মিত ভাবে লিখে চলেছেন, বিদ্যালয়ের তদারক করছেন দূর থেকে। সামাজিক কর্তব্যও সবই হাসিমুখে করে চলেছেন।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় এখনো দু বৎসর পার হয় নি; কিন্তু কবি সেখানে থাকতে না পারায় মাঝে মাঝে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয় শিক্ষকদের মধ্যে।

কবি কিন্তু আশাবাদী; তিনি লিখছেন, "প্রতিদিন আমি এই বিস্ময় অনুভব করিতেছি যে, সমস্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় নবতর প্রাণ ও প্রবলতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।" কবির এই বিশ্বাসের মূলে ছিল

সতীশচন্দ্র রায়ের ন্যায় দুর্লভচরিত্রের শিক্ষককে তাঁর কাজের মধ্যে পাওয়া। বরিশালের এই আদর্শবাদী তরুণ কবিকে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন বার বার স্মরণ করেছেন।

সতীশের মধ্যে কবি যেন তাঁর আদর্শের রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। অথবা তিনি অকালে মারা যান বলে হয়তো তাঁকে নিজের মনের ভাবনায় কল্পনায় মনের মতো করে গড়েছেন ; যেমন গড়েছিলেন তাঁর বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীকে।

কিন্তু বৎসরকালের মধ্যে বিদ্যালয়ের নবতর প্রাণ বড়ো রূঢ় আঘাত পেল সতীশচন্দ্র রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে।

মাঘোৎসবের পর বিদ্যালয় খুলল ; তবে সাময়িকভাবে বিদ্যালয় শিলাইদহে নিয়ে যাওয়া হল। গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে ফিরে এল। এবার সেখানে মোহিতচন্দ্র সেন এলেন প্রধান শিক্ষকরূপে। মোহিতচন্দ্র দার্শনিক মানুষ, সাহিত্যরসিক। এতদিন দূর থেকে কাব্য-গ্রন্থাবলী সম্পাদন করছিলেন সে ছিল ভালো। ভাবলেন, কবির আদর্শকে মূর্তি দেবেন। কিন্তু কবির সদা-চলমান মনের কোন্ রূপকে মূর্তি দেবেন?

সে পরীক্ষা ব্যর্থ হল। দার্শনিকের উপর অযথা ভার পড়ল, এবং দার্শনিকের বাস্তববোধ না থাকায় অসম্ভব কাজের ভার নিলেন। শরীর ভেঙে গেল, তিনি ভাদ্র মাসে চলে গেলেন। বিদ্যালয়ের ভার পড়ল ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের উপর। মোহিতচন্দ্র ছিলেন নববিধান সমাজের উদার ব্রাহ্ম ও পাশ্চাত্য দর্শনাদিতে সুপণ্ডিত। ভূপেন্দ্রনাথ সনাতনী হিন্দু, প্রাচ্য ধর্মাচার সম্বন্ধে অতিনিষ্ঠাবান। বিদ্যালয়ের প্রকৃতির মধ্যে বেশ অদলবদল এল। বিদ্যালয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস কবিজীবনের বিচিত্রধারার অনুসরণে অন্যত্র আলোচনার ইচ্ছা আছে। উপস্থিত আমরা এসে পড়েছি ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে।

৫১

সময়টা হচ্ছে বঙ্গ-অঙ্গচ্ছেদ-জনিত আন্দোলন-পর্ব। অধিকাংশ পাঠক জানেন যে, ১৯৪৭ সালের পূর্বে ১৯০৫ সালে একবার বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল ; সেবার

দুটো পৃথক্ প্রদেশ হয়— এবার হল দুটো পৃথক্ রাজ্য। সেবার ফাটল জোড়া লেগেছিল, তবে চিড়ের দাগটা থেকে যায়।

লর্ড্ কর্জন তখন ভারতের বড়োলাট (১৮৯৯-১৯০৫); কলিকাতা ভারতের রাজধানী; সিমলা পাহাড় গ্রীষ্মাবাস। বাংলাদেশে যে জাতীয়তা-বোধ জেগে উঠছে, তাকে খর্ব করা ব্রিটিশ কূটনীতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গকে পৃথক্ প্রদেশ করবার একটা পরিকল্পনা চলছে ভিতরে ভিতরে। সিমলা পাহাড়ে লাট-ভবনে শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে গোপন বৈঠক বসল; তার পর ঢাকায় গিয়ে কর্জন মুসলমানদের স্বপক্ষে টানবার জন্য বললেন যে, নূতন প্রদেশ গঠিত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রাধান্য সেখানে বাড়বে। তিনি ভেদনীতির ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করলেন। দ্বিধাহীন মনে স্থির করলেন বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ড করা হবে।

দেশে প্রতিবাদ শুরু হল; সে বিস্তারিত ইতিহাস এখানে বলা সম্ভব নয়। তবে প্রতিবাদ তখনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা বয়কট অর্থাৎ অর্থ নৈতিক প্রত্যাঘাতের রূপ গ্রহণ করে নি। লোকের বিশ্বাস মৌখিক প্রতিবাদ -দ্বারা ব্রিটিশ কূটনীতির বদল হতেও পারে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' নামে একটি ভাষণ পাঠ করলেন (২২ জুলাই ১৯০৪); ইতিপূর্বে দেশের সমস্যা কী এবং সমাধান কোথায় সে বিষয়ে এমন পরিষ্কার করে আর কেউ বলেন নি। রাজদ্বারে আবেদন বা স্বাক্ষর জড়ো করে 'মেমোরিয়াল' প্রেরণ, বক্তৃতামঞ্চে ইংরেজি ভাষায় ক্রোধের অভিনয়, কাগজে ইংরেজকে গালি-বর্ষণ প্রভৃতি মামুলি পন্থা ছিল ক্ষোভ প্রকাশের। রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণে দেশের সমস্যার নিদান নির্ণয় করে বললেন, গ্রামের দিকে ফিরে তাকাও, সেখানে দেশের প্রাণশক্তি— এই গ্রামকে বাঁচাও— সেখানে সংঘশক্তি জাগাও। সংঘশক্তি কী ভাবে জাগতে পারে তার বিস্তৃত আলোচনা ও কর্মপদ্ধতি তিনি দেশবাসীর কাছে পেশ করলেন; সে প্রবন্ধ এখনো পড়লে লোকের কাজে লাগতে পারে। "ফিরে চল্ মাটির টানে" গানটি লেখেন প্রায় বিশ বৎসর পরে— সেখানেও সেই একই কথা।

কিন্তু সে যুগের ঝুনো রাজনীতিবিদ্‌রা কবির কথা হেসেই উড়িয়ে

দিলেন; বললেন, রবিবাবুর কথামত কাজ করলে রাজনীতির ইতি হবে। অর্ধশতাব্দী পরে দেখা গেল পল্লীসংগঠন ও গ্রামোদ্যোগ সম্বন্ধে একজন কবি যা বলেছিলেন, জাতিগঠনের পক্ষে তাই হল মূল কথা।

দেশ স্বাধীন করবার জন্য যে উচ্ছ্বাস উত্তেজনা দেখা দিচ্ছে তার ইন্ধন যোগাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। মহারাষ্ট্র দেশে আত্মচেতনা এসে গিয়েছে, বহু বৎসর শিবাজিকে কেন্দ্র করে সেখানে উৎসব হচ্ছে। বাংলাদেশেও তার তরঙ্গ এসে পৌঁছল বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের মুখে—রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'শিবাজি উৎসব' (২৭ অগস্ট ১৯০৪):

মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজি'।
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পুরব
দক্ষিণ ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

এখন থেকেই বাংলাদেশে সন্ধান শুরু হলো বাঙালি 'জাতীয়' বীরের। এ দিকে দেশচ্ছেদ-প্রস্তাবের কিছুকাল পূর্বে শিক্ষাপ্রসারের অজুহাতে ইংরেজ সরকার বঙ্গদেশে ভাষাবিচ্ছেদের এক প্রস্তাব পেশ করেছিলেন—পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, এ প্রকার এলেকা ভাগ করে স্থানীয় কথ্যভাষায় পাঠ্যপুস্তক লেখানো ও বিদ্যালয়ে শেখানোর। রবীন্দ্রনাথের তেজোগর্ভ প্রতিবাদ প্রবন্ধ 'সফলতার সদুপায়' এখনো পড়বার মতো। বঙ্গচ্ছেদ করাই সাব্যস্ত হওয়ায় ভাষাবিচ্ছেদের প্রস্তাবটা চাপা পড়ল।

সরকারি সাহেব-মহল জানতেন, বঙ্গভঙ্গের বিষবীজ থেকে যে গাছ গজাবে তাতেই প্রচুর বিষফল ফলবে। তাই বাংলাদেশে লীগ-মন্ত্রিত্বের সময়ে বঙ্গভাষার কতখানি হিন্দু কতখানি মুসলমানি তাই নিয়ে অনেক লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল— সে-সব কথা এখন লোকে ভুলে গিয়েছে।

বঙ্গচ্ছেদের দিন ঘনিয়ে আসছে— এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার অটল অচল। ১৯০৫ সালের ৭ই অগস্ট বাঙালি ঘোষণা করলে যে, তারা ইংরেজের তৈরি জিনিস বর্জন বা বয়কট করবে যতদিন না বঙ্গচ্ছেদ রদ হয়; প্রতিজ্ঞাপত্রে লোকে সই করবার সময়ে 'যতদিন' প্রভৃতি শর্ত কেটে দিত। রবীন্দ্রনাথ গানে লিখলেন বটে "ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি কিনব না", কিন্তু অন্তর থেকে নিছক নেতিবাদকেই সমর্থন করতে পারছেন না। "কিনব না" বললেই তো নগ্নতা ঘুচবে না। বয়কট ঘোষণার কয়দিন পরে তিনি 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' -শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করলেন কলিকাতার টাউন হলে; তাতে তিনি বললেন, "দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত এক জন হিন্দু ও এক জন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব— তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব— তাঁহাদিগকে কর দান করিব— তাঁহাদের আদেশ পালন করিব, নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব— তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া দেশকে সম্মানিত করিব।" আরো বললেন, "আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে।··· চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে।" বয়কট বা বর্জননীতি শুধু ইংরেজের তৈরি কাপড় লবণ মনোহারীসামগ্রী-বয়কটের মধ্যে সীমায়িত করলে চলবে না, শাসনবিষয়ে বয়কট করে আত্মশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে— গ্রামের ভিতর দেশের অন্তস্তলে প্রবেশ করতে হবে।

এই বয়কট-আন্দোলনকামীদের উদ্দেশে কবি বললেন— উপস্থিত সুবিধার খাতিরে নিজের আদর্শকে খর্ব করার প্রতি তাঁর আস্থা নেই; ইংরেজের উপর রাগারাগি করে ক্ষণিকের উত্তেজনায় মেতে ওঠা সহজ, সেই সহজ পথই শ্রেয়ের পথ নয়। ইংরেজ আমাদের প্রার্থনা পূরণ করবে না, অতএব আমরা তাদের কাছে যাব না, এ বুদ্ধিটা লজ্জাকর। তাই

বললেন, "পৌরুষবশত, মনুষ্যত্ববশত, নিজের প্রতি— নিজের অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষাবৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।"

বুদ্ধির দিক থেকে দেশের পরিস্থিতিকে বিচার করলেও ভাবের দিক থেকে আন্দোলনে ইন্ধন জোগাচ্ছেন গান লিখে। বাংলার নিজস্ব বাউল সারি ভাটিয়ালি রামপ্রসাদী প্রভৃতি সুরে অনেকগুলি গান লিখলেন বঙ্গচ্ছেদের মুখে। বঙ্গচ্ছেদ সরকারিভাবে কার্যে পরিণত হল ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর থেকে (৩০ আশ্বিন ১৩১২)। কবি লিখলেন "বাংলার মাটি, বাংলার জল" গানটি; প্রস্তাব করলেন— সেদিন অরন্ধন হবে, লোকে গঙ্গাস্নানে যাবে, পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধবে। রবীন্দ্রনাথ নিজে মিছিলের সঙ্গে ঘুরলেন পাড়ায় ভদ্র-অভদ্র স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার না ক'রে সকলের হাতেই রাখী বাঁধলেন, পথের পাশে মুসলমান গাড়োয়ানের হাতে রাঙা রাখী পরাতে তারা বিস্মিত হল।

৫২

বঙ্গচ্ছেদ-ব্যবস্থার এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলা-সরকারের প্রধান সেক্রেটারি কার্লাইল (Carlisle) সাহেব স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষদের নিকট পরোয়ানা পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, ছাত্ররা যেন স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান না করে।

'কার্লাইল-সার্কুলার' প্রকাশিত হবার (২২ অক্টোবর ১৯০৫) দুদিন পরেই নেতারা সভা করে স্থির করলেন যে, "ইহার একমাত্র প্রতিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করা।" "গবর্মেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবর্মেন্টের চাকুরি দুইই পরিত্যাগ করিতে হইবে" এমন কথাও উঠেছিল। কলিকাতার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে ক্রমশ অনেকগুলি সভায় স্বাধীন জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার জন্য আন্দোলন চলতে থাকে; রবীন্দ্রনাথ একাধিক সভায় উপস্থিত থেকে জাতীয় বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

অল্প দিনের মধ্যে কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষাসমাজের বিধিব্যবস্থার জন্য নেতাদের মন্ত্রণাসভা শুরু হল। সংবিধানপ্রণয়ন-সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত

খসড়া

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
এমন শক্তিমান!
তুমি কি এমন শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান
তোমাদের এমনি অভিমান!
চিরদিন [illegible] টানবে [illegible] পিছে [illegible]
চিরদিন রাখবে [illegible] নীচে,
বল
এত [illegible] নাইরে তোমার
[illegible] সবে না সেই টান।
বাঁধবে
[illegible] যতই ঘেরো
আছে [illegible] বল দুর্বলেরো,
[illegible] হওনা যতই বড়
[illegible] আছেন ভগবান
আমাদের শক্তি মেরে
তোরাও বাঁচবি নেরে,
[illegible]
বোঝা তোর ভারি হলেই
ডুববে তরীখান!

গিরিডি
২৯শে আশ্বিন
১৩১২

ছিলেন ; কিন্তু তিনি চার দিকের কথাবার্তা ও আবহাওয়া থেকে বুঝতে পারলেন যে, উদ্যোক্তারা এক নয়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করাতে চান, শিক্ষার আমূল সংস্কার করে ভারতীয়ভাবে নূতন শিক্ষা দেবার ভাবনা গৌণ। রবীন্দ্রনাথের মতে ভিত্তি থেকে আরম্ভ করতে হবে, ছোটো হতে বড়ো করতে হবে ; অধৈর্যের দ্বারা কোনো কাজ হবে না। অতি-উৎসাহীরা গাছ পুঁতেই ফল চান, অপেক্ষা করতে নারাজ।

রবীন্দ্রনাথ কিছুকালের মধ্যে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মতামত কবির কবিত্বভাবনা বলে সকলে উপেক্ষা করছে। কবির প্রকৃতিতে একই ধরণের উত্তেজনার মধ্যে দীর্ঘকাল থাকাও কঠিন— সেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সংগঠনকার্যে মন দিলেন ; 'খেয়া'র একটি কবিতায় লিখলেন :

> বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই !
> কাজের পথে আমি তো আর নাই।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে স্বরাজের আসল বুনিয়াদ আত্মশাসন প্রবর্তিত করলেন ; গ্রামের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকেরা যেতে আরম্ভ করলেন ; গ্রামের সেবায় সকলের এই প্রথম মন গেল ; দরিদ্রভাণ্ডার খোলা হল ; বিদ্যালয় পরিচালনায় হেডমাস্টারি প্রথা বাতিল করে শিক্ষকগণের উপর সংঘগত দায়িত্ব অর্পিত হল ; ছাত্রসংঘের উপর ভার পড়ল আত্মশাসন ও শৃঙ্খলাবিধানের— আর ছাত্র ও শিক্ষকেরা সকলে মিলে আশ্রমের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকর্মে ব্রতী হলেন। এ-সবের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

৫৩

বয়কট-আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন ; বয়কট সফল হলে ব্রিটিশ বণিকেরা বিপন্ন হবে ; আর ব্রিটিশ বাণিজ্য ধ্বংস হলে সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবে না। তাই নেতাদের জেল দিয়ে, আটক রেখে, শহরে ও গ্রামে পিউনিটিভ-পুলিশ মোতায়েন ক'রে বয়কট-

আন্দোলন ধ্বংস করবার সকলপ্রকার বৈধ ও অবৈধ নীতি অবলম্বিত হল। স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষদের উপর কড়া হুকুম— ছাত্ররা যেন কিছুতেই রাজনীতিতে যোগদান না করে, মিছিলে যোগ না দেয়; অথচ নেতাদের ভরসা এই তরুণরা। গবর্মেণ্টের কোপটা বেশি গিয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর। স্বদেশী আন্দোলন থেকে মুসলমানদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্য সরকারি কর্মচারীরা ও সরকারের খয়েরখাঁ'রা প্রাণ পণ করেছিলেন; কৃতকার্যও হয়েছিলেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগদান করা মৌলবীদের হুকুমতে গুণাহ বা পাপ। তবে এ কথা ভুললেও চলবে না যে, কংগ্রেস-বিশ্বাসী মুসলমানেরও একেবারে অভাব ছিল না।

দেশব্যাপী এই বিক্ষোভ ও অসন্তোষের মধ্যে 'প্রিন্স অব ওয়েল্স্'[১] বাংলাদেশ সফর করে গেলেন (ডিসেম্বর ১৯০৫)— বাঁধাধরা পথ দিয়ে ঘুরলেন, বহু সমারোহে ভোজ খেলেন, বহু দর্শনীয় স্থান দেখলেন, জানতেও পারলেন না বাংলাদেশের লোকে কী চায়। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "দেবতা হউন আর মানবই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, যেখানে কেবল বেত চাবুক জেল জরিমানা পিউনিটিভ-পুলিশ ও গোরা-গুর্খার প্রাদুর্ভাব, সেখানে ভীত হওয়া, নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই।"

৫৪

রবীন্দ্রনাথের দিন কাটে কখনো শিলাইদহে, কখনো বোলপুরে— মাঝে মাঝে কলিকাতায় থাকতে হয় পাঁচ কাজের তাগিদে। লিখছেন 'খেয়া'র কবিতা। বঙ্গদর্শনে 'নৌকাডুবি' শেষ হয়ে গেছে ১৩১২ সালের আষাঢ়ে। তার পর ধারাবাহিক লেখার আর কোনো তাগাদা নেই।

ইতিমধ্যে স্থির করেছেন, জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথকে ও বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকায় পাঠাবেন; সেখানে তাঁরা কৃষি গোপালন প্রভৃতি

১ ইনি তৎকালীন ভারতসম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের পুত্র ও মহারানী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র, পরে যিনি পঞ্চম জর্জ হন। ইঁহার পৌত্রী বর্তমান ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

শিক্ষা করবেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স্ পরীক্ষা-পাসের পর রথীন্দ্র ও সন্তোষচন্দ্রকে সাধারণ কলেজে পড়বার জন্য না পাঠিয়ে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদেশে যাবে ছেলেরা, একটু ভালো করে ভারতের কথা জেনে যাক। তাই সতীশ রায়, মোহিত সেন ও বিধুশেখর শাস্ত্রী এঁদের পড়াতেন।

সে যুগে ধনীর সন্তানেরা বিলাত যেতেন— মেধাবী হলে সিবিল সার্বিসের পরীক্ষার জন্য, অথবা ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যেতেন জাপানে স্বদেশী জিনিস তৈরির হিড়িকে— বিস্কুট, সাবান, জুতার কালী প্রভৃতি প্রস্তুতপ্রণালী শিখতে। রবীন্দ্রনাথ এঁদের পাঠালেন কৃষি শেখবার জন্য। ভারতের গোড়া-ঘেঁষা সমস্যা— পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে, পর্যাপ্ত খাদ্য পেলেই মানুষের উদ্‌বৃত্ত শক্তি বাড়বে এবং তারই উপর নির্ভর করে জাতির সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি। সেই সমস্যা-সমাধানের জন্য রথীন্দ্রনাথ (১৭) ও সন্তোষচন্দ্রকে (১৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠালেন কৃষি ও গোপালন বিদ্যা শিক্ষার জন্য; কিছুকাল পরে কনিষ্ঠ জামাতাকেও পাঠান এই একই উদ্দেশে। রথীন্দ্রনাথরা গেলেন প্রশান্ত মহাসাগরের পথে।

৫৫

রথীন্দ্রনাথদের কলিকাতার জাহাজে রওনা করে দেবার পর কবি চললেন পূর্ববঙ্গে। বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন (এপ্রিল ১৯০৬) হবে— সভাপতি ব্যারিস্টার এ. রসুল, তাঁর দেশ কুমিল্লা। তিনি হিন্দু-মুসলমান-ঐক্যে বিশ্বাসী এবং বঙ্গভঙ্গেরও বিরোধী। এই রাজনৈতিক সম্মেলনের সঙ্গে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলন আহূত হয়েছে— রবীন্দ্রনাথ তার সভাপতিত্ব করবেন।

আজ বরিশাল পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত; সেখানকার ভদ্র হিন্দুসমাজ প্রায় অধিকাংশ দেশত্যাগী। কিন্তু অর্ধশতাব্দ পূর্বে বরিশাল ছিল বয়কট-আন্দোলনের পীঠস্থান। নেতা ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত; তাঁর চেষ্টায় বাখরগঞ্জ জেলার বাজারে বিলাতি লবণ পাওয়া যেত না, বিলাতি কাপড়ের

বেচাকেনা বন্ধ হয়ে এসেছিল। তিনি এই প্রাদেশিক সম্মেলনের আহ্বায়ক। আর সাহিত্যসম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন দেবকুমার রায়চৌধুরী— লাখুটিয়ার তরুণ জমিদার, সাহিত্যিক ও কবি— দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতুল।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলন-আহ্বানের কল্পনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে। তিনি বলেছিলেন যে, বঙ্গচ্ছেদ হয়েছে বলেই সজ্ঞানে সযত্নে বাঙালির চিন্তার ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। কবির সেই প্রস্তাব থেকেই বাংলাদেশের জেলায় জেলায় সাহিত্যসম্মেলন আহ্বানের ইচ্ছার উদ্ভব, আর বোধ হয় সেইজন্যই লোকে প্রথম সভাপতি মনোনীত করে তাঁকেই।

কিন্তু প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন পণ্ড হয়ে গেল। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি, ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন সাহেবের জুলুমে ও পুলিশের গুণ্ডামিতে সভা বসতে পারল না। পুলিশের লাঠিতে প্রথম রক্তপাত হল নববর্ষের দিন (১৩১৩); তেরো বৎসর পরে প্রায় এই দিনেই গুলিবর্ষণে নিরীহ লোক মরেছিল জালিয়ানালাবাগে।

০

বরিশাল থেকে নেতারা কলিকাতায় ও কবি বোলপুরে ফিরে এলেন।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার কয়েক মাসের মধ্যে নেতাদের মধ্যে কর্মপদ্ধতি নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল ; ক্রমশ সেই ভেদটা স্পষ্ট মনান্তরে পরিণত হল। খবরের কাগজে পরস্পর পরস্পরকে অভদ্রোচিত আক্রমণ শুরু করলেন— আক্রমণ বললে ভুল হয়, খেউড় গাওয়া চলল।

রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে নিশ্চেষ্ট শান্তির মধ্যে ডুব মেরে বসে থাকবেন ভেবেছিলেন, পারলেন না। কলিকাতায় এসে 'দেশনায়ক' নামে এক প্রবন্ধ পড়লেন ; তাতে বললেন, "কলহ অক্ষমের উত্তেজনা-প্রকাশ তাহা অকর্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন।" তিনি স্পষ্ট বললেন যে, দেশকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করতে হলে একনায়কত্বের প্রয়োজন। তাই তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশ্য ভাবে দেশনায়করূপে বরণ করে নেবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করলেন। সুরেন্দ্রনাথকে লোকে বলত বাংলার 'মুকুটহীন রাজা'। (এই ঘটনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে আর-এক দিন

'দেশনায়ক' নামে আর-এক প্রবন্ধ লিখে সুভাষচন্দ্রকে কবি অভিনন্দিত করেছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে যে প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন পরবর্তী ঘটনায় তা দৈবপ্রেরিত ভবিষ্যদ্‌বাণীর মতোই অব্যর্থ মনে হয়েছে।)

কয়েক দিন পরে ডন্‌ সোসাইটির এক সভায় 'স্বদেশী আন্দোলন' সম্পর্কে এক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "এইরূপ মত্ত অবস্থায় বেশি কিছু পাইবার আশা করা যাইতে পারে না।… আমিও এই উত্তেজনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি নাই ; এবং তা অস্বীকার করিবার কোনো কারণ দেখি না।"

আর-এক দিনের সভায় বললেন, "এখন আমাদের ছোটো ছোটো organization তৈরি করা উচিত।" এই সভায় তিনি পল্লীসমিতি-স্থাপনের কথা বললেন—"আত্মশক্তি চালনা করে কর্তৃত্বের প্রকৃত অধিকারী হওয়ার জন্য এইরূপ পল্লীসমিতিতে আমাদের এখন হাতেখড়ি করিতে হইবে।" এই পল্লীসমিতি সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত খসড়া প্রস্তুত করে দেশবাসীর সম্মুখে পেশ করেছিলেন, নিজে জমিদারিতে গিয়ে তার প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

বঙ্গচ্ছেদ হবার দশ মাস পরে কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কাজ আরম্ভ হল (১৫ অগস্ট ১৯০৬)। পরিষদের শিক্ষা-আদর্শ, পাঠ্য - সূচী ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা চলে দীর্ঘকাল ; রবীন্দ্রনাথ এই-সবের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। 'শিক্ষাসমস্যা' 'শিক্ষাসংস্কার' 'আবরণ' 'জাতীয় বিদ্যালয়' 'ততঃ কিম্‌'-শীর্ষক প্রবন্ধগুলি এই সময়ে লিখিত ও নানা সভাক্ষেত্রে পঠিত হয়। এর পর জাতীয় বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন আরম্ভ হলে, সেখানে তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে চারটি বক্তৃতা দেন ; সেগুলি তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর আরো যোগ ছিল। ১৯০৬-০৭ এই দুই বৎসরে তিনি পরিষদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিচালক ও পরীক্ষক ছিলেন। কিন্তু কবি তাঁর বিদ্যালয়কে এই আন্দোলনের সহিত জড়িত হতে দেন নি। আশ্রম রাজনীতির

বাইরের প্রতিষ্ঠান; সে সকলকে আশ্রয় দেবে। কিন্তু কবির এই আদর্শ যে সকল কর্মী নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছিলেন, তা বলা যায় না।

৫৬

কবির দিন শান্তিনিকেতনেই কাটে। ১৩১৩ সালের শেষ দিকের প্রধান কাজ হচ্ছে গদ্যগ্রন্থাবলীর সম্পাদন ও প্রকাশন। তিন বৎসর পূর্বে মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ১৩১৪ বৈশাখ মাসে বের হল; তাতে লেখা ছিল, "গদ্য গ্রন্থাবলীর উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে উৎসর্গ" করা হল। ষোলো খণ্ডে গদ্য রচনা ছাপা হয় (১৯০৭-০৯), গল্প উপন্যাস বাদে।

ইতিমধ্যে মহর্ষির মৃত্যু হয়েছে (জানুয়ারি ১৯০৫); সংসারে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের নিচুবাংলায় এসে বাস করছেন; তাঁর পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অন্যতম ন্যাসী— তিনি দ্বিতল 'শান্তিনিকেতন' গৃহের একতলায় বাস করছেন। রবীন্দ্রনাথ নতুন বাড়ির পূর্ব দিকে নিজের জন্য ছোটো একটা দ্বিতল বাড়ি তৈরি করিয়ে নিলেন; সেটির নাম পরে রাখা হয় 'দেহলি'; বহুবৎসর কবির এখানে কেটেছিল। সন্তানদের মধ্যে বেলা স্বামীগৃহে, রথীন্দ্রনাথ আমেরিকায়; মীরা ও শমীন্দ্র নূতন বাড়িতে থাকে।

এবার (১৩১৪) জ্যৈষ্ঠ মাসে মীরার বিবাহ দিলেন। জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ -ভুক্ত সুপুরুষ যুবক। এই উদ্যমশীল সুদর্শন যুবকটিকে দেখে কবি খুবই আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে জামাতা করেন। বিবাহ শান্তিনিকেতনের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হল আদিসমাজ-পদ্ধতিতে, তবে নগেন্দ্রনাথ অনেক বিষয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন।

বিবাহের পর নগেন্দ্রনাথকে কবি আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান পড়াবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ, বিদেশে উভয়ের ব্যয়ভার বহন করতে কবিকে বেশ কষ্ট পেতে হচ্ছে। স্ত্রীর গয়নাপত্র তো আগেই গিয়েছে, এবার পুরীতে যে একটা বাড়ি এক সময়ে কিনেছিলেন, সেটাও বিক্রয় করে দিতে হল। তখন তাঁর জীবন খুবই

অনাড়ম্বর ছিল—একটি ভৃত্যই রন্ধনাদি সকল কাজ করে, খাওয়াদাওয়া নিতান্ত সাদাসিধা, পাথরের থালায় ভাত ব্যঞ্জনাদি সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের মতনই খেতেন। গৃহসজ্জা ছিল একখানা সাধারণ খাট—কাছেই লেখার সরঞ্জাম, ডেক্‌স্ প্রভৃতি।

৫৭

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত বদল হয়ে চলেছে; নরমপন্থী ও চরমপন্থী—মডারেট ও এক্‌স্‌ট্রিমিস্ট্—এই দুই দলের মতের ভিন্নতা ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' দৈনিক সংবাদপত্র ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ -সম্পাদিত 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক পত্র নরমপন্থীদের কাগজ, আর শিশিরকুমার ঘোষ -সম্পাদিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও কৃষ্ণকুমার মিত্র -সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিক পত্র তখনকার আদর্শে চরমপন্থীদের মুখপত্র। আর-একটু চড়া সুরে বাঁধা সাপ্তাহিক পত্র 'নবশক্তি' বের হল; সম্পাদন করলেন গিরিধির অভ্রখনির মালিক, বরিশালের মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। চরম-সুরে-বাঁধা 'যুগান্তর' পত্রিকা আবির্ভূত হল সন্ত্রাসবাদীদের মুখপত্ররূপে। ব্রহ্মবান্ধব বের করলেন 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্র। 'যুগান্তর' সাপ্তাহিকের ভাষা ওজস্বী, শিক্ষিতদের উদ্দেশেই লিখিত। 'সন্ধ্যা' দৈনিক লেখা হত একেবারে খাঁটি বাংলায়, তারও প্রচারের বিষয় ছিল বিপ্লব—তবে যুগান্তর-মার্কা নয়।

ইংরেজিতে নূতন কাগজ বের হল 'বন্দেমাতরম্'; সম্পাদক হলেন তখনকার দিনের চরমপন্থীদের নেতৃস্থানীয় বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্র তাঁর 'New India' পত্রিকার মন্ত্র করেছিলেন India for Indians। 'বন্দেমাতরম্ পত্রিকার' মন্ত্র হল: Autonomy absolutely free from British Control অর্থাৎ, ইংরেজের কাছে পুরোপুরি সাবালকত্বের স্বীকৃতি। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে এসেছেন অরবিন্দ ঘোষ; ইনি বরোদা কলেজের ভালো বেতনের কাজ ছেড়ে কলিকাতায় এসে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে কলেজ-বিভাগের অধ্যক্ষতার ভার নিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য বাংলাদেশে বিপ্লববাদ-প্রচার। 'বন্দেমাতরম্' পত্রে মুদ্রিত অরবিন্দের রচনা রাজদ্রোহ-দমন আইনের আওতায়

পড়ে গেল। সম্পাদক বলে অনুমিত বিপিনচন্দ্রের সাক্ষ্য দিতে তলব হলে, তিনি আদালতে কোনোপ্রকার প্রশ্নের জবাব দিলেন না—ভারতে প্রথম নিরুপদ্রব অসহযোগ ঘোষিত হল সেই দিন। সেটা আইনের চোখে আদালতের অবমাননা; সেই অপরাধে তাঁর ছয় মাস জেল হল। অরবিন্দ মুক্তি পেলেন পরে।

অরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ-অভিযোগের সংবাদ পেয়ে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের উদ্দেশে 'নমস্কার' নামে কবিতাটি লিখলেন (৭ ভাদ্র ১৩১৪)।— অরবিন্দের মহত্ত্বের অপূর্ব স্বীকৃতি।

এমন সময় জমিদারি থেকে ডাক এল; রবীন্দ্রনাথকে বৈষয়িক গণ্ডগোলের জন্য সেখানে যেতে হল।

কলিকাতায় ফিরে এসে দেখেন বহরমপুর থেকে আহ্বান এসেছে— বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন, কবিকে তার সভাপতি হতে হবে। উদ্যোক্তা বাংলার দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। বহরমপুরে রবীন্দ্রনাথ দিন তিনেক ছিলেন।

৫৮

কলিকাতায় ফেরবার পর (১৯ কার্তিক ১৩১৪) মুঙ্গের থেকে টেলিগ্রাম পেলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের কলেরা হয়েছে। পূজাবকাশের সময় শমীন্দ্র তার সমবয়সী বন্ধু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র, সরোজচন্দ্রের সঙ্গে তার মাতুলালয়ে মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়েছিল। কবি টেলিগ্রাম পেয়ে সেখানে চলে গেলেন। কিন্তু শমীন্দ্রকে রক্ষা করা গেল না।

"শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, পড়ে নি— সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তার মধ্যে। সমস্তের জন্যে আমার কাজও বাকি রইল।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রকে খুবই স্নেহ করতেন— লোকে বলে চরিত্রে ও চেহারায় কবির সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মিল ছিল। কবির মনে নিদারুণ আঘাত লাগে, কিন্তু কোনো প্রকাশ দেখা গেল না। শান্তিনিকেতনে

ফিরে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে বিদ্যালয়-পরিচালনা সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিয়ে, বেলা ও মীরাকে নিয়ে শিলাইদহে চলে গেলেন। রথীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায়।

শিলাইদহে এবার একাদিক্রমে পাঁচ মাস থাকলেন। শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষ উৎসবে এলেন না; মাঘোৎসবের সময় দিন-দুইয়ের জন্য কলিকাতায় এসেই ফিরে গেলেন। উৎসবে যথানিয়মে উপাসনা করলেন ও ভাষণাদি দিলেন; এবারে ভাষণের নাম ছিল 'দুঃখ'।

৫৯

এবার জমিদারিতে বাসকালে গ্রামোদ্যোগে মন গিয়েছে। এই সময়ের পত্রে লিখছেন "আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারির মধ্যে পল্লীসংগঠন কার্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েকজন পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে।" এই ছেলেদের ঢাকা অনুশীলন-সমিতির সঙ্গে যোগ ছিল; এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন কালীমোহন ঘোষ—তাঁর নামের সঙ্গে বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতনের গ্রামসেবাব্রত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত রয়েছে। যুবক কালীমোহন কলেজ ত্যাগ করে তখন নানা বৈপ্লবিক পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গঠনমূলক কার্যে আত্ম-নিয়োগের মন্ত্র দিলেন। দশের কাজ করা উচিত বলে উপদেশ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত থাকলেন না; কাজের মধ্যে নামলেন। যুবকদের গঠনমূলক কার্যে প্রবৃত্ত করলেন।

কবি যখন শিলাইদহে, কাগজে একদিন খবর দেখলেন—সুরাটের কংগ্রেস-অধিবেশন (ডিসেম্বর ১৯০৭) উগ্র দলাদলির ফলে ভেঙে গেছে—সভা বসতেই পারে নি। সেখানে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মতভেদ তর্ক-বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি; শেষপর্যন্ত পাদুকাবর্ষণ হয়ে সভা পণ্ড হয়েছিল। বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলন বন্ধ হয় সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের জুলুমে। সুরাটের সভা পণ্ড করতে বাইরের তৃতীয় পক্ষের কোনো প্রয়োজন হয় নি, আত্মকলহেই সেটি ঘটল।

এই-সব ঘটনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিলাতপ্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন, "এবারকার কংগ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা তো শুনিয়াছই— তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত নিযুক্ত রহিয়াছে।··· কিছুদিন হইতে গবর্মেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে— এখন আর সিডিশনের সময় নাই— যেটুকু উত্তাপ এতদিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল— তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত রহিয়াছে।··· আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না— মর্লিরও নয়, কিচেনারেরও নয়— আমরাই নিজেরাই পারিব।" বলা বাহুল্য মনের তীব্র বিরক্তি এই পত্রে প্রকাশ পেয়েছে। পরে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

৬০

সুরাট কংগ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের মাস দুই পরে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন (১৯০৮)। পাবনার লোকে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি মনোনীত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেনামী চিঠি আসতে লাগল কবির কাছে— তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি যদি সভাপতি হন তবে পাবনায় সুরাটের দক্ষযজ্ঞের পুনরভিনয় হবে। বিরোধী দলের ধারণা রবীন্দ্রনাথ নরমপন্থী; তারা চায় এমন লোক যে চড়া গলায় ইংরেজকে গাল পাড়তে থাকবে। আশ্চর্যের বিষয় পুলিশ ভাবে তিনি চরমপন্থী, তাই তাঁর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে আর তাঁর চিঠি খোলে। আসলে কিন্তু তিনি নরমও নন, গরমও নন— বিশেষ কোনো মতবাদের শিকলে বাঁধা নন— মনকে মুক্ত রেখে সর্বদা সত্যকেই দেখতে চেষ্টা করেন, যার মধ্যে আছে ভাবী সর্বোদয়ের কল্পনা।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলন (ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) বসল; কবি ভাষণ পাঠ করলেন, এবং কেউ সভা ভাঙতে এগিয়ে এল না। কবি তাঁর ভাষণে, যে কথা 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে প্রায় চার বৎসর পূর্বে বলেছিলেন সেই কথাই আরো স্পষ্ট করে এবার বললেন: গ্রামের মধ্যে সমবায়নীতির প্রচলন, 'মিতশ্রমিক' যন্ত্রের পরিচালনা, সংঘবদ্ধভাবে বিবিধ কার্যের

অনুষ্ঠান, বিচিত্র কুটিরশিল্পের প্রবর্তন প্রভৃতির বহু পন্থা নির্দেশ করলেন। আর বললেন যে, এই-সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে শক্তিলাভ, সঙ্ঘশক্তি ছাড়া কোনো জাতি কোনো স্থায়ী মর্যাদা এবং সাফল্য লাভ করতে পারে না।

এবারকার প্রাদেশিক সম্মেলনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণ বাংলায় লিখে পাঠ করলেন। ১৮৯৫ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সকল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিগণ ইংরেজিতে ভাষণ দিয়ে আসছিলেন। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ বাংলায় প্রদত্ত হল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ত্রিশ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাতেই ভাষণ পাঠ করেছিলেন।

৬১

প্রাদেশিক সম্মেলনের মাস আড়াই পরে এক দিন সকালের কাগজে দেখা গেল যে, বিহারের মজঃফরপুরে মিষ্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা বোমার দ্বারা নিহত হয়েছেন (৩০ এপ্রিল ১৯০৮)। হত্যাকারী দুই বালক— ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র চাকী। চাকী পুলিশের হাতে ধরা পড়বার পূর্বেই আত্মহত্যা করেছিলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন। জানা গেল তাঁরা কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড্‌ সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে কেনেডির ঘোড়ার গাড়িতে বোমা ফেলেন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল বাংলার বিপ্লবী দলের লোক— সেই দলও ধরা পড়ল কয়েক দিন পরে কলিকাতার মানিকতলার এক পোড়ো বাগানবাড়িতে। সেখানে বোমা তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম রিভলবার টোটা এবং বহুবিধ কাগজপত্র পাওয়া গেল।

সমস্ত দেশ স্তম্ভিত। মনে মনে সকলেই তারিফ করছে, মুখে বলবার সাহস নেই। বোঝা গেল বাংলার রাজনীতি সম্পূর্ণ নূতন পথে চলেছে। রাজনীতির দলগত মত নিয়ে যখন কংগ্রেসী সভায় জুতো-পেটাপিটির পর নেতারা পরস্পরের খেউড় গাইতে মত্ত, যখন রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-অঞ্চলে পল্লীসমিতির পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত— সেই সময়ে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দুঃসাহসিক যুবকেরা প্রাণপণে ইংরেজ-বিতাড়নের সংকল্প আঁটছেন। তাঁরাও

জানতেন, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে ও সভায় বক্তৃতা করে কিছু হবে না। বিপ্লবীরা তাই চরমপন্থা অবলম্বন করলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে বললেন :

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

তাঁরা বললেন :

সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

ফাঁসির হুকুম শুনে আদালত-ঘরে উল্লাসকর গাইলেন :

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।

এ দিকে বোমার ব্যাপার নিয়ে কিছু বলাতে লোকমান্য তিলকের ছয় বৎসর জেল হয়ে গেল। সমস্ত দেশ হতবাক্ স্তব্ধ। রবীন্দ্রনাথ স্থির থাকতে পারলেন না, কলিকাতায় চলে এলেন। 'চৈতন্য লাইব্রেরি'র হলে সভা আহূত হল—কবির বক্তৃতার বিষয় 'পথ ও পাথেয়' (২৫ মে ১৯০৮)। সভাপতিত্ব করলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তখনো মানিকতলার বোমার মামলা চলছে আলিপুরের আদালতে। অরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ, হেম কানুন্‌গো, কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি আটত্রিশ জন বিচারাধীনভাবে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক।

রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী যুবকদের প্রতি কোনো কটুবাক্য প্রয়োগ করলেন না। তিনি বললেন, জাতি-হিসাবে ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করে আসছে বাঙালি বহুকাল; বর্তমান ঘটনার ন্যায়-অন্যায় ইষ্ট-অনিষ্টের বিচার অতিক্রম ক'রে, জাতীয় কলঙ্ক-ক্ষালনের উপলক্ষে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মে পারে না। কিন্তু তিনি হত্যাকাণ্ড বা গুপ্তহত্যার নীতি সমর্থন করেন না। তিনি বললেন, মানুষ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যার দ্বারা, ক্রোধের আবেগে ভুলে যায় যে, উত্তেজনাই শক্তি নয়।

কবি বললেন, "ইংরেজশাসন-নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া, অথচ তাহার 'পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া, সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা, বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ীর বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে। একত্র-সংঘটন-মূলক সহস্রবিধ সৃজনের

কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে গড়িতে হইবে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।” কবির এই উক্তি আজ পঞ্চাশ বৎসর পরেও কি সত্য নয়? তিনি ভারতকে অখণ্ডসত্তা বলে স্বীকার করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন সকলকে; আমাদের বিশেষ পরিচয় এই যে, আমরা ভারতীয়।

আমরা মহাত্মাজির দ্বারা যে অহিংসার বাণী প্রচারিত হতে দেখি এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সে কথা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন। তিনি বললেন, হিংসার দ্বারা বৃহৎ কর্ম-সাধন হয় না—সকলকে নিয়ে, সকলকে সহ্য করে জাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের পথে চলাই রাজনীতির আদর্শ। জবর্দস্তি করে মঙ্গলকর্ম বা উপকার করার নীতিকে বিশ্বাস তিনি করতেন না।

দেশহিত বা দেশসেবার অর্থ যে পল্লীসমাজের কাজ, সে কথা কবি কিছুকাল থেকে বলে আসছিলেন। নিজের জমিদারিতে সে কাজ আরম্ভও করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, দেশের পুলিশ তার বাদী। যাদের জন্য কাজ সেই সাধারণ লোকেই পুলিশের আসা-যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে উঠল। যুবকদের পক্ষে হিতচিকীর্ষু হয়ে কোনো কাজ করাই সম্ভব হল না। লোকের ভাবখানা এই—স্বখের থেকে সোয়াস্তি ভালো। পুলিশ এসে নিত্য খোঁজ করে কে কবে গ্রামে এসেছিল, কার ঘরে বসেছিল; এ-সবের জবাব দিতে তারা ভয় পায়। কবির গ্রামসেবার উদ্যোগ-আয়োজন ব্যর্থ হল।

৬২

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনে বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে। অন্তরে গভীর আধ্যাত্মিক আকূতি দেখা দিচ্ছে। সমগ্রকে দেখবার, বুঝবার চেষ্টা চলছে ভিতরে ভিতরে। এই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আহ্বানে (শ্রাবণ ১৩১৫) কলিকাতার মন্দিরে এক ভাষণে (‘পূর্ব ও পশ্চিম’) তিনি এই প্রশ্ন তুললেন—ভারতের ইতিহাস কাদের ইতিহাস?

বঙ্গদর্শনের সূচনাকালে কবি হিন্দুত্বের বা হিন্দুজাতিবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু সেটাতেই যে ভারত-আদর্শের সমগ্রতা নয়—গত কয়

বৎসরের রাজনৈতিক সমস্যার জটিল ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উপলব্ধি করেছেন। এবার তাই বললেন, ভারতের ইতিহাস কারো স্বতন্ত্র ইতিহাস নয়; যে আর্যগণ বুদ্ধি ও শক্তি-প্রভাবে একদা এ দেশ জয় করেছিলেন, যে আর্যগণ অনার্যদের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে এক নূতন সমাজ গড়েছিলেন, আর যে মুসলমান হিন্দুর আত্মঘাতী বিরোধের অবকাশে প্রবেশ ক'রে এ দেশে বংশপরম্পরাক্রমে জন্ম-মৃত্যু-দ্বারা এ দেশের মাটিকে আপনার করে নিয়েছে— ভারতের ইতিহাসে এদের সকলেরই স্থান আছে। অধুনা ইংরেজও এর একটা অপরিহার্য অংশরূপে রয়েছে। তাই কবি ঘোষণা করলেন, পশ্চিমের সঙ্গে প্রাচ্যকে মিলতেই হবে, পশ্চিমকে আপন শক্তিতে আপনার করে নিতেই হবে। আজ অর্ধশতাব্দ পরে ভারত আপনার যে শক্তির বলে পশ্চিমকে ও সকলকে আপনার করে নিচ্ছে সেও (কবির ভাষায় বলা যাক) "হীনতার দ্বারা নহে, মহত্ত্বের দ্বারা; তীব্র উক্তির দ্বারা নহে, দুঃসাহসিক কার্যের দ্বারা নহে, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা" শ্রেয়কে বরণ ক'রে। রবীন্দ্রনাথ ভাবী রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার প্রতিষ্ঠা অহিংসার উপর, সত্যের উপর, শ্রেয়ের উপর। আজ ভারতকে এক কর্মযোগী মহাত্মার ও এক প্রেমযোগী কবির স্বপ্নকেই রূপ দিতে হবে।

এই মনোভাব থেকেই লিখলেন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক (১৯০৯); এবং সৃষ্টি করলেন ধনঞ্জয় বৈরাগী— অহিংস সত্যাগ্রহের প্রতিমূর্তি। ধনঞ্জয়ের মুখ দিয়ে বলালেন— রাজ্যটা রাজার একলার নয়, অর্ধেক প্রজার। "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"। ডিমোক্রেসির চরম আদর্শ হল তাই— প্রজার sovereign right। এই তত্ত্ব ঘোষিত হল নাটকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু নাটকটি জনপ্রিয় হয় নি; কারণ, প্রতাপাদিত্যকে কবি অত্যাচারী রাজারূপে এঁকেছিলেন।

এই শতাব্দীর শুরু হতে বাঙালি লেখকরা জাতীয় বীরের সন্ধান করছেন। মহারাষ্ট্রীয়দের জাতীয় বীর শিবাজিকে কেন্দ্র করে উৎসবাদি চলছে। বাঙালির আদর্শ বীর কই?

প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, সীতারাম রায়, কেদার রায়, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসেমকে জাতীয় বীরের আসন দেবার জন্য সাহিত্যিকরা বীরদের

চরিত্রে মহত্ত্বের সন্ধান করছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে কোনো অলীক আদর্শবাদে গড়েন নি ; তাই বইখানা কখনো পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নি। ক্ষীরোদপ্রসাদের বাস্তবতাহীন প্রতাপাদিত্যই বাঙালিকে মুগ্ধ করেছিল।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক লিখতে লিখতে অনেকগুলি গান লিখলেন—তার কয়েকটির মধ্যে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের পদধ্বনি শোনা গেল। জীবন গভীর একটা রসের স্তরে প্রবেশ করছে, গানগুলি তারই আগমনী।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী কবির একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। সে কি মহাত্মা গান্ধীর অগ্রদূত? কবিকল্পনার নাঙ্গা ফকিরই কি ভারতে স্বাধীনতা আনবার প্রতীক?

৬৩

১৩১৫ সাল। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এখন শতাধিক ছাত্র। অধ্যাপক বিধুশেখর ও নবাগত তরুণ অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন—উভয়ের চেষ্টায় বর্ষাকালে পর্জন্য-উৎসব বা বর্ষামঙ্গল-উৎসব অনুষ্ঠিত হল। তার পূর্বে বালক শমীন্দ্রনাথ ও তার সমবয়সী ছাত্রেরা ঋতু-উৎসব একবার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এবার শরতের কয়েকটি গান লিখেছিলেন ; ছেলেদের উপযোগী করে একটা নাটক লেখবার তাগিদে 'শারদোৎসব' নাটকটি লিখলেন (ভাদ্র ১৩১৫) এবং শরতের গানগুলি নাটকের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। 'শারদোৎসব' রচনার পর কবি প্রায় প্রতি ঋতুর উপযোগী নাটক ও গান লেখেন ; সেই ঋতুরচনার পর্যায়ে কবির প্রথম নৈবেদ্য এই 'শারদোৎসব' নাটক। কবি লিখেছেন, "শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী' [১৩১৫-১৩২২] পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই, প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়াটা এই একই।" শরৎকালে রাজা বাহির হয়েছেন। বসন্তোৎসবে রাজা বাহির হয়েছেন। ফাল্গুনীতে নবযৌবনের দল বাহির হয়েছে। বর্ষায় অচলায়তনের মধ্যে পঞ্চকের মন ব্যাকুল হয়েছে বাইরে যাবার জন্য। এমন-কি, 'ডাকঘর' নাটকে অমলের মনও বাহিরের মুক্ত জগতের জন্য ব্যাকুল। ষড়্‌ঋতুর সমাবেশ

৮

হয়েছে 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র উৎসবে—সেটি হয় অনেক পরে। সমস্তর মধ্যেই কবি বলতে চেয়েছেন 'চরৈবেতি'—নিজের আবেষ্টনী ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এসো। কিন্তু সেটা শূন্যতার মধ্যে ছুটাছুটি মাত্র নয়—অতীত ও বর্তমানকে মিলিয়ে স্বচ্ছন্দ গতি, নিখিল সৃষ্টির সঙ্গে ঐক্য আছে নিবিড় হয়ে। এখানে একটা কথা বলা দরকার, প্রথম দিকের নাটকগুলি শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের মনে রেখে লেখা ব'লে এগুলিতে নারীচরিত্র নেই। পরের যুগে যখন সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়, তখন দেখা যায় নাটকে বা নাটিকায় বালিকারা স্থান পেয়েছে।

৬৪

পূজাবকাশের সময় শিলাইদহে গেছেন; সেখানে কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেলেন—মনে নানা প্রশ্ন জাগছে। নিজের শরীরও খুব খারাপ; অর্শের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন। ছুটির পর আশ্রমে ফিরে এলেন; 'শান্তিনিকেতন' বাড়িতে আছেন, কারণ 'নতুন বাড়ি' ও 'দেহলি' ছেড়ে দিয়েছেন বালিকা-ছাত্রীদের জন্য।

মনের মধ্যে তখন আধ্যাত্মিক জীবন-লাভের জন্য তীব্র বেদনা।

প্রতিদিন প্রাতে অন্ধকার থাকতেই মন্দিরে যান—দু-পাঁচজন শিক্ষক ও ছাত্র সেখানে নীরবে গিয়ে বসেন। তাঁদের অনুরোধে ধ্যানের পর তাঁদের কাছে কিছু বলেন। সেই কথাগুলি ঘরে এসে লিখে ফেলেন—এই হল 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার সূত্রপাত। কবির ধর্মভাষণগুলি সতেরো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে প্রথম আটটা খণ্ড (অগ্রহায়ণ ১৩১৭ থেকে বৈশাখ ১৩১৯) এই কয়মাসের প্রায় প্রতিদিনের কথিত বাণী। সেইজন্য এই আটখণ্ড উপদেশমালার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনে অভিব্যক্তির স্তরগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

'গীতাঞ্জলি'র গানও লেখা হয় প্রায়ই একটি দুটি করে। গান-রচনার সময়ে সুরের গুঞ্জনের মধ্য দিয়ে তাঁর উপাসনা হয়; ধ্যানেতে আর গানেতে মেশামেশি হয়ে একটা অনির্বচনীয় ভাবরস উপভোগ করেন।

আধ্যাত্মিক তুরীয়তার মধ্যে পৃথিবীর মানুষ সর্বদা বাস করতে পারে

না। ধ্যানই করুন আর গানই করুন, 'গোরা' উপন্যাসের মাসিক কিস্তি সময়মত লিখে পাঠাতে হয়। জমিদারির তদারকও করতে হয়। জীবন-বীণার সরু মোটা সব তারগুলি পাশাপাশি সাজানো।

পাঁচ মাস একাদিক্রমে শান্তিনিকেতনে আছেন, প্রায় প্রতিদিন উপদেশ করছেন। কিন্তু কবির পক্ষে এই এক প্রকার ভাবনা নিয়ে থাকা ও এক স্থানে দীর্ঘকাল বাস অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ধর্ম-উপদেশ-দান যে একটা অভ্যাসে পরিণত হতে পারে এবং তার ফল যে সর্বদা শ্রোতাদের পক্ষে কল্যাণকর হয় না, সেও কবি বুঝতেন। তাই এই পরিবেশ থেকে বাইরে যাবার জন্য মন উতলা হয়ে উঠল। এমন সময়ে কাল্‌কা যেতে হল। কনিষ্ঠা কন্যা মীরার ভাশুর উপেন্দ্রনাথ কাল্‌কায় কেল্‌নার কোম্পানির বড়ো চাকুরে। কবি কাল্‌কায় যে খুব বেশিদিন ছিলেন তা নয়। কারণ, সেখানকার পরিবেশ কবির পক্ষে অনুকূল হতে পারে না। সেখানে বাসকালে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ভূমিকাটি লেখেন (৩১ বৈশাখ ১৩১৬)। ফেরবার পথে শরীর একটু খারাপ হওয়ায় কবি এলাহাবাদে নামেন ও তাঁর বন্ধু নগেন্দ্র গুপ্তের বাসায় কয়দিন থেকে যান।

বর্ষা শুরু হতেই মন ছুটল পদ্মাচরে। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকা হল না, খবর পেলেন রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরছেন।

রথীন্দ্রনাথ ফিরলেন ১৩১৬ সালের ভাদ্র মাসে (সেপ্টেম্বর ১৯০৯)। বিদেশে সাড়ে তিন বৎসর ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন বৎসরের গ্র্যাজুয়েট কোর্স্ শেষ করে ব্যাচিলার অব সায়েন্স্ (B. S.) ডিগ্রি নিয়ে এলেন; তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বৎসর।

আশ্বিন মাসে পুত্রকে নিয়ে কবি চললেন জমিদারিতে। তাঁর ইচ্ছা রথীন্দ্রের কর্মের রথ সেখানে চালাতে হবে। নৌকায় চলেছেন—নদী বিল খাল দিয়ে—মন ভরে আছে গানে—বেশ একটা আত্মতৃপ্তির ভাব। সমস্ত-কিছুকে বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে দেখছেন। রাখীবন্ধনের দিন এক পত্রে লিখলেন যে, এখন সময় হয়েছে রাখীবন্ধনের তাৎপর্যকে বাংলাদেশের একটা সাময়িক ঘটনার সঙ্গে আবদ্ধ রাখলে আর চলবে না। "এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাতরূপে পরিণত করতে হবে।

তা হলেই এই দিনটি ভারতের বড়োদিন হবে। তা হলেই এই বড়োদিনে বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদের মিলন হবে।”

শুধু বাংলাদেশের কথা নয়, শুধু হিন্দুত্বের কথা নয়—কবির মনে সর্বধর্মের মিলনপ্রশ্ন, নিখিলভারতের চিত্ত-উদ্‌বোধন ও সংযোগের কথা জাগছে। কবির এ কথা বলার বিশেষ কারণ ছিল। এখনো বাংলার সমস্যা সর্বভারতের সমস্যা হয় নি, বাঙালির বেদনা সকল ভারতীয়ের চিত্ত স্পর্শ করে নি। সেইজন্য এই নূতন সাধনা গ্রহণের প্রস্তাব যে, আমরা ভারতীয়।

শিলাইদহ থেকে ফিরে কলিকাতার ওভারটুন হলে 'তপোবন' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করলেন (২ ডিসেম্বর ১৯০৯)। কয়দিন পরে ৭ই পৌষের দুইটি ভাষণে ও মাঘোৎসবের 'বিশ্ববোধ' নামে ভাষণে কবির ধর্মবোধের নূতন চেতনা সূচিত হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য এই যে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা, জ্ঞানের শিক্ষার দ্বারা মনুষ্যত্বের বোধ জাগে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ—তারই বোধ হচ্ছে শিক্ষার মূল কথা। বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপু, প্রবৃত্তির অসংযম। সেইজন্য ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ, যে দেশ জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করবার উপদেশ দিয়েছে এবং জীবনে প্রতিপালন করেছে। প্রাণ জিনিসটাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করার অভ্যাস আত্মার পক্ষে অকল্যাণকর। এইভাবে ভারতের শিক্ষাদর্শের মূল তত্ত্বটি খুবই স্পষ্টভাবে বললেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কঠোর নিরামিষাশী; শান্তিনিকেতনের দ্বিতলে বাসকালে অসুস্থ হলেও তাঁকে কেউ মাছ মাংস খাওয়াতে পারত না। আমরা জানি, একবার তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা পিতার জন্য মাছের কি মাংসের সুপ করে নিয়ে আসেন; কবি বিরক্ত হয়ে তা ফেলে দিয়ে এলেন—মহর্ষির নিষেধ। ন্যাসপত্রের অনুজ্ঞা তিনি মেনে চলতেন।

৬৫

মাঘোৎসবের (১৩১৬) তিন দিন পরে খুব ঘটা করে কলিকাতায় রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দিলেন (২৯ জানুয়ারি ১৯১০) গগনেন্দ্রনাথের ভগিনী বিনয়িনী দেবীর

বালবিধবা কন্যা প্রতিমার সঙ্গে। ঠাকুর-পরিবারে বা আদি ব্রাহ্মসমাজে এটা একটা বিপ্লব বা বিদ্রোহ; মহর্ষির জীবনকালে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে হয়তো এমন বৈপ্লবিক সংস্কারকার্য সম্ভবপর ছিল না।

এই বিবাহোপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে 'গোরা' উপন্যাস উৎসর্গ করলেন। বৎসর-তিন পূর্বে প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবিকে যৎসামান্য 'আগাম' হিসাবে তিন শো টাকা দিয়ে বলেছিলেন, সুবিধামত যেন একটা গল্প লিখে দেন। তদনুসারে তিনি ১৩১৪ (অগস্ট ১৯০৭) সালের ভাদ্র মাস থেকে 'গোরা' উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন, আর শেষ হয় ১৩১৬ সালের ফাল্গুন (মার্চ ১৯১০) সংখ্যায়— অর্থাৎ আড়াই বৎসরে।

এই দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে কবির জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত শোকতাপ গিয়েছে— কিন্তু রামানন্দবাবুর কাছে শোনা, কোনো মাসে কবির নিকট হতে 'গোরা'র বরাদ্দ কিস্তি আসতে দেরি হয় নি। এমন-কি শমীন্দ্রের মৃত্যুর পর পৌষমাসের কিস্তি যথাসময়ে তাঁর কাছে পৌছয়।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 'গোরা' উপন্যাস বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা আজকের বাঙালি-সমাজের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তার কারণ, গোরার অনেক সমস্যা এখন অদৃশ্য হয়েছে এবং তার স্থানে অন্য অনেক সমস্যা এসেছে। কিন্তু যুগসমস্যার প্রশ্ন বাদ দিলেও 'গোরা'র মধ্যে কতকগুলি শাশ্বত প্রশ্নের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

১৩১৬ সালের গোড়া থেকে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'সংকলন' বলে একটা অংশ বার হতে আরম্ভ করে। রবীন্দ্রনাথের হাতে এখন ভারী কাজ নেই, তাই তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের সেই কাজে ব্রতী করলেন। তিনি বরাবরই বিলাতি মাসিক পত্রিকার একজন বড়ো পড়ুয়া; সাধনায় ও বঙ্গদর্শনে তাঁর সংকলন-করা প্রবন্ধ অনেক। এবার আমাদের ন্যায় অর্বাচীনেরাও সংকলন-কাজে নিযুক্ত হল। প্রবাসীতে পাঠাবার পূর্বে প্রত্যেকটি রচনা নিজে দেখে শুদ্ধ করে দিতেন; কোনো কোনো সময়ে নিজেই লিখে দিতেন। লেখক তৈরি করবার জন্য তাঁর যে চেষ্টা দেখেছি তা এখনো ভাবলে অবাক হই। কেউ কোনো কাজ করছে জানতে পারলে কী উৎসাহ দিতেন! বিধুশেখর যখন এখানে আসেন তখন তিনি পরম্পরাগত

প্রাচীন রীতির পণ্ডিত। কবি তাঁকে পালি শিখতে প্রবৃত্ত করেন, প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি কিনে দেন। এ ধরনের আরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারত। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কেবল পড়াবেন, নিজেরা পড়বেন না বা কাজ করবেন না— এটা কবি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, আলো থেকেই আলো জ্বালানো যায়, জ্ঞানতপস্বীরাই জ্ঞান বিতরণ করতে পারেন।

৬৬

ঘটনার রাজ্যে ফিরে আসা যাক। গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হবার পূর্বে পঁচিশে বৈশাখ (১৩১৭) রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মোৎসব হল— তিনি পঞ্চাশ বৎসরে পড়লেন। অনুষ্ঠান অত্যন্ত ঘরোয়া ভাবে হয়। এর পর থেকে প্রতি বৎসর ঐ দিনটি পালিত হয়ে আসছে; এবং এখন সে দিনটি বাঙালি-জীবনের একটা জাতীয় উৎসবের দিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রীষ্মের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হলে কবি সপরিবারে হিমালয়ের তিনধরিয়া নামে ছোটো একটা শহরে সপ্তাহ-তিন থেকে এলেন।

কবি থাকেন 'শান্তিনিকেতন' গৃহের দ্বিতলে। পূর্বেই বলেছি কবির দেহলির বাড়ি ও 'নূতন বাড়ি'তে এখন মেয়েদের বোর্ডিং হয়েছে। এই পর্বটাতে গীতাঞ্জলির গান লেখা চলছে। আর লিখছেন জীবনস্মৃতি। এ ছাড়া অধ্যাপকদের কাছে তাঁর কাব্য নিয়ে আলোচনা করছেন। সেই-সব আলোচনার নির্গলিত রূপ পাই অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে।

পূজাবকাশে কবি শিলাইদহে গেলেন; এবার নৌকায় নয়— কুঠিবাড়িতে উঠলেন। সেখানে পুত্র-পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা নিয়ে নূতন সংসার গড়েছেন। জমিদারির কৃষি-উন্নতি বিষয়ে গবেষণাগার স্থাপিত হচ্ছে; কুঠিবাড়ির অনেক ভাঙাচোরা হল। বহু বৎসর পরে কবি যেন আবার তাঁর হারানো সংসারকে নূতন করে ফিরে পেলেন। মনের মধ্যে বেশ একটু পরিতৃপ্তি; ভাবছেন মার্কিন মুলুকের কলেজে শিক্ষিত পুত্র এবং জামাতাকে দিয়ে দেশের কৃষিসমস্যার সমাধান হবে। আর, শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের দুগ্ধসমস্যা দূর হবে সন্তোষচন্দ্রের দ্বারা। সন্তোষ সেখানে গোশালা স্থাপন করছেন। কবির

সব স্বপ্ন সফল হয় নি। যা হোক, এই পরিবেশের মধ্যে বাসকালে কবি 'রাজা' নাটকটি লিখলেন ; বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের রচনা এই প্রথম (১৩১৭)।

শান্তিনিকেতনে ফিরে কবি বিদ্যালয়ের নানা কাজে মন দিচ্ছেন। একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— সেটি হচ্ছে পৌষ-উৎসবের সময় বড়োদিনে খৃষ্ট সম্বন্ধে মন্দিরে ভাষণ-দান। গত বৎসর রাখীবন্ধনের দিন এক পত্রে বড়োদিন-উদ্‌যাপনের যে প্রস্তাব করেছিলেন, সেটি নিজেই খৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে ভাষণ দান করে পালন করলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে খৃষ্টোৎসব হয় নি ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের খৃষ্টভক্তি ও খৃষ্টানি-ঘেঁষা উৎসবাদি দেখেশুনে আতঙ্কিত হয়ে একটি ভাষণে 'খৃষ্টভীতি'র কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক খৃষ্টানি বাদ দিয়ে ভক্ত খৃষ্টকে গ্রহণ করলেন। সেই থেকে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে প্রতি বৎসর খৃষ্টোৎসব হয়ে আসছে।

এই বৎসর ফাল্গুন মাসে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব তিরোভাব উপলক্ষেও মন্দিরে কবি ভাষণ দান করলেন। ১৯১০ সাল থেকে আশ্রমে মহাপুরুষদের দিন পালনের রেওয়াজ শুরু হল।

এই ঘটনা থেকে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ কিভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে তার আভাস আমরা পাই। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর যে 'ঐকান্তিক হিন্দু' মনোভাব আমরা দেখেছিলাম তার থেকে তিনি বেরিয়ে আসছেন ; সকল ধর্মের ভাবুকদের কথা জানবার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা দেখা যাচ্ছে ; ক্ষিতিমোহন সেনের নিকট থেকে কবীর ও মধ্যযুগীয় সন্তদের সম্বন্ধে তথ্য তত্ত্বকথা শুনতে শুনতে কবির ধর্মচেতনা ব্যাপক ও গভীরতর হতে থাকে। ধর্মের বিশেষত্ব ও বিশ্বত্ব যুগপৎ মনকে পূর্ণ করছে।

৬৭

শান্তিনিকেতনের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধীয় যে-সব পরিবর্তনের কথা তাঁর মনে আসছে, সেগুলি নবযুগের ধর্মের আদর্শ। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়ে সেখানকার বৃহত্তর জনসমাজে সেগুলি প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা যায়

কি না— এই ভাবনা থেকে মাঘোৎসবের সময় একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' সম্বন্ধে একটি ভাষণ দিলেন। 'গোরা' উপন্যাস পড়ে লোকে মনে করেছিল রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কটাক্ষ করেছেন, এই প্রবন্ধে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ভাবাত্মক আদর্শের কথা খুব স্পষ্ট করে বললেন।

এর পর ব্রাহ্মধর্মের আদর্শকে সার্থক করবার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারে মন দিলেন। প্রথমে ১৩১৮ সাল থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভার গ্রহণ ও পরে সেটিকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখপত্ররূপে প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একদল উৎসাহী বুদ্ধিমান যুবকদের সহিত পরিচিত হলেন; তাঁরা কবির পাশে এসে দাঁড়ালেন।

১৩১৮ সালে কবির তত্ত্বমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। ধর্মের বিশিষ্টতা ও বিশ্বজনীনতা যে পরস্পরবিরুদ্ধ নয় এবং হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও অন্যান্য ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের মধ্যে ভেদ থাকতে পারে না, এই নবসত্য যেন উদ্‌ভাসিত হচ্ছে। ধর্মমাত্রই একটা দেশের মধ্যে উদ্‌ভূত, বিশেষ ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত, তৎসত্ত্বেও ধর্ম বিশ্বজনীন হতে পারে। কবির মতে, ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে সেই বিশ্বজনীন ধর্মের বীজ সুপ্ত আছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবকদের উৎসাহে ও সহায়তায় কবি আদি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হবে আশা করলেন। কিন্তু সেই স্থবির সমাজকে প্রাণদান করা কঠিন, এ কথা বুঝতে কবির একটু সময় লেগেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজকে নিজের পরিবার-পরিজনের আওতায় ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আদিসমাজকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবেন ভাবলেন বটে, কিন্তু শেষে দেখা গেল— তিনি কনিষ্ঠ জামাতার উপরই সব ভার দিলেন। আত্মীয়গোষ্ঠীর বাইরে তাকে আনতে পারলেন না। স্বভাবভীরুতাহেতু সমস্তটা ছেড়ে দিতে পারলেন না।

৬৮

২৫শে বৈশাখ ১৩১৮ (৮ মে ১৯১১) কবির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলে শান্তিনিকেতনে জাঁকিয়ে জন্মোৎসব হল। বলা যেতে পারে এইবারই জন্মোৎসব খানিকটা সার্বজনীন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

জন্মোৎসবের পর শিলাইদহে গিয়ে কিছুকাল থাকলেন। এবার সেখানে বাসকালে লিখলেন 'অচলায়তন' নাটক (১৫ আষাঢ় ১৩১৮)। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে কোনোদিন নিন্দা করেন নি; কিন্তু হিন্দুসমাজে 'ধর্ম' নামধেয় যে লোকাচারের আবর্জনা শতাব্দের পর শতাব্দ ধরে জমে আসছে,' মানুষের মন যার চাপে পঙ্গু হয়ে রয়েছে, সেই আচারসর্বস্ব 'হিন্দুত্ব'কে তিনি কখনো অনুমোদন করতে পারেন নি। 'অচলায়তন' সেই সমাজব্যাপী অন্ধ সংস্কার ও অযৌক্তিক লোকাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ব্যঙ্গ। 'তপোবন' প্রবন্ধে কিছুকাল আগে কবি যে কথা বলেছিলেন সেটা অচলায়তনেরই ভূমিকা বলা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারি নে।"

'অচলায়তন' প্রকাশিত হলে দেশের মধ্যে একদল লোক খুবই ক্ষুব্ধ হন। রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে তৎকালীন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসমালোচককে [ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়] লিখেছিলেন, " 'অচলায়তন' লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা।... নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালোবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালো মন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাকেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না।... অন্তরের যে-সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে, বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে— যত লড়াই ওই শাস্তির সঙ্গে আর যত মমতা ওই পাপের প্রতি ?... আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।" 'সবই সত্য' এ উক্তি মানসিক জড়তার ও শিথিল চিন্তার লক্ষণ। সবই সত্য এ কথা স্বীকার করলে সত্যের মর্যাদা থাকে না।

৬৯

কবি গানে বলেছেন, "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" কথাটা নিতান্তই কবি-কথা নয়। মন সর্বদাই সুদূরপিয়াসী। তাই ভ্রমণকাহিনী পড়েন, গ্রন্থে-উল্লিখিত অভিযাত্রীদের সঙ্গে মনে মনে মানসসরোবরে বিহার করেন। স্থির হয়ে বসে থাকা স্বভাবের মধ্যে কম, আর অবস্থাগতিকেও ঘরে বাইরে ছুটোছুটি করতে হয়। তা ছাড়া নূতন দেশ দেখার ইচ্ছা, নূতন পরিবেশে নূতন মানুষের মনের সঙ্গ পাবার জন্য চিরৌৎসুক্য— তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্তই ছিল। নূতন লোক দেখা করতে এলে কখনো অবজ্ঞাভরে বিদায় করে দিতেন না, আর কেউ কোনো নূতন জায়গার কথা শোনালে তো কথাই নেই— কবির মন সেই অজানা দেশ দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠত।

এই সময়ে রথীন্দ্রনাথরা স্বামীস্ত্রীতে স্টিমারে করে সিঙাপুর না কোথায় যাবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রস্তাবটা শোনা মাত্রই কবির মন ছুটল সেই দিকে, ভ্রমণকল্পনায় উধাও হয়ে উঠতে উঠতে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল— সকলে মিলে বিলাত যাওয়া যাক।

তখন রবীন্দ্রনাথের হাতে সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ কোনো বড়ো কাজ নেই। 'গোরা' শেষ হয়ে যাওয়ার (১৩১৬) দেড় বৎসর পরে 'রাসমণির ছেলে' ও 'পণরক্ষা' নামে দুটি গল্প লেখেন মণিলাল গাঙ্গুলী এবং তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে ভারতীর জন্য। দুটি গল্পই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি।

নানা কারণে কারো কোথাও যাওয়া হল না। কবির মন গেল ভেঙে; একলা চলে গেলেন শিলাইদহে। সেখান থেকে যে-সব চিঠিপত্র এ সময়ে লিখছেন তার মধ্যে ঘরের বন্ধন থেকে কোথাও বেরিয়ে পড়বার জন্য কী আকূতি প্রকাশ পাচ্ছে! শিলাইদহে ঘর গড়বার চেষ্টা এবারও ব্যর্থ হল— তাই মনে একটা নির্বেদ দেখা দিয়েছে।

যাই হোক, পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুললে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন; কিন্তু মনে শান্তি নেই, সেই যাই-যাই ভাবনা। 'ঘর' থেকে বেরিয়ে যাবার 'ডাক' এবং মৃত্যুর কথা ও ভাবনা মনকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছে। মনের এই অপ্রাকৃত ভার শমিত হল, যখন 'ডাকঘর' নাটকটি

লিখে ফেললেন (অগ্রহায়ণ ১৩১৮)। এই নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনের একটা উদাস বিষাদের ছায়া পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের যে দুটি নাটক বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেয়েছে তা হচ্ছে 'রাজা' ও 'ডাকঘর'। এ দুটি নাটকের কোনো 'জাত' নেই, অর্থাৎ যে-কোনো দেশের যে-কোনো লোকের মনের কথা ব'লে এ দুটি স্বীকৃত হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে সাধারণ পাঠক ও পণ্ডিত সমালোচকদের নিয়ে। এই-সব নূতন সাহিত্যসৃষ্টি তাঁদের মামুলি ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক-পরিকল্পনার ব্যাকরণের মধ্যে পড়ে না বলেই তাঁরা বিভ্রান্ত হন।

'ডাকঘর' নাটকটা লেখা হবার পর বন্ধু ও স্বজন-সমাজে সেটা শোনাবার জন্য কলিকাতায় গেলেন; পৌষ-উৎসবে পর্যন্ত এলেন না। মাঘোৎসব হল কলিকাতায়। এবারকার মাঘোৎসবে কবির 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি ব্রহ্মসংগীতরূপে গাওয়া হয়েছিল (১৯১২)। তার পূর্বে কলিকাতা কংগ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯১১) এই গানটি গাওয়া হয়েছিল অন্যতম জাতীয় সংগীত-রূপে। পরে এই গানটি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত-রূপে গৃহীত হয়।

৭০

মাঘোৎসবের পরেই রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে কলিকাতার টাউন হলে সংবর্ধনাসভা হল (২৮ জানুয়ারি ১৯১২)। এই উৎসব নিয়ে কবিকে অনেক কটু কথা শুনতে হয়। বাংলাদেশের একদল লোক চিরদিনই রবীন্দ্র-বিরোধী; তাঁদের ধারণা কবির স্তাবকদল তাঁরই প্ররোচনায় এই সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু আসলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে এটি অনুষ্ঠিত হয়; তখন পরিষদের সভাপতি জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র ও সম্পাদক রিপন (সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

দেশবাসীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রথম স্বীকৃতি হল—ইতিপূর্বে কোনো সাহিত্যিক দেশবাসীর কাছ থেকে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পান নি। উৎসবের পূর্বে আয়োজনকারীরা যে আবেদনপত্র প্রকাশ করেন তাতে এই

কথা বলেই আপশোষ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথাসময়ে যোগ্য সম্মান জানাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

জন্মোৎসবের প্রায় দু মাস পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন (ফেব্রুয়ারি ১৯১২)। বিদ্যালয়ের পক্ষে বড়োই দুর্দিন যাচ্ছে; সরকারি থেকে গোপন ইস্তাহার বাহির হয়েছে যে, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় গবর্মেণ্ট্-কর্মচারির ছেলেদের শিক্ষার উপযোগী স্থান নয়। বহু অভিভাবক গবর্মেণ্টের এই গোপন অন্তর-টিপুনিতে ভীত হয়ে ছেলেদের সরিয়ে নিয়ে গেলেন। হীরালাল সেন নামে খুলনা সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের এক জেল-খাটা শিক্ষককে কয়েক বৎসর পূর্বে নিযুক্ত করেছিলেন বলে পুলিশের ঘোর আপত্তি। তাকে বিদায় করে দেবার জন্য কবির উপর অনেকবার চাপ এসেছিল; তিনি কর্ণপাত করেন নি। এবার বুঝলেন, স্কুল রাখতে গেলে হীরালালকে বিদায় করতেই হবে। কবি তাঁকে বিদায় করলেন বটে, কিন্তু পথে বসালেন না, তাঁর নিজের জমিদারিতে কাজ দিলেন। কালীমোহন ঘোষ ছিলেন আর-একজন সরকারের চিহ্নিত লোক; তিনি বিলাত চলে গেলেন ব'লে রেহাই পেলেন।

১৯১১ সালের লোকগণনার সময় বাংলাদেশের মধ্যে একটা বিতর্ক উঠেছিল— ব্রাহ্মরা হিন্দু কি না। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মরা সরাসরি বলে দিলেন, 'ব্রাহ্মরা হিন্দু নয়'। তাঁদের যুক্তি— বেদের অভ্রান্ততা, গোরুর পবিত্রতা ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা -স্বীকার আর সেই সঙ্গে সাকার দেবতার পূজা করা যদি হিন্দুধর্মের আবশ্যক শর্ত হয়, তবে ব্রাহ্মরা নিজেদের হিন্দু বলতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনায় যোগদান করে বললেন যে, ব্রাহ্মরা হিন্দু —"ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ।··· ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে; ইহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে, ইহা সম্প্রদায় মাত্র।" এই নিয়ে বেশ বাদ-প্রতিবাদ চলে; অবশেষে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে ভারতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত বাণীর বিশদ ব্যাখ্যা করলেন। কবির মতে, সেই বাণী মিলনের বাণী, ভেদের বাণী নয়। অর্থাৎ, এতকাল লোকে এই কথাই শুনতে অভ্যস্ত হয়েছে যে, হিন্দুধর্ম ও সমাজের মধ্যে ভেদবুদ্ধিটাই প্রবল।

কবি ভারত-ইতিহাস থেকে নানা উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, সেটা ভ্রমাত্মক ধারণা— ভেদবুদ্ধি ঘোচানোই ছিল ভারতের সাধনা। ভারত-ইতিহাসকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে কবি দেখালেন। প্রায় অর্ধশতাব্দ পূর্বে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' প্রবন্ধে এই ঐক্যমন্ত্রের কথাকে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য বলেছিলেন।

৭১

ওভারটুন হলে বক্তৃতার (চৈত্র ১৩১৮) কয়দিন পরেই কবির বিলাতযাত্রার কথা। কিন্তু যাত্রার পূর্বে কয়দিন আত্মীয়-বন্ধুদের অতিসমাদরের ফলে শেষ মুহূর্তে শরীর গেল বিগড়ে। কলিকাতার জাহাজঘাটে লোকেরা দেখা করতে গিয়ে শুনল কবি অসুস্থ, বিলাত যাওয়া পিছিয়ে গেছে। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র কবির সহযাত্রী হবার কথা ছিল। তিনি একাই বিলাত চলে গেলেন (১৯ মার্চ ১৯১২)।

শরীর একটু ভালো হতেই কবি শিলাইদহে চলে গেলেন। সেখানে শান্ত পরিবেশের মধ্যে আবার গানের সুর নেমে এসেছে— 'গীতিমাল্যে'র অনেকগুলি গান লিখলেন। এ ছাড়া নিজের অবসরবিনোদনের জন্য নিজের কতকগুলি কবিতা ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করছেন।

বর্ষশেষের দিন (১৩১৮) কবি সকলের অজ্ঞাতে শান্তিনিকেতনে এসে পৌছলেন। যথারীতি বর্ষশেষের সন্ধ্যায় ও নববর্ষের দিন প্রাতে (১৩১৯) মন্দিরে উপাসনা করলেন। এ দিকে বিলাত-যাত্রার সব আয়োজন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন জাগছে কেন বিলাত যাচ্ছেন। আঠারো বৎসর বয়সে বিলাত গিয়েছিলেন বিদ্যালাভের আশায়; এখন পঞ্চাশোর্ধে তো সে প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাই এবারকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজের কাছে নিজেই যেন কৈফিয়ত খুঁজে বলছেন যে, মানুষের জগতের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত করবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার প্রয়োজন। আরো ভাবছেন, য়ুরোপে গিয়ে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সত্যকে প্রত্যক্ষ করবেন এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তীর্থযাত্রীর মতো য়ুরোপে চলেছেন। এ ছাড়া ব্যবহারিক দিকের কথাও ছিল;

কবি অর্শে কষ্ট পাচ্ছেন দীর্ঘকাল, ইচ্ছা ইংলন্ডে গিয়ে চিকিৎসা করান।

৭২

রবীন্দ্রনাথ, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বাই-এর পথে বিলাত-যাত্রা করলেন (২৪ মে ১৯১২)। এই পথেই আরো দু বার গিয়েছিলেন— সাহিত্যে তার চিহ্ন রয়ে গেছে, 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) ও 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' (১৮৯৩)। এবার জাহাজে বসে গান লিখছেন, ইংরেজি তর্জমাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য পত্র-প্রবন্ধ লিখছেন। সেগুলি পরে কাটাছাঁটা হয়ে, 'পথের সঞ্চয়' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৩৯)।

১৬ জুন তাঁরা লন্ডনে পৌঁছলেন; প্রথমে উঠলেন হোটেলে, পরে হ্যাম্প্স্টেডের কাছে বাসা করলেন। লন্ডনে পরিচিতদের মধ্যে রোদেন্স্টাইনের সঙ্গে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দেখা হয়— তার পর পত্রের মধ্য দিয়ে কিছুটা পরিচয় দাঁড়িয়ে যায়। লন্ডনে এসে তাঁরই সঙ্গে প্রথম দেখা করলেন; এই সম্বন্ধে রোদেন্স্টাইন তাঁর 'ব্যক্তি ও স্মৃতি' (Men and Memories) গ্রন্থে যা লিখেছেন, তার মর্মানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

'মর্ডার্ন্ রিভিউ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গল্পের অনুবাদ [ভগিনী নিবেদিতা -অনূদিত 'কাবুলিওআলা' ?] পাঠ করে আমি এত মুগ্ধ হই যে, আমি তখনই জোড়াসাঁকোতে [গগনেন্দ্রনাথকে ?] পত্র লিখে জানি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পগুলি কোথায় পাওয়া যাবে। কয়েক দিন পর অজিত চক্রবর্তীর অনুবাদ করা রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতার একটা খাতা আমার নিকটে এল; কবিতাগুলি উচ্চ-অধ্যাত্মভাব-পূর্ণ বা মিস্টিক এবং মনে হল গল্পের অপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কবিতাগুলি পড়ে যেমন মুগ্ধ হলাম তেমনি বিস্মিত হলাম। এমন সময়ে [নববিধান সমাজের] প্রমথলাল সেনের সহিত আমার পরিচয় হল। তিনি একদিন [তৎকালে লন্ডন-প্রবাসী] ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে আমার বাড়িতে আনলেন।

আমি রবীন্দ্রনাথকে লন্‌ডনে আসবার জন্য তাঁদেরও পত্র লিখতে অনুরোধ করি। তার পরই একদিন শুনলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লন্‌ডনে আসছেন। তখন থেকে প্রতি মুহূর্তে আমার গৃহে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

"রবীন্দ্রনাথ যে-সব বাংলা কবিতা নিজেই তর্জমা করেছিলেন তার খাতাটি আমায় উপহার দিলেন; সেই সন্ধ্যায় আমি কবিতাগুলি পড়ে অপার আনন্দ পেলাম।...

"আমি এই মুক্তারাশির কী মর্ম বুঝব— সেইজন্য তদানীন্তন কবিশ্রেষ্ঠ ইয়েট্‌স্‌কে এই রত্নের সন্ধান দিলাম।... কবি ইয়েট্‌স্ কবিতাগুলি পাঠ করে এমনই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর পল্লীনিবাস থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্য লন্‌ডনে ছুটে এলেন।

"দুই কবির মিলনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের বীজ রোপিত হল... তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবি ইয়েট্‌স্ প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠলেন।"

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ইংলন্‌ডের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মনীষিগণের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হল। ১২ই জুলাই-এর সংবর্ধনাসভায় ইয়েট্‌স্ ছিলেন সভাপতি। তিনি বললেন, "একজন আর্টিস্টের জীবনে সেইদিন সকলের চেয়ে বড়ো ঘটনার দিন যেদিন তিনি এমন এক প্রতিভার রচনা আবিষ্কার করেন যার অস্তিত্ব পূর্বে তাঁর জানা ছিল না। আমার কাব্যজীবনে আজ এই একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত হয়েছে যে, আজ আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সংবর্ধনা ও সম্মান করবার ভার পেয়েছি। তাঁর রচিত প্রায় একশোটি গীতি-কবিতার গদ্যানুবাদের একটি খাতা আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরছি। আমার সমসাময়িক আর-কোনো ব্যক্তির এমন কোনো ইংরেজি রচনার বিষয় আমি জানি নে যার সঙ্গে এই কবিতাগুলির তুলনা হতে পারে।"

অবশেষে স্থির হল 'গীতাঞ্জলি' বা Song-Offerings কাব্যখণ্ড ইন্‌ডিয়া সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হবে; ইয়েট্‌স্ তার ভূমিকা লিখবেন। ভূমিকায় ইয়েট্‌স্ কবি সম্বন্ধে যে-সব তথ্য দিয়েছেন, তা তিনি সংগ্রহ করেন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের নিকট থেকে।

(আশ্চর্য লাগে ভাবতে, ইয়েট্সের শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর মানসিক আকর্ষণ প্রায় লোপ পেয়েছিল।)

রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ডে এসেছেন— সে দেশকে ভালো করে দেখতে চান, তাই কয়েক সপ্তাহ গ্রামে গিয়ে বাস করলেন। কিন্তু ইংলন্ডের গ্রামের সঙ্গে, চাষীর সঙ্গে, বাংলার কোনো তুলনা হয় না— অন্তরে সে বেদনা বোধ করছেন। ইংলন্ডের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন। যা পড়ছেন, যা দেখছেন, সে সম্বন্ধে পত্র-প্রবন্ধ লিখে পাঠাচ্ছেন দেশে। সেগুলি এখন 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে ও 'শিক্ষা'য় সংগৃহীত রয়েছে।

ইংলন্ডে-বাস-কালে তাঁর সঙ্গে রায়পুরের কর্নেল নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের দেখা হয় ; তাঁর কাছে শুনলেন স্থরুলে তাঁদের একটা বাড়ি ও কিছু জমি বিক্রয় করে দেবেন। শোনামাত্র কবি আট হাজার টাকা দিয়ে সেটা কিনে ফেললেন। তাঁর ইচ্ছা রথীন্দ্রনাথ সেখানে থাকবেন, ল্যাবরেটরি নিয়ে কাজকর্ম করবেন— শিলাইদহে থাকতে আর ভালো লাগছে না।

৭৩

ইংলন্ডে মাস-চার থেকে রবীন্দ্রনাথ পুত্র পুত্রবধূকে নিয়ে আমেরিকায় গেলেন (২৮ নভেম্বর ১৯১২)। সে দেশ তাঁর নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। নিউইয়র্কের ঘাটে মাশুল-যাচাইয়ের ঘরে ঘণ্টা-দুই আটকা থাকার অভিনব অভিজ্ঞতা হল। সে কী দুর্ভোগ!

নিউইয়র্ক থেকে তাঁরা সোজা চলে গেলেন ইলিনয় স্টেটের আর্বানা শহরে। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রথীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করেছিলেন ; সেখানকার অধ্যাপকদের দুই-একজনের সঙ্গে পত্রবিনিময়ে পরিচয় ছিল। সেই-সব সূত্র ধরে তাঁরা আর্বানায় এলেন। শান্তিনিকেতনের বঙ্কিমচন্দ্র রায় আছেন। হার্ভাড্ থেকে এলেন সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা ; কয়েকটি চেনামুখ দেখে কবি খুব খুশি।

আর্বানা ক্ষুদ্র শহর। জনসংখ্যা আট-দশ-হাজারের বেশি নয় ; কোথাও গোলমাল নেই। আকাশ খোলা, আলো-বাতাস প্রচুর, অবকাশ

অব্যাহত— কবি ভুলে যান যে আমেরিকায় এসেছেন। কবির ইচ্ছা দীর্ঘকাল এখানে থাকবেন।

রথীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবতত্ত্ব নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত হলেন। প্রতিমা দেবীকে ঘর-সংসার দেখতে হয়— আমেরিকায় তো আর এ দেশের মতো ঝি-চাকর সস্তাও নয়, সুপ্রাপ্যও নয়; তবে শ্রমহারক যন্ত্রপাতি ও টিনেবদ্ধ খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য বলে গৃহস্থের অনেক দুঃখের লাঘব হয়।

আমেরিকার লোকে বক্তৃতাবিলাসী; তারা বক্তৃতা শুনতে ও শোনাতে ভালোবাসে। আর্বানার একেশ্বরবাদী (ইউনিটেরিয়ান) খৃষ্টীয় চার্চের পাদরী মিঃ ভেল (Vail) কবিকে এসে ধরলেন, তাঁদের ইউনিটি ক্লাবে বক্তৃতার জন্য। সেখানে প্রতি রবিবারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের গুরুদের সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের লোক— ইউনিটেরিয়ানরা সে খবর রাখে। খৃষ্টানদের মধ্যে ইউনিটেরিয়ানরা ব্রাহ্মদের মতো।

কবির কাছে কয়েকটা প্রবন্ধের তর্জমা ছিল, সেইগুলি কাটছাঁট করে একে একে সভাস্থলে পড়ে শোনালেন। পাশ্চাত্য দেশে কবির ইংরেজিতে এই প্রথম ভাষণ দেওয়া। তিনি ভাবতে পারেন নি যে, লোকের এগুলো ভালো লাগবে। কিন্তু আশ্চর্য উৎরে গেল।

আর্বানা থেকে শিকাগো এলেন জানুয়ারি মাসের (১৯১৩) শেষ ভাগে। সেখানেও কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করতে হল। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকা হল না; কারণ আহ্বান এসেছে রচেস্টার থেকে— নিউইয়র্কের কাছে এক শহর। সেখানে নানা ধর্মের উদারমনাদের সম্মেলন বসেছে। নানা দেশ থেকে বহু নামজাদা দার্শনিক ও তত্ত্ববিদ্ এসেছেন; এঁদের মধ্যে ছিলেন জর্মেনির জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক রুডোল্ফ্ অয়্কেন। অয়্কেনের সঙ্গে অজিতকুমারের পত্রব্যবহার ছিল এবং তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক খবর অয়্কেন সংগ্রহ করেছিলেন।

৩০শে জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে 'রেস্ কন্‌ফ্লিক্ট্' বা জাতিসংঘাত সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত পত্রিকা 'ক্রিশ্চান রেজিস্টার' বললেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় মহাসভার সমস্ত সুর

উচ্চগ্রামে উঠে পড়েছিল। এঁদের মতে সভামঞ্চে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অধিক সাহিত্যখ্যাতিসম্পন্ন বা অধিকতর গূঢ় ভাবপূর্ণ কথা বলতে সক্ষম ব্যক্তি আর কেউ ছিল না।

রচেস্টার থেকে কবি বোস্টনে এলেন; নিকটে কেম্‌ব্রিজ শহরে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে কয়েকটি বক্তৃতার জন্য আহূত হলেন। তার পর নিউইয়র্ক ঘুরে, শিকাগো হয়ে, আর্বানায় ফিরে এলেন।

দেখতে দেখতে আমেরিকায় ছ মাস কেটে গেল; বিলাতে ফেরবার জন্য কবির মন আবার ব্যাকুল হয়ে উঠল। রথীন্দ্রনাথের জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার কাজ অঙ্কুরেই নষ্ট হল— প্রত্যাবর্তন করাই স্থির।

কবির কল্পনাবিলাসী মনে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কত কথাই উঠছে। ভাবছেন, সেখানে টেক্‌নিক্যাল বিভাগ খুলতে হবে; সেখানে ল্যাবরেটরি স্থাপিত হবে, রথীন্দ্রনাথ গবেষণা করবেন; ভালো একটা হাসপাতালের প্রয়োজন, ইত্যাদি। ভবিষ্যতে শান্তিনিকেতনে যে একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারে সে স্বপ্নও দেখছেন। প্রাচীন ভারতের কাষায়বস্ত্রপরিহিত ব্রহ্মচারীর আশ্রম-স্বপ্ন কি ভেঙে গেছে? 'প্রাচীন ভারতের' অবাস্তবতা থেকে কবির মন ক্রমশই মুক্তি পেয়ে আধুনিক হয়ে উঠছে; য়ুরোপ ও আমেরিকা -ভ্রমণের এটাই হল প্রত্যক্ষ ফল। ভারতীয়রা যে পাশ্চাত্য জাতির সমতুল্য নয়, এইটা পদে পদে অনুভব করছেন। বিদ্যায় বুদ্ধিতে শক্তিতে তাদের সমতুল হতে না পারলে বিশ্বদরবারে সম্মানের আসন সে পাবে না, এই ভাব থেকেই কবি আজ শিক্ষাসমস্যাকে দেখছেন এবং শান্তিনিকেতনকে গড়ে তুলতে হবে ভাবছেন।

আমেরিকা থেকে বহু চিঠি লিখছেন, বহু বই পাঠাচ্ছেন শিক্ষাসমস্যা ও শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে— বিজ্ঞানের বই বেশি। কবির ইচ্ছা বিজ্ঞান সম্পর্কে বইগুলি পড়ে কেউ ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দেন। ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ঝোঁক তাঁর শুরু থেকেই। ল্যাবরেটরি স্থাপনের পরিকল্পনা এই জন্যই। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রদের জন্য যখন ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়, তখনো ভারতের কোনো দেশীয় স্কুলে বিজ্ঞান পড়াবার জন্য বিজ্ঞানাগার ছিল না। জগদানন্দ রায় ছিলেন এর কর্ণধার।

৭৪

আমেরিকায় থাকতেই খবর পেলেন যে, ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' ইন্‌ডিয়া সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং ইংলন্‌ডে সমাদর লাভ করেছে।

বিলাতে ফিরে এসে দেখেন কাগজে কাগজে 'গীতাঞ্জলি'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা। একখানি পত্রে কবি লিখছেন, "চারি দিকে আমার নিজের নামের এই-যে ঢেউ তোলা এ আমার কিছুতেই ভালো লাগছে না। এই নিয়ে আমার নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে।" কবির এ দ্বন্দ্ব চিরদিনের— সম্মানের বোঝায় চিত্ত পীড়িত হয়, আবার যদি ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা পান তাতেও মন মুষড়ে যায়। সংগ্রাম চলে এ-সবের ঊর্ধ্বে ওঠবার জন্য। সংগ্রামে জয়ী হন; তা না হলে নির্বিকারভাবে সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারতেন না।

এবারে ইংলন্‌ডে ফেরবার পর ক্যাক্‌স্‌টন হলে কবির অনেকগুলি বক্তৃতা হল; ইংরেজি 'সাধনা' (*Sadhana*) গ্রন্থে সেগুলি মুদ্রিত হয়েছে। আসলে কিন্তু সেগুলি 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার মূল কথার ভাবব্যাখ্যান, কয়েকটি প্রায় অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথের ধর্মদেশনাগুলি উপনিষদের ঋষিদের বাণীর ব্যাখ্যান হলেও কবির নিজস্ব ভাবনা ও মনোভঙ্গি সেগুলির মধ্যে যথেষ্ট ছিল; সেগুলি উপনিষদের ভাষ্য শুধু নয়। কবির আপন কর্মসাধনায় উপনিষদের ব্রহ্মবাদ যে রূপ নিয়েছে তারই কথা বলা হয়েছে 'সাধনা'র বক্তৃতায়।

কবি বিলাতে থাকতে থাকতেই তাঁর 'ডাকঘর' ও 'রাজা' নাটক দুটির তর্জমা হয়; এবং সেগুলির অভিনয়ও হয় সে দেশে। এই দুটি নাটিকা য়ুরোপের শিক্ষিত চিত্তকে খুবই আকর্ষণ করে; য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে এর অভিনয় বহুবার হয়।

আমরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের কথাই বলছি, কিন্তু তিনি যে অর্শরোগে কষ্ট পাচ্ছেন সে কথাও ভুলি নি। এই রোগে কী যে যন্ত্রণা পেতেন তা আমাদের স্বচক্ষে দেখা, আর দেখেছি কী অসম্ভব ধৈর্য-সহকারে যন্ত্রণা সহ্য করতেন। জুন মাসে (১৯১৩) হাসপাতালে গিয়ে অস্ত্রোপচার করালেন। সেখানে প্রায় এক মাস আবদ্ধ থাকতে হয়।

হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডনের চেল্‌সি পাড়ার চেন্‌-ওয়াকের এক বাড়িতে কিছুকাল থাকেন। বহুকাল পরে এখানে কাব্যলক্ষ্মী দেখা দিলেন। আমেরিকায় থাকতে দুই-একটা কবিতা লেখেন, কিন্তু সে দেশ যেন কবিতা লেখার অনুকূল নয়। লন্ডনের এই বাসাবাড়িতে 'গীতিমাল্যে'র কতকগুলি সুপরিচিত গান লেখা হয়। দেশে ফেরবার আগে কয়েকদিন রোদেনস্টাইনের বাড়িতেও থেকে আসেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কবি কালীমোহন ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে লিভারপুল থেকে 'সিটি অব লাহোর' জাহাজে উঠলেন। এই জাহাজ জিব্রাল্টার ঘুরে যাবে। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী য়ুরোপ-ভ্রমণে গিয়েছিলেন। নেপ্‌ল্‌সে এসে এই জাহাজ ধরলেন। ফেরার মুখে জাহাজে বসে অনেকগুলি গান লেখেন। পুরো একমাস পরে ৪ঠা অক্টোবর জাহাজ বোম্বাই পৌছল। এ যাত্রায় বাংলাদেশ থেকে কবির মোট প্রবাসকাল এক বৎসর চার মাসের থেকেও বেশি।

৭৫

এই ষোলো মাসের মধ্যে দেশের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে— বঙ্গচ্ছেদ রদ হয়েছে (এপ্রিল ১৯১২), বিহার উড়িষ্যা পৃথক্ প্রদেশ হয়েছে, আসাম পুনরায় পৃথক্ হয়েছে, পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ মিলে বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমানের বঙ্গদেশ অখণ্ড একক হয়েছে। কলিকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এত পরিবর্তনের মধ্যেও বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা পূর্ববৎ চলছে।

বিলাতে থাকবার সময়ে সি. এফ. এন্ড্রুজ নামে এক পাদরী অধ্যাপকের সঙ্গে কবির দেখা হয়। ইনি দিল্লীর সেণ্ট্ স্টিফেন্স্ কলেজের অধ্যাপক। কবি যখন বিলাতে সেই সময়ে এন্ড্রুজ ও তাঁর এক বন্ধু পিয়ার্সন, উভয়েই শান্তিনিকেতন ঘুরে গেছেন— তাঁদের ইচ্ছা একদিন এখানে স্থায়ীভাবে আসবেন। তাঁদের মুগ্ধ করেছে কবির ব্যক্তিত্ব, তাঁর কাব্যপ্রতিভা, কবির দরদী মন ও সব থেকে তাঁর বিশ্বমানবতা।

কিন্তু কবিজীবনের সবটাই প্রশংসায় ও স্তুতিবাদে পূর্ণ নয়। তাঁর

অনুপস্থিতির সময়ে বাংলার কয়েকটি সাময়িক পত্র প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। এর উপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক ব্যঙ্গনাটকের অভিনয় করিয়ে কবিকে হাস্যাস্পদ করবার চেষ্টা করেন। অবশ্য, বাঙালি দর্শক তা নীরবে সহ্য করে নি। এ রকম ছোটোখাটো অনেকগুলি ঘটনা ঘটে। বিলাতে থাকতে কবি এক পত্রে লিখেছিলেন যে, "দেশে ফিরে গিয়ে চারি দিক থেকে কত ছোটো কথাই শুনতে হবে, বিরোধ-বিদ্বেষ, কত নিন্দাগ্লানি··· কিন্তু অপ্রিয়তাকে পাশ কাটিয়ে চলা চলে না, তাকে ঠেলে চলাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা। যা ভালো লাগে না, তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে ডরিয়ে ডরিয়ে চলব না।"

কলিকাতায় এসে দেখেন বাইরে থেকে যা অনুমান করে এসে ছিলেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। পারিবারিক অশান্তির কথা শুনতে শুনতে মন তিক্ত হয়ে উঠল ; দুদিন পরেই শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন। সেখান থেকে লিখছেন, "কত আরাম যে সে আর বলতে পারি নে।"

কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। এক পত্রে বলছেন, "বোলপুরে আমার আসনটি এমন জমে গেছে যে এখান থেকে নড়তে আমার সাহস হয় না। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে কেবল আমার চোখের দেখার সম্বন্ধ নয়। একে আমার জীবনের সাধনা দিয়ে পেয়েছি— সেইজন্য এখানেই পড়ে থাকি এবং পড়ে থেকেই আমার ভ্রমণের কাজ হয়।"

দূরপিয়াসী ও নীড়বিলাসী মন এক তারেই বাঁধা।

পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলেছে। ১৫ই নভেম্বর (১৯১৩) সন্ধ্যায় খবর এল রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের জন্য 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে সুইডেনের বিখ্যাত শিল্পপতি আল্‌ফ্রেড নোবেল কয়েক কোটি টাকা সুইডিশ অ্যাকাডেমির হাতে দিয়ে বলেছিলেন, ঐ টাকার সুদ থেকে সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়ে পাঁচটি পুরস্কার যেন যোগ্য ব্যক্তিদের বৎসরে বৎসরে দেওয়া হয়। ১৯০১ সাল থেকে পাঁচটি বিষয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন ব্যক্তিকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হয়ে আসছে। প্রাচ্য দেশীয়ের মধ্যে এই পুরস্কার রবীন্দ্রনাথই প্রথম লাভ করলেন। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। এ কথাও স্মরণীয় যে, আজ পর্যন্ত

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোনো এশিয়ান— সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান নি।

বলা বাহুল্য, সমস্ত দেশ কবির এই সম্মানে গৌরব বোধ করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। কলিকাতার শিক্ষিত ভদ্রজন কবিকে শান্তিনিকেতনে সংবর্ধনা করতে এলেন; প্রায় পাঁচশ'ত নরনারী স্পেশাল ট্রেনে করে বোলপুর পৌঁছলেন ১৯১৩ সনের ২৩শে নভেম্বর তারিখে (৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২০)। এঁরা যে কবির নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ পেয়ে সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন, তা নয়। কলিকাতায় টাউন হলে কবিকে সম্মান দেখাবার আয়োজন হচ্ছিল, এমন সময়ে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ এল। তখন কলিকাতার উৎসাহীরা ঠিক করলেন যে, শান্তিনিকেতনে কবির আপন স্থানে গিয়ে তাঁদের সম্মান ও প্রীতি জানিয়ে আসবেন।

শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে উৎসব হল; নানা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সম্প্রদায় কবিকে মানপত্র দিলেন। সেদিনকার শ্রদ্ধানিবেদনের মধ্যে বাঙালির কোনো কপটতা ছিল না। কিন্তু কবির মনে কী একটা ক্ষোভ ছিল, অকস্মাৎ সেদিন বের হয়ে পড়ল। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা অত্যন্ত তিক্ত একখানা চিঠি সেদিনই তাঁর হস্তগত হয়, আর সভায় উপস্থিত হয়ে এমন কয়েকজনকেও একেবারে সামনে দেখলেন যাঁরা বরাবর কবিকে অনাদর করে এসেছেন। সংবর্ধনার আয়োজনকে কৃত্রিম বলে তাঁর মনে হল। তাই প্রতিভাষণে এমন কড়া কথা বললেন যাতে কবির ভক্ত অভক্ত সকলেই যার-পর-নেই ক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন। তাঁর ঐ ভাষণ নিয়ে সমসাময়িক কাগজে-পত্রে বহুদিন বহু আলোচনা চলেছিল। কবি যা বলেছিলেন তা একেবারে মিথ্যা নয়, কারণ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকেই তাঁর বইয়ের বিক্রি বেড়ে গেল।

আমাদের মনে হয়, এই ৭ই অগ্রহায়ণ ছিল তাঁর স্ত্রীর ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যুদিন; হয়তো এই দেশব্যাপী গৌরবের দিনে তাদের কথা স্মরণ করে তাঁর মন স্বভাবতঃই ভারাক্রান্ত ছিল। কবিও মানুষ, যত শান্ত সংযত হন তাঁরও মন মানুষেরই মন।

এখানে একটি ছোটো ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের আলোচ্যপর্বে (১৯১২-১৩) দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচার অবিচার বন্ধ করবার জন্য ডার্বানে গুজরাটি ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নাটালে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন চালনা করছেন। সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্য রেভারেণ্ড সি. এফ. এন্ড্রুজ ও অধ্যাপক পিয়ার্সন বে-সরকারিভাবে সেখানে যাচ্ছেন। তখন এঁরা পুরোপুরি আশ্রমের কাজে যোগদান করেন নি; আসাযাওয়া করছেন, মন প্রাণ এখানে বাঁধা পড়েছে। তাঁদের জন্য বিদায়সভা হয়। কবি এন্ড্রুজকে এক পত্রে লেখেন, "আপনি শ্রীযুক্ত গান্ধী ও অন্য সকলের সঙ্গে আফ্রিকায় আমাদের হয়েই লড়ছেন।" (You are fighting our Cause in Africa along with Mr. Gandhi and others)। এই বোধ হয় গান্ধীজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখ।

৭৬

এবার ৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনের কবির ভাষণে নূতন সুর শোনা গেল। তিনি বললেন, "এ আশ্রম, এখানে কোনো দল নেই।" বিলাত যাবার পূর্বে আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যে-সব ধারণা ও মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, তা যেন কিছুটা শমিত হয়েছে। এখন বলছেন, "ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে।" এ কথা বলার বিশেষ তাৎপর্য ছিল। কারণ, এখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে কেবল হিন্দু নেই; তিন চারজন খৃষ্টান ও বিদেশী এসেছেন— ক্যাপ্টেন পেটাভেল ও তাঁর স্ত্রী, এন্ড্রুজ ও পিয়ার্সন। শান্তিনিকেতনের সব-কিছুকেই দেখতে হচ্ছে নূতন পরিপ্রেক্ষিতে।

পৌষ-উৎসবের পর কলিকাতায় গেলেন; সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবিকে ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি দেওয়া হল। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার বড়োলাট লর্ড হার্ডিং, ভাইস-চ্যান্সেলার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, নোবেল

পুরস্কার ঘোষিত হবার পূর্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানিত করবার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। মাসখানেক পরে গবর্মেণ্ট্ হাউসে (রাজভবনে) কবিকে নোবেল পুরস্কারের মানপত্রাদি অর্পণ করবার জন্য বিরাট দরবার আহূত হয়। বাংলাদেশের নূতন লাট লর্ড্ কারমাইকেল সুইডিশ সরকারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন।

৭৭

নোবেল প্রাইজ ঘোষিত হবার পাঁচ মাস পরে ১৩২১ সালের বৈশাখে বা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্র' নামে নূতন মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন। নূতন কালের প্রেরণায়, নবীনের আকর্ষণে, সাহিত্যের আসরে নূতন কথা বলবার জন্য কবির মন আর-একবার জেগে উঠল। অনেক কথা, অনেক ভাবনা-চিন্তা আছে যা কড়া গদ্য ছাড়া প্রকাশ করা যায় না। সুযোগ হল নূতন পত্রিকার আবির্ভাবে। মনের অনেক রুদ্ধ বেদনা প্রকাশ পেল 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে। কবি বললেন, দেশের মধ্যে এক সময়ে চলার ঝোঁক এসেছিল, সেটা কেটে গিয়ে এখন বাঙালির মনীষা আবার বাঁধি-বোলের বেড়া বাঁধবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। চারি দিকে দেখতে পাচ্ছেন —চলতে গেলেই বাধা। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন যে, এমন স্থলে খাঁচাটাকেই ভাঙবার পরামর্শ দিতে হয়; সেটা বিবেচকদের বুদ্ধিতে অবিবেচনার কাজ। 'সবুজের অভিযান' কবিতায় লিখলেন:

ঘুচিয়ে দে তুই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা!

এমন করে নবীনদের কেউ সম্মান দেয় নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে নূতন পালা শুরু হল 'বলাকা' কাব্যখণ্ডের এই কবিতা থেকে। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে তারই ভূমিকা ও ভাষ্য।

নববর্ষে (১৩২১) নূতন একটা ঘটনা বলবার মতো, কারণ তার সঙ্গে কবির মানসপুত্র বিশ্বভারতীর ইতিহাস জড়িত। সেটি হচ্ছে—সুরুলের কুঠিবাড়িতে গৃহপ্রবেশ। দুই বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ, বিলাতে থাকতেই

সুরুলের বাড়ি ও জমি কেনা হয়েছিল। প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয় করে জঙ্গল কাটিয়ে, ভাঙাবাড়ি সংস্কার করে আধুনিক করা হয়েছে— এমন-কি বিজলী বাতির জন্য এঞ্জিন ডাইনামো এসে গেল— কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ের ধ্বংসাবশেষ— শেষ চিহ্ন! শিলাইদহের পাট গুটিয়ে জিনিসপত্র, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, সুরুলে এসে গেল। সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ চলতে পারবে। এখন টাকার অনটন নেই; বিলাত থেকে ম্যাক্‌মিলান কোম্পানি অনূদিত বই - বিক্রয়ের দরুন মোটা অঙ্কের টাকা পাঠাচ্ছে।

৭৮

গ্রীষ্মাবকাশে কবি সপরিবারে রামগড় পাহাড়ে গেলেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে নৈনিতালের কাছে একটা বাগানবাড়ি রথীন্দ্রনাথ কিনেছিলেন। জায়গাটি কাঠগোদাম থেকে ষোলো মাইল দূরে।

রামগড়ের একটা ঘটনা বলি। বাড়ির এক মালীর মাথা-কাঁপা ব্যায়রাম দেখে কবি তাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিলেন, তার মাথার কাঁপুনি গেল সেরে। চার দিকে সংবাদটা কিরকম করে ছড়িয়ে গেল। তার পর স্থানীয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টার চিঠিপত্রের শিরোনামায় দেখে 'ডক্টর' লেখা— সেও রাষ্ট্র করল কলকাতা থেকে বড়ো এক 'ডাক্টর সাহাব আয়া'। ফলে রোজ সকালে রোগীর ভিড় জমে— বারান্দায়, প্রাঙ্গণে— কবি ঔষধ দেন তাদের।

রবীন্দ্রনাথ যে খুব ভালো হোমিওপ্যাথ ছিলেন সে খবর অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু আমরা জানি। ইংরেজিতে ছাপা হোমিওপ্যাথির উপর নামকরা বই প্রায় সবই তাঁর ছিল। শেষজীবনে বায়োকেমিকের উপর পড়ে ঝোঁক।

নূতন জায়গায় এসে কবির মন বেশ প্রসন্ন; কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে মনের উপর অন্ধকারের মেঘ নেমে এল; ভাবীকালে কী একটা অমঙ্গল যেন পৃথিবীর উপর কালো ছায়ার মতো নেমে আসছে। 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতায় এই ভাবের ব্যঞ্জনাই ফুটে উঠেছে। 'সর্বনেশে' 'আহ্বান' 'শঙ্খ' কবিতা তিনটি পড়লেই সেটি বোঝা যাবে। য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ আসন্ন— এ কি তারই পূর্বাভাস? অথবা নিজের কোনো অন্তরদ্বন্দ্ব ও অন্তরবেদনার প্রকাশ, তাও জানি নে।

কিন্তু মেঘ জমতে যতক্ষণ, সরে যেতেও ততক্ষণ। এ সময়ে এনড্রুজকে নিয়মিত পত্র দিচ্ছেন; সেই-সব পত্র পড়লেই জানা যাবে তাঁর মনের এই জোয়ার-ভাঁটা কখন কোন্ দিকে বইছে।

মনের অবস্থা যেমনই থাক্, সবুজ পত্রের জন্য নিয়মিত রচনা, কবিতা, গল্প লিখছেন। গীতালির গানও চলছে নিত্য পূজানিবেদনের মতো। সেই সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর পরম মুক্তি; সমস্ত বিষাদ যায় চলে, যখন এই সুরসাধনায় মশগুল থাকে মন।

রবীন্দ্রনাথের সবুজ পত্রের যে গল্প নিয়ে সে যুগে সাহিত্যিক সমাজতাত্ত্বিক মহলে সব থেকে আলোড়ন জেগেছিল সে হচ্ছে 'স্ত্রীর পত্র'। কোনো একটি ছোটো গল্প নিয়ে এর পূর্বে বা পরে এমন মসীবর্ষণ আর হয় নি। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ভাঙার সুর গল্পের মধ্যে স্পষ্ট; নারীরও যে একটা ব্যক্তিসত্তা থাকতে পারে এটা আমাদের সমাজে প্রায় চিরদিন অস্বীকৃত হয়ে আসছে।

বাংলাসাহিত্যে নারীবিদ্রোহের সূচনা হল সবুজ পত্রের এই গল্প থেকে। পাশ্চাত্যসাহিত্যে ইব্‌সেনের 'ডল্‌স্ হাউস'-এর নোরার চরিত্র যেমন করে য়ুরোপীয় সমাজকে চকিত করে তুলেছিল, 'স্ত্রীর পত্র' 'হৈমন্তী' 'বোষ্টমী' প্রভৃতি গল্পও তেমনিভাবে বাঙালি সমাজকে রূঢ় আঘাত করল। গল্পোপন্যাস 'চতুরঙ্গ' ও উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে' এ যুগের সাহিত্যিক-মহলে কম আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। মোট কথা, এই-সব রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক নামজাদা লেখকের কাছ থেকে অনেক কঠোর বাক্য শুনতে হয়েছিল।

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল হঠাৎ য়ুরোপের এক কোণে। দেখতে দেখতে গৃহদাহের সেই আগুন য়ুরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল; পশ্চিম এশিয়ায় তার ফুল্‌কি উড়ে পড়ল, ভারতেও তার আঁচ লাগল। রবীন্দ্রনাথের মন দারুণ আঘাত পেল; শান্তিনিকেতনে মন্দিরে বুধবারের প্রার্থনায় বললেন, "বিশ্বের পাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে, সেই বিশ্বপাপকে দূর করো।··· বিনাশ থেকে রক্ষা করো।" কিন্তু কে কার প্রার্থনা শোনে। আগুন জ্বলতেই থাকল; ধ্বংস থেকে কেউ মানুষের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারলে না। কবি নিজের মনে,

যুদ্ধের কারণ কোথায় তারই সন্ধান করছেন। বললেন, "মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক— সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপে বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে।"

৭৯

কবির সুরুলের স্বপ্নও ভেঙে গেল। রথীন্দ্রনাথরা সেখানে ম্যালেরিয়ায় পড়লেন, স্থান ত্যাগ করার প্রয়োজন হল। কিছুকাল জামাতা নগেন্দ্রনাথ সেখানে থাকলেন; পরে তাঁকেও সে স্থান ছাড়তে হয়।

সকলেই সংসার গুটিয়ে কলিকাতায় আস্তানা নিলেন। শিলাইদহে ও সুরুলে গ্রামসংস্কারের পরিকল্পনা— গ্রামের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-কার্যের প্রবর্তন ও গোধনের উন্নতিসাধন— সমস্তই এখন আকাশকুসুম মনে হল। শান্তিনিকেতনে সন্তোষচন্দ্রের গো-শালার অবস্থাও তথৈবচ। গো-শালা দেখে লালধারীরা খুড়ো-ভাইপো মিলে; সন্তোষচন্দ্র ছেলে পড়ান, ড্রিল করান, অতিথিসৎকার করেন।

শান্তিনিকেতনে কবির মন বসছে না। তাঁর মনে হচ্ছে, বিদ্যালয় যেন একটা কোথায় এসে থেমে গেছে— তাঁর ভাবধারা কেউ গ্রহণ করছে না। এন্‌ড্রুজ পিয়ার্সন এসেছেন বড়ো আদর্শের সন্ধানে; ছাত্রদের ইংরেজি ভাষায় দুরস্ত করে ম্যাট্রিকুলেশনের খেয়া পারাপার করার জন্য নিশ্চয়ই না। অথচ বিদ্যালয়কে নূতনভাবে চালনার বাধা অনেক— বাধা তার অধ্যাপকেরা, বাধা তার অভিভাবকেরা, বাধা তার ছাত্রেরা। এই-সব নিয়ে কবির মন ভিতরে ভিতরে বিরক্ত; তাই বাইরে বাইরে ঘুরছেন। কিন্তু কবি বিশ্লেষণ করে কি দেখেন নি যে, সব থেকে বড়ো বাধা আসে তাঁর নিজের ভিতর থেকে?

যখনই বিদ্যালয় একটা রূপ নেয় তখনই তাঁর মনে হয়, "হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোন্‌খানে।"

অর্থাৎ, এ রূপ তো তিনি কল্পনা করেন নি— "ভাঙো, ভাঙো, বদল

করো, নতুন লোক আনো"। এই নূতনের মোহ কখনোই বিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে গড়বার সহায়তা করে নি। অথচ এই নূতনের প্রতি আকর্ষণ ছিল বলেই প্রতিষ্ঠান কেবলই এগিয়ে চলেছিল— কোনো সম্প্রদায়ের বা কোনো মতবাদের মঠ-মন্দির হয় নি, তিনিও 'গুরু' বা মোহন্তের পদে অভিষিক্ত হন নি।

পূজাবকাশের পর গয়ায় গেলেন; ব্যারিস্টার লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তখন সেখানে থাকেন। কবির মন 'গীতালি'র গান-রচনায় মশগুল হয়ে আছে। এবার এই গয়া-ভ্রমণে কবির নানারূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একদিন এক ধাপ্পাবাজ লোকের পাল্লায় পড়ে সারাদিন ট্রেনে ও পাল্‌কিতে ঘুরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সেই অবস্থাতেও গান লিখছেন স্টেশনে ব'সে, পাল্‌কিতে যেতে যেতে।

গয়া থেকে আসলেন এলাহাবাদ। উঠলেন সত্যপ্রসাদের জামাতা প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

কবি এই শহরে আরো দুইবার এসেছিলেন; প্রথম বার (১৯০১) আসেন মহর্ষির নির্দেশে বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নীকে তাঁর পিত্রালয় থেকে কলিকাতায় আনবার জন্য। আর দ্বিতীয় বার কালকায় কনিষ্ঠা কন্যা মীরাকে তার ভাসুরের কাছে রেখে ফেরবার পথে শরীর খারাপ হওয়ায় এখানে নেমেছিলেন (১৯০৯)। দীর্ঘকাল থাকা কোনো বারেই হয় নি।

এবার প্যারীমোহনের বাড়িতে তিন সপ্তাহ কাটালেন। 'গীতালি'র গানের পালা এখানে শেষ এবং 'বলাকা' কাব্যের নূতন ধারা শুরু হল।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পরিবেশে তাঁর বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর ছবি একটি ঘরে দেখে বহুকালের কথা মনে হল। তখন লিখলেন 'ছবি':

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা।

আর কয়েকদিন পরে লেখেন শা-জাহান:

এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায়, জীবন যৌবন ধনমান।

এই দুটি কবিতা একই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তাদের নিহিতার্থ স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

৭ই পৌষের উৎসবের জন্য (১৩২১) শান্তিনিকেতনে ফিরলেন; উৎসবান্তে কিছুকাল কলিকাতায় থেকে মাঘোৎসব করে শিলাইদহে চলে গেলেন। কুঠিবাড়ি শূন্য। একদিন সেখানে সংসার বাঁধবার যে আশায় পুত্র-পুত্রবধূ ও কন্যা-জামাতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয়েছে; তাই এবার নৌকায় থাকলেন।

শিলাইদহে এলেন তিনজন শিল্পী, নন্দলাল বসু— তাঁর শিক্ষানবিশি শেষ হয়েছে, স্বরেন্দ্রনাথ কর ও মুকুলচন্দ্র দে— এখনো শিক্ষানবিশ। সকলেই অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য। এঁদের এখানে পেয়ে মন বেশ প্রসন্ন হল। এই তিন শিল্পীই কালে কবির জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে পড়েন।

মাঘ মাসের শেষে (১৯১৫) কলিকাতায় এলেন; সে সময়ে ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়বার আয়োজন করছেন। উদ্বোধনসভায় কবিকে ডাক্তার মৈত্র নিয়ে যান। সেখানে ভাষণের মধ্যে কবি বললেন, "কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।... দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেছে... আমাদের ভয় নেই।" আজ যে প্রচণ্ড জনশক্তি দেখা যাচ্ছে তখন তার শিশুমূর্তিটি অনেকেরই চোখে পড়ে নি— কবি তাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

কবি বোলপুর ফিরলেন (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫); উঠলেন স্কুলের কুঠিবাড়িতে, সেও শূন্য পুরী। সেখানে বসে লিখছেন 'ফাল্গুনী' নাটিকা। "আশ্রমের ছেলেবুড়ো সবাই ধরেছে বসন্ত-উৎসবের উপযোগী একটা ছোটো নাটক রচনা করে" দেবার জন্য। বারাকপুর থেকে বড়োলাটের নিমন্ত্রণ এসেছে— শীতকালে তিনি দিল্লি থেকে বাংলাদেশে সফরে এসেছেন। কিন্তু কবির মন 'ফাল্গুনী'র গান-রচনায় এমন মশ্‌গুল যে সে আমন্ত্রণ তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। 'ফাল্গুনী' লেখা চলল।

৮০

কবি যখন উত্তরভারতে ঘুরছেন তখন খবর পান গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার পাট গুটিয়ে ভারতে ফিরে আসবেন। ভারতীয়দের ন্যায্য দাবি ও সম্মান

বজায় রেখে সে দেশে থাকবার জন্য যে সত্যাগ্রহ চালিয়েছিলেন, জেনারেল স্মাট্‌সের সঙ্গে একটা চুক্তিরফা হবার পর তা স্থগিত রাখলেন। তার পর প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে বিলাতের ঔপনিবেশিক সচিবের দপ্তরকে ওয়াকিবহাল করবার জন্য গান্ধীজি বিলাত রওনা হয়ে গেলেন। তখন সমস্যা হল তাঁর ফিনিক্স্ বিদ্যালয় নিয়ে— জন কুড়ি-পঁচিশ ছাত্র, কয়েকজন শিক্ষক— ছাত্রদের মধ্যে গান্ধীজির ছেলেরাও আছেন। আর, এমন ছাত্রও আছে যারা আফ্রিকায় জন্মেছে, ভারত দেখে নি। ভারতে তাদের পাঠাবেন, কিন্তু কোথায় তারা আশ্রয় পাবে? গান্ধীজি তখনো ভারতে সুপরিচিত নন। এন্ড্রুজ সাহেবের মধ্যস্থতায় ও ব্যবস্থায় আফ্রিকা-প্রত্যাগত ছাত্র-শিক্ষকেরা শান্তিনিকেতনে এলেন। রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে প্রবাসীদের স্বাগত জানিয়ে গান্ধীজিকে পত্র দিলেন, বোধ হয় এই তাঁর গান্ধীজিকে প্রথম চিঠি লেখা।

ইংলন্ড্ থেকে ফিরে গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ শান্তিনিকেতনে এলেন ছেলেদের ও ছাত্রদের দেখবার জন্য (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫)। কিন্তু গোখ্‌লের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দুদিন পরেই তাঁদের পুনা চলে যেতে হল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখনো তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি।

পুনা থেকে ফিরে আসবার পর কবির সঙ্গে কর্মযোগীর প্রথম সাক্ষাৎকার হল ৬ই মার্চ তারিখে।

গান্ধীজি আশ্রমের হালচাল দেখে খুশি হতে পারলেন না; ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে নিজেদের কাজ নিজেরাই করবার জন্য উৎসাহিত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ সুরুলে আছেন। উৎসাহীর দল তাঁর কাছে তাদের অভিপ্রায় জানালে তিনি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছিলেন— পরীক্ষা করে দেখতে তাঁরও উৎসাহ কম নয়। নিজের জীবনে কম পরীক্ষা তো করেন নি। নিমপাতা-সিদ্ধ জল খাওয়া থেকে রেড়ির তেলের ময়ান দেওয়া রুটি খাওয়া— কী না করেছেন।

গান্ধীজির ফিনিক্স্ স্কুলের ছাত্রেরা নিজেদের সব কাজই নিজেরা করত— তাদের ভৃত্য পাচক ছিল না। সেই আদর্শে উৎসাহিত হয়ে

তরুণ শিক্ষক ও স্কুলের বালকগণ সকল কাজ আপনারাই করবেন ঠিক করলেন। "সব কাজে হাত লাগাই মোরা" বলে চাকর, পাচক, মেথর, জলের ভারী, সবাইকে বিদায় করে দেওয়া হল। ছাত্র-অধ্যাপকে মিলে সকাল থেকে দুশো জন লোকের যাবতীয় কাজে লাগলেন। কুটনো কুটতে কুটতে ঘণ্টা শুনে, পড়তে এবং পড়াতে যাওয়ার ফল যে কী হচ্ছিল তা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

১৯১৫ খৃস্টাব্দের ১০ মার্চ (২৬ ফাল্গুন ১৩২১) এই নূতন পরীক্ষা আরম্ভ হয় বলে এখনো সে দিনটি আশ্রমে 'গান্ধী-দিবস' বলে পালিত হয়।

পরদিন গান্ধীজি রেঙ্গুনে চলে গেলেন ও কুড়ি দিন পরে এসে ফিনিক্স্ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে কুম্ভমেলা দেখতে গেলেন। স্থির হয়েছে তারা অন্যত্র থাকবে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে চার মাসের সম্বন্ধ মাত্র, কিন্তু সে কথা গান্ধীজি কখনো বিস্মৃত হন নি।

দিন-দশ পরে শান্তিনিকেতন দেখতে এলেন বাংলাদেশের গবর্নর লর্ড্ কারমাইকেল (২০ মার্চ ১৯১৫)। কথাটি যে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি, তার কারণ আছে।

তিন বৎসর পূর্বে যে শান্তিনিকেতনে ছাত্র পাঠানোর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারিদের নিকট সরকারের গোপন ইস্তাহার গিয়েছিল, আজ তার প্রতিষ্ঠাতা য়ুরোপের সুধীসমাজে মান পেয়েছেন বলেই সে স্থান ইংরেজ রাজপুরুষেরও চোখে পড়ল। না হলে ইংরেজ সরকারের মান থাকে না।

বিশিষ্ট অতিথিকে আমবাগানে সংবর্ধনা করা হল। সেই সময়ে শান্তিনিকেতনের মন্দির প্রভৃতির কিছু পরিবর্তন করা হয়— রবীন্দ্রনাথের সে কাজগুলি সকলে পছন্দ করেন নি। এখনো আমবাগানে কারমাইকেল বেদিটি আছে।

গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে আশ্রমে 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় হল। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউলের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

৮১

সবুজ পত্র চলছে— কবির ছোটোগল্প কবিতা প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত

হচ্ছে। কিন্তু তাঁর সকল রচনা তো সকলের পছন্দ হয় না; পাঠকদের মধ্যে শিক্ষা রুচি ও বোধশক্তির তারতম্য আছে। এক কালে সাহিত্য-সমালোচকরা বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি দুর্নীতিপ্ররোচক গানে ও কবিতায় পূর্ণ; তাঁরা এখন নীরব হয়েছেন। এখন নূতন সমালোচনা শুরু হয়েছে। তাঁরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন, কবির রচনা বাস্তবতাশূন্য। অর্থাৎ বাস্তবজীবনের সঙ্গে ধনীপুত্র রবীন্দ্রনাথের যোগ কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে নি, তাই তাঁর রচনায় সারবস্তু নেই—আছে শুধু রঙচঙ ও সুর। এই নিয়ে সাময়িক সাহিত্যে কী সমুদ্রমন্থনই না চলেছিল।

কিছুকাল থেকে লোকহিতের জন্য লোকসাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে বলে একটা ধুয়ো উঠেছে। এঁদের বক্তব্য—লোকসাহিত্য বাস্তবজগৎ-ঘেঁষা করে লেখা দরকার, অথচ রবীন্দ্রসাহিত্য তা করতে পারে নি। কিন্তু এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত অন্য রকমের। তিনি বললেন, লোকসাধারণের জন্য বিশেষ ভাবে যে লোকসাহিত্য ভদ্রলোকেরা লিখবেন তা সাহিত্যপদবাচ্য হবে না, বাস্তব-ঘেঁষাও হবে না। তার কারণ লোকসাহিত্য চিরদিন লোকেই সৃষ্টি করেছে, আত্মাভিমানের বশে বা করুণার তাগিদে এক শ্রেণীর উপভোগ্য সাহিত্য অন্য শ্রেণীর দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' লেখার পর 'আমার ধর্ম' ও 'কবির কৈফিয়ৎ' লিখেছিলেন; এবার লিখলেন 'বাস্তব' 'লোকহিত' ও 'আমার জগৎ'। বাস্তবতা বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা করলেন, আর তাঁর আদর্শ কী তাও বললেন।

এ বিষয় নিয়ে বিচার-বিতর্ক আজও চলছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনসন্ধ্যায় বলেছিলেন:

> কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
> কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
> যে আছে মাটির কাছাকাছি,
> সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
> সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
> নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
> সেটা সত্য হোক,

শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি-করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে শৌখিন মজদুরি।

৮২

বাংলা ১৩২২ সাল। সবুজ পত্রের দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হলে কবি 'ঘরে-বাইরে' নামে উপন্যাস শুরু করলেন। ছোটোগল্প লিখতে লিখতে চারটে গল্পকে মিলিয়ে লিখেছিলেন 'চতুরঙ্গ'। সমস্তই সমস্যামূলক, মনস্তাত্ত্বিক রচনা। 'ঘরে-বাইরে'ও বহু সমস্যায় আকীর্ণ উপন্যাস।

এই সময়ে ঘটনার দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'বিচিত্রা' ক্লাব-গঠন। গগনেন্দ্রনাথদের বিরাট পারিবারিক লাইব্রেরি উঠে এল 'বিচিত্রা-ভবনে'র এক তলায়। উপরের হলঘরে ক্লাবের মজলিশ, সভা, অভিনয় হত। দেখতে দেখতে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের বহু লোক এর সদস্য হলেন—তাঁদের আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের মজলিশ ও আধুনিক সাহিত্যের টাটকা বই—যা আর কোথাও সহজে পাওয়া যেত না।

এই সময়ের একটা ঘটনা উল্লেখ করে যাই, কারণ সেটাকে নিয়ে একদিন খুব আন্দোলন হয়েছিল। বিষয়টা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'সার্' উপাধি লাভ (৩ জুন ১৯১৫)। সে যুগে ইংরেজি নববর্ষে ও সম্রাটের জন্মদিনে ব্রিটিশ সরকার খেতাব বিলোতেন। সাধারণত ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারি ও এদেশীয় রাজভক্তদের মধ্যে হরেক-রকম সম্মানের খয়রাতি হত। তবে এ পর্যন্ত সাহিত্যের জন্য কাউকে 'সার্' উপাধি দেওয়া হয় নি; সে দিক থেকে কবির এই সম্মান পাওয়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল। চার বৎসর এটা ভোগ করেছিলেন—তার পর হয় তার বিসর্জন। সে কথা যথাস্থানে আসবে।

এ দিকে কবির মন শান্তিনিকেতনে বসছে না, যাযাবরের মন তাঁকে পেয়ে বসেছে। গত কয় মাসে কলিকাতা গয়া এলাহাবাদ আগ্রা সুরুল শিলাইদহের মধ্যে যাওয়া-আসা চলছে। কবিতা বা গান আসছে না; লিখছেন উপন্যাস ও প্রবন্ধ, পড়ছেন নানা বিষয়ের বিস্তর বই। আসলে

সমকালীন পরিবেশ থেকে কোথাও দূরে যাবার জন্য মন ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করছে। অজানাকে জানবার জন্য মনের এই ব্যাকুলতা। সেই-জন্যই কি পূজাবকাশে (১৯১৫) কাশ্মীর-ভ্রমণে গেলেন? কিন্তু সেখানেও দীর্ঘকাল থাকতে ভালো লাগে নি। দিন-পনেরো নৌকাগৃহে থাকলেন, কিন্তু মন প্রফুল্ল হল না। বিখ্যাত 'বলাকা' কবিতাটি এখানে লেখা; আর লিখলেন শেক্‌স্‌পীয়রের উদ্দেশে কবিতা—মহাকবির ত্রিশতবার্ষিক জয়ন্তী-উৎসব-সমিতির অনুরোধে।

কাশ্মীর থেকে ফিরে চলে গেলেন শিলাইদহে; সেখানে পল্লীসংস্কারের চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ করেছেন। কয়েক মাস পূর্বে 'হিতসাধনমণ্ডলী'র জন্য কাজের ফিরিস্তি নিয়ে যে-সব আলোচনা করেন এবং কর্ম সম্বন্ধে যে-ভাষণ দান করেছিলেন তার প্রয়োগ আরম্ভ হল নিজের জমিদারিতে। এবার এসেছেন অতুলচন্দ্র সেন প্রমুখ যুবকের দল। এই সময়ে গ্রামসংগঠন সম্বন্ধে কবি যে-সব পত্র লেখেন সেগুলি এখনো পড়লে গ্রামসেবকদের কাজে লাগবে।

এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-কমিশন আসছে, দেশের সর্বত্র শিক্ষা নিয়ে আলোচনা চলছে। কবির মনে নানা প্রশ্ন জাগছে দেশ সম্বন্ধে; তার মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষাসমস্যার কথাই বেশি। তাই লিখলেন 'শিক্ষার বাহন'; কলিকাতায় ফিরে রামমোহন লাইব্রেরির হলে প্রবন্ধটি পড়লেন (১০ ডিসেম্বর ১৯১৬)। কবির বক্তব্য—দেশীয় ভাষার আধারে যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ কথা তাঁর নূতন নয়—তবুও নূতন করে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বিষয়টাকে স্পষ্ট করে ধরলেন। বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ইংরেজি ও বাংলার দুটি ধারা সৃষ্টি করার সুপারিশ করে তিনি বললেন, সাদা কালো দুই স্রোতের গঙ্গা-যমুনা-ধারায় বিভাগ থাকলেও তারা এক সঙ্গেই বয়ে চলবে।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী যুগের একটি কথা মনে পড়ছে। মুসলিম লীগের শাসনকালে যখন আজিজুল হক সাহেব অখণ্ড বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী (১৯৩৬), সে সময়েও কবি এই প্রস্তাবটি পেশ করেন। কবির সুপারিশ কে কবে

গ্রহণ করেছে? অবশেষে বিশ্বভারতী নিজেই 'লোকশিক্ষাসংসদ' স্থাপন করে বাংলাভাষায় সর্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞান -বিতরণের আয়োজন করেন।

৮৩

বাঁকুড়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ; স্থির হল নিরন্নদের জন্য অন্নভিক্ষা -কল্পে 'ফাল্গুনী'র অভিনয় হবে। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-শিক্ষক ও ঠাকুর-বাড়ির ছেলেমেয়েরা মিলে অভিনয় করলেন জোড়াসাঁকোর দরদালানে। ইতিপূর্বে ছেলেরা এসেছে মাঘোৎসবের গানের দলের সঙ্গে— নাটক-অভিনয় এই প্রথম।

মূল 'ফাল্গুনী'র উপক্রমণিকা হিসাবে কবি একটা ছোটো নাট্যালাপের অবতারণা করেন; তাতে আছে কবিশেখর বলে এক তরুণ কবি। রবীন্দ্রনাথ এই অবতরণিকায় কবিশেখর ও মূল নাটকে অন্ধবাউল— এই দুই ভূমিকাই গ্রহণ করেন। প্রথমে যাঁকে দেখা গেল যৌবনের দৃপ্ত চঞ্চল হাস্যোচ্ছল মূর্তিতে, শেষকালে তাঁকেই দেখছি বৃদ্ধ অন্ধ আবিষ্ট বাউলের বেশে। মঞ্চোপযোগী সাজগোজ কবি নিজেই করেছিলেন নিজের তেতলার ঘরে। অবনীন্দ্রনাথ রঙে রসে নিষিক্ত তূলির পরশে সেই মূর্তিটিকে অমর করে রেখেছেন।

অভিনয়ের পর কবি শিলাইদহে গেলেন তাঁর গ্রামোদ্যোগ কেন্দ্রগুলি দেখতে; সেখানে কলেরা দেখা দিয়েছে বলে ইতিপূর্বে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও ডাক্তার পাঠিয়েছিলেন। কবির ইংরেজি জীবনীকার লিখছেন যে, 'ফাল্গুনী'- অভিনয়ের বিরূপ সমালোচনা কিছু কিছু বের হওয়াতে কবি নাকি মুষড়ে পড়েন এবং তাই তাঁর সঙ্গে বাঁকুড়ায় না গিয়ে কলিকাতা থেকে পালিয়ে গেলেন ('fled from Calcutta')। আমাদের মনে হয় ইংরেজ অধ্যাপক সমস্ত সমসাময়িক ঘটনা না জানাতেই বিষয়টাকে ঐভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

কলিকাতায় এই সময় একটা ঘটনা নিয়ে ছাত্রমহলে যেমন বিক্ষোভ তেমনি আতঙ্কেরও সৃষ্টি হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে কিছু না বলে থাকতে পারলেন না। কারণ, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের যোগ। ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি।—

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেন সাহেব ক্লাসে পড়াতে পড়াতে ভারতীয়দের সম্বন্ধে কিছু কটূক্তি করেন। সেগুলি ছাত্রদের ভালো লাগে নি; তারা প্রতিবাদ করে, তাতে কোনো ফল হয় নি। পরে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তারা তাঁকে প্রহার করে। এই গণ্ডগোলের নেতা ছিলেন কলেজের তৎকালীন ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু। ব্যাপারটি নিয়ে কলিকাতার শিক্ষা ও সরকার-মহলে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রশাসন' প্রবন্ধে এই বিষয়ের অতি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করে বললেন যে, ছাত্রেরা যদি প্রতিনিয়ত বিদেশী অধ্যাপকের কাছে তাদের দেশের, জাতির, ধর্মের অপমানকর কথা শোনে, ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করবেই; যদি না করে তবে সেটাই হবে লজ্জা আর দুঃখের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের দ্বারা গুরুকে প্রহার সমর্থন করেন নি, করতে পারেনও না; কিন্তু অপমানিত ও উপদ্রুত হয়ে ছাত্রেরা যে কাণ্ডটি করেছিল তাকে নিন্দা করেও এ কথা বলতে পারলেন না যে, কাজটা অস্বাভাবিক। জাতীয় অপমান সহ্য করবার জন্য তিনি কখনো বাঙালিকে উপদেশ করেন নি— তাতে মনুষ্যত্বেরই অপমান।

৮৪

রবীন্দ্রনাথের মন কিছুকাল থেকে দূরে কোথাও যাবার জন্যে উৎসুক, সে কথা পূর্বেই বলেছি। বহুকাল থেকে জাপান দেখবার ইচ্ছা। জাপানী পরিব্রাজক কাওয়াগুচি কয়েক বৎসর আগে তিব্বত ভ্রমণ করে যান; সে সময়ে কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর কাছ থেকে এক আমন্ত্রণপূর্ণ পত্র পাওয়া গেল। তার পর সুযোগ হল ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে অপ্রত্যাশিতভাবে—মার্কিনী মুলুকের এক বক্তৃতা-ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান (পন্ড লাইসিয়াম্) থেকে আহ্বান এল। কারবারের মালিক মেজর পন্ড্ জানালেন যে, কবি যদি তাঁদের ব্যবস্থামতে যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে পারেন তবে বারো হাজার ডলার তাঁকে নগদ দেওয়া হবে। তখনকার ডলার-বিনিময়ে প্রায় ছত্রিশ হাজার টাকা। দেশের বাইরে যাবার জন্য মন এতই উদ্গ্রীব যে পূর্বাপর সমস্তটা না ভেবেই

রাজি হয়ে তার-বার্তা পাঠালেন। শহরে শহরে ব্যাবসাদারের ব্যবস্থায় বক্তৃতা ফিরি করা যে কী ব্যাপার তা ঠিক জানতেন না।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে কলিকাতা থেকে জাপানী জাহাজে কবি রওনা হলেন। সঙ্গে চললেন এন্‌ড্রুজ, পিয়ার্সন্ আর মুকুল দে। মুকুল তখন বালক; তার শিল্পপ্রতিভা ও বালকসুলভ ব্যবহার কবিকে খুবই আকৃষ্ট করেছে, তাই সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন বিদেশে।

৭ই মে, কবির জন্মদিনে জাহাজ রেঙ্গুন পৌছল। সেই দিন প্রাতে কবি তাঁর 'বলাকা' কাব্য সহযাত্রী পিয়ার্সনকে উৎসর্গ করলেন। রেঙ্গুনে কবির যথোচিত সংবর্ধনা হল। তার পর পিনাঙ সিঙাপুর হঙকঙ বন্দরে জাহাজ থেমে থেমে চলেছে— সর্বত্র মাল বোঝাই হচ্ছে, মাল নামছে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখতে কবির যে এত আনন্দ হবে এ কথা তিনি পূর্বে মনে করতে পারেন নি। সাবলীল শক্তির কাজ কবির চোখে বড়ো সুন্দর লাগছে— শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখছেন।

কলিকাতা বন্দর ছাড়বার ছাব্বিশ দিন পর (২৯ মে) জাহাজ কোবে বন্দরে ভিড়ল। কবি উঠলেন গুজরাটি বণিক মোরারজির বাড়িতে— আরো অনেকেই কবিকে অতিথিরূপে পাবার জন্য উৎসুক ছিলেন। কোবে একেবারে বেনিয়া-বন্দর, কবির চোখে খুবই কুৎসিত ঠেকছে। সেখান থেকে ওসাকা এলেন। ওসাকা বাসকালে সেখানকার প্রেস-অ্যাসোসিয়েশনের পাল্লায় পড়ে কবিকে বক্তৃতা দিতে হল। জাপানে এই তাঁর প্রথম ভাষণ।

টোকিও মহানগরীতে উঠলেন শিল্পী তাইক্কানের বাড়িতে। তাইক্কান জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ইনি যৌবনে কলিকাতায় এসেছিলেন ভারতশিল্প বুঝবার জন্য।

এবার বক্তৃতা ও সংবর্ধনার পালা শুরু হল। প্রথমে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। তার পরদিন নগরীর বিখ্যাত উয়েনো পার্কে কবিসংবর্ধনা। জাপান-সরকারের বহু গণ্যমান্য লোক সভায় উপস্থিত থেকে ভারতীয় কবির প্রতি সম্মান দেখালেন।

মহানগরীতে বাস করলে তো আর জাপানকে দেখা যায় না। তাই

হারাসান নামে এক ধনীর আহ্বানে হাকানে তাঁর পল্লী-আবাসে গিয়ে উঠলেন। কবি লিখছেন, "রাজার মতো যত্ন পাচ্ছি। এমন সুন্দর জায়গা আর কোথাও পাব বলে মনে হয় না।"

জাপানে কবি যে কয়টা বক্তৃতা দেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে The Nation ও The Spirit of Japan। আমাদের আলোচ্য পর্বটা হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর। এই সময়ে জাপান চীনকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করছিল। চীন মাত্র চার-পাঁচ বৎসর হল বহু শতাব্দীর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রজাতন্ত্র শাসন স্থাপন করেছে— তখনো নানা অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। তার উপর জাপান দিল হানা। উদ্ধতভাবে এমন-সব শর্ত চীনের উপর চাপাতে চাইল যা মানতে গেলে চীনের সার্বভৌমত্ব থাকে না। কবি সব দেখছেন, শুনছেন— কোথায় শিল্পরসিক জাপানের আদর্শবাদ নেমেছে! তাঁর এক ভাষণে চীনের প্রতি জাপানের এই মারমুখো মনোভাবের নিন্দা করে বললেন যে, জাপানের পক্ষে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির অনুকরণে এই সাম্রাজ্যলোলুপতা আদৌ কল্যাণপ্রদ হবে না, হচ্ছে না। বলা বাহুল্য, জাপানের যুদ্ধকামী রাষ্ট্রচালকেরা পরাধীন ভারতের এক কবির কাছ থেকে এই অযাচিত উপদেশ শুনে বিরক্ত হলেন। জাপানী সরকারি মহল এমন কলকাঠি নাড়ল যাতে কবির পক্ষে সভাসমিতিতে বক্তৃতা করার সব সুযোগ বন্ধ হল।

শোনা যায় যেদিন জাপান ত্যাগ করলেন, সেদিন গৃহকর্তা ব্যতীত জাহাজ-ঘাটে তাঁকে বিদায় দেবার জন্য কেউ উপস্থিত হতে পারে নি। অথচ যেদিন তিনি প্রথম এসে কোবেতে নেমেছিলেন সেদিন সকলে রাজসম্মানে তাঁকে স্বাগত করেছিল। এটা হল জাতি-অভিমানের রূপ।

৮৫

জাপানে তিন মাস থেকে কবি, পিয়ার্সন ও মুকুলকে নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করলেন ; এনড্রুজ ইতিপূর্বেই ভারতে ফিরে গিয়েছিলেন।

জাহাজ সিয়াটলে পৌছল ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯১৬)। সেখান থেকেই বক্তৃতা-ব্যবসায়ের মালিক মিঃ পন্ড কবির ভার নিলেন। কোম্পানির

ব্যবস্থামত বক্তৃতাও শুরু হল। কবি ভারত থেকে জাহাজে আসবার সময় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং জাপানে বাসকালেও কতকগুলি লেখেন। এই-সব প্রবন্ধ সংকলন করে ছাপা হয় 'পার্সোনালিটি' ও 'ন্যাশনালিজ্‌ম্'।

প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে আট্‌লান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত শহরে শহরে বক্তৃতা দিয়ে চললেন। সিয়াটল, পোর্ট্‌ল্যান্‌ড্‌, সান-ফ্রান্‌সিস্‌কো, লসএঞ্জেলিস, সান-ডিএগো প্রভৃতি শহরগুলি প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। চলতে চলতে সল্‌ট্‌লেক সিটি হয়ে শিকাগো এলেন। শিকাগোতে পূর্বে এসেছিলেন; এতদিন যে দিকটা ঘুরলেন সেটাই ছিল কবির সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অঞ্চল।

দু মাস প্রায় প্রতিদিন একই বক্তৃতার পুনরুক্তি করতে করতে অবশেষে নিউইয়র্ক্‌ পৌঁছলেন; সেখান থেকে বস্টন, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ও আর কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করার পর কবির মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। অনেক টাকা লোকসান দিয়ে তিনি কন্‌ট্রাক্‌ট্‌ বাতিল করে দিলেন। ফেরবার পথে ক্লিভ্‌ল্যান্ড শহরে নামেন; সেখানকার বিখ্যাত শেকস্‌পীয়ার গার্ডেন্‌স্‌-এ নাগরিকদের অনুরোধে কবিকে বৃক্ষরোপণ করতে হয়। এই বোধ হয় কবিজীবনের প্রথম বৃক্ষরোপণ। তার পর কলোরেডোর পথে সান-ফ্রান্‌সিস্‌কো ফিরে এলেন। সেখানে জাপানগামী জাহাজ ধরে পিয়ার্সন ও মুকুলকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন জাপানে। পথে হাওয়াই দ্বীপের প্রধান নগর হনলুলুতে একদিন থেমেছিলেন। জাপানে ফেরবার পর পিয়ার্সন বললেন যে, তিনি কিছুকাল সেখানে থেকে যাবেন। পল রিশার নামে এক ফরাসী ভাবুকের সঙ্গে গভীর প্রীতি হয়েছিল; তাঁর 'টু দি নেশন্‌স্' -নামক গ্রন্থের ভূমিকা কবির কাছ থেকে পিয়ার্সন লিখিয়ে নিলেন। পল রিশার কয়েক বৎসর পরে শান্তিনিকেতনে এসে কিছুকাল ছিলেন ও ফরাসী শিখিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর ছাত্রদের।

কবি দেশে ফিরলেন ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে। দেশের বাহিরে ছিলেন প্রায় দশ মাস।

এই ঘোরাঘুরি ও বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মেশামিশির ফলে জগৎটাকে

নূতনভাবে দেখছেন ; সমসাময়িক পত্রে লিখছেন, "দেশের গণ্ডি আমার ঘুচে গেছে, সকল দেশকেই আমার হৃদয়-মধ্যে এক দেশ করে তুললে তবে আমি ছুটি পাব।"

কবির ১৯১২ সালের ও ১৯১৬ সালের সফরের মধ্যে গুণগত একটা পার্থক্য ছিল। প্রথমবার রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন তীর্থযাত্রীর মনোভাব নিয়ে। বিদেশের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন 'গীতাঞ্জলি'; তাতে প্রকাশ পেয়েছে কবির গভীর আধ্যাত্মিক আকূতি—য়ুরোপের সমস্যাপীড়িত ব্যস্তসমস্ত ব্যক্তিজীবনের উপজীব্য শান্তিরস। সেখান থেকে আনলেন তিনি অশান্তি, ঝঞ্ঝাবাত, প্রাচ্যজীবনে যার বিশেষ প্রয়োজন। সাহিত্যজীবনে সবুজ পত্রের আরম্ভ হল : লিখলেন নূতন ধরণের গল্প উপন্যাস কবিতা।

এবারও কবি জাপান ও আমেরিকার উদ্দেশে এক উদার বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। উগ্র জাতীয়তাবোধ পৃথিবীকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে সতর্কতাবাণী ঘোষণা করেছিলেন 'ন্যাশনালিজ্‌ম্' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধাবলিতে। 'ন্যাশনালিজ্‌মে'র যে একটা বড়ো দিক আছে, তা স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে কবি তাঁর বহু রচনায় সুন্দর রূপেই দেখিয়েছিলেন।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাই রবীন্দ্রসংবর্ধনায় বলেছিলেন, "সেবার 'গীতাঞ্জলি'তে তিনি ওধারকার ব্যক্তিগত জীবনের unrest বা অশান্তি-নিবারণার্থে এক শান্তিমন্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি গাহিলেন, ভগবানের সহিত আত্মার লীলাতেই সেই শান্তি। আর এবার ওধারকার সামাজিক জীবনের unrest বা অশান্তি-নিবারণার্থে ভারতবর্ষের চিরসাধিত শান্তি ও মৈত্রীর রহস্য উদ্‌ঘাটিত করলেন। সেবার ব্যক্তির নিত্যসহচর ভগবানকে দেখাইলেন আর এবার সমাজজীবনের নিত্যসহচর The Eternal Individual বা চিরন্তন ব্যক্তির মহিমা ঘোষণা করিলেন।"

৮৬

জাপান-আমেরিকা সফর সেরে কলিকাতায় ফিরে এসে দেখেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিচিত্রা' বেশ জমে উঠেছে ; শহরের বহু রবীন্দ্রভক্ত ক্লাবের সদস্য। বিচিত্রার সান্ধ্য বৈঠকে গল্পগুজব, সাহিত্য-আলোচনা, গানের জলসা,

অভিনয়াদি করে দিন একরকম কেটে যাচ্ছে। কিন্তু নানা সমস্যা সংসারে। জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা মৃত্যুশয্যায় ; জামাতা শরৎচন্দ্রের সহিত সম্পর্কে কবির সুখ নেই। রথীন্দ্রনাথ মোটরের ব্যবসায়ে নেমেছিলেন, তাতে শনি প্রবেশ করেছে, সে সংবাদ জাপান থেকে ফিরেই জানলেন। রথীন্দ্রনাথকে সেই কারবারের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করাতে বাধ্য করলেন।

এ দিকে জাতীয়তাবাদীগণ তাঁর উপর খড়্গহস্ত— কারণ, তিনি বিদেশে ন্যাশনালিজ্‌মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে-ন্যাশনালিজ্‌মের নিন্দা করেন তা মানবধর্মবিরোধী, হিংস্র ও শোষণলোলুপ। কবি কোন্ আদর্শ থেকে কথাগুলি বিদেশে বলেছিলেন তা বিরুদ্ধবাদীরা সকলে হয়তো বুঝতেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্য বা অলীক কারণে ব্যক্তিগত অসন্তোষও ছিল। সাহিত্যের-স্বাস্থ্য-ধ্বজীদেরও কবির উপর কম আক্রোশ নয়। এই অবস্থায় কবির স্তাবকদলও তাঁর মনকে উৎক্ষিপ্ত করার জন্য কম দায়ী ছিলেন না। তাঁরা কবির কাছে আসর জমাবার লোভে প্রতিপক্ষীয়দের কথাবার্তা মতামত অতিরঞ্জিত করে কবিকে শোনাতেন। এই-সব আলাপ-আলোচনা শুনে কবির মন প্রথমে উত্তেজিত ও পরে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবসাদের অন্যতম কারণ বার্ধক্যজনিত 'ভয়ানক একটা সঙ্গহীনতা'ও বটে। লিখছেন— "মনটা ভারি একলা হয়ে পড়েছে। শুধু কেবল লেখাতে এখন ফাঁক ভরবে ব'লে মনে হয় না। বিদ্যালয় আমার সঙ্গী।"

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হলে কলিকাতায় গেলেন (১৩২৪)। মহাসমারোহে বিচিত্রাভবনে জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হল।

দেশে ফিরে আসার পর থেকে কবিকে সবুজপত্রে লেখার জন্য প্রমথ চৌধুরী তাগিদ দিচ্ছেন। ফলে 'পয়লা নম্বর' (সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩২৪) গল্পটি লিখলেন। চলিত ভাষায় এইটি হল প্রথম গল্প।

দেশের মধ্যে রাজনীতি ঘোরালো হয়ে উঠেছে ; এখানে সেখানে সন্ত্রাসবাদীদের বোমা ও গুলির শব্দ প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। মহাযুদ্ধ চলছে। ব্রিটিশ সরকার ভারতরক্ষা-আইন জারী করে প্রায় বারো শো বাঙালি যুবককে জেলে, দুর্গম স্থানে অথবা দুর্গে আটক করেছে। হোমরুল্ লীগের স্থাপয়িত্রী অ্যানি বেসাণ্ট্ স্বরাজ-লাভের আন্দোলন আরম্ভ করাতে,

মাদ্রাজ সরকার তাঁকে নজরবন্দী করলেন ১৯১৭ সনের ১৬ই জুন তারিখে।

এই-সব ঘটনায় কবির মন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তিনি গবর্মেণ্টের দমননীতির প্রতিবাদ ও বেসাণ্টের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশ করলেন। কলিকাতার লোকে অন্তরায়ণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চায়; টাউন-হলের কর্তৃপক্ষ তাঁদের হল দিলেন না সভার জন্য। প্রথমে রামমোহন-হলে ও পরে হ্যারিসন রোডের মোড়ে আল্‌ফ্রেড-রঙ্গমঞ্চে কবি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়লেন। সদ্যোলিখিত "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী" গানটি সভায় গাওয়া হল। সে কী উৎসাহ-উত্তেজনার দিন! এই প্রবন্ধে স্বদেশীযুগের তেজোদীপ্ত রবীন্দ্রনাথকে আর-একবার দেখা গেল।

রবীন্দ্রনাথ সমস্যা মাত্রকেই সমগ্রভাবে দেখতে অভ্যস্ত; তাই এই প্রবন্ধে ইংরেজের অবিচার সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেও এই প্রশ্নটি তুললেন, কেন এত বড়ো একটা দেশে মুষ্টিমেয় বিদেশীর শাসন সম্ভবপর হয়! তিনি বললেন যে, আমাদের সম্মুখে চলার প্রবলতম বাধা আমাদেরই পশ্চাতে; আমাদের অতীত তার সম্মোহন পাশ দিয়ে আমাদের বর্তমানকে ব্যর্থ এবং ভবিষ্যৎকে দুষ্প্রাপ্য করে রেখেছে। কবির মতে, যে 'আত্মকর্তৃত্ব' মানুষের বুদ্ধিকে বোধকে মুক্তি দেয় না তার সুফল কখনো জাতির প্রতিটি ব্যক্তি ভোগ করতে পারে না; সে সুবিধা শুধু মুষ্টিমেয় লোকের জন্য। কবি বলেন, সে 'স্বায়ত্তশাসন' তাঁর কাম্য নয়। আমাদের রাজনীতি চলছে ইংরেজ কর্তার ইচ্ছায়; আমাদের সমাজনীতি চলছে পুরাতন দেশাচারে, লোকাচারে বা শাস্ত্রকর্তাদের ইচ্ছায়। দুটোকেই সমূলে উৎপাটিত করতে হলে চাই মানুষের মনের মুক্তি, এইটি ছিল কবির আসল বক্তব্য। এই প্রবন্ধেরও তীব্র সমালোচনা হল কবির সামাজিক মতকে লক্ষ্য করে। রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা যে স্বাধীনতা দাবি করি সমাজনীতিক্ষেত্রে তার প্রয়োগ দেখতে প্রস্তুত নই—আজ পর্যন্ত আমাদের জাতি-জীবনে সংকট ও ও সমস্যা বেধে আসছে এইখানেই।

৮৭

এ দিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে মেঘ জড়ো হচ্ছে। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির উগ্রপন্থী সদস্যেরা চাইলেন বন্দিনী অ্যানি বেসাণ্ট্‌কে কলিকাতার আগামী কংগ্রেস-অধিবেশনে সভানেত্রী করতে। অধিকাংশ সদস্য সে প্রস্তাব গ্রহণ না করায়, এঁরা পৃথক্ অভ্যর্থনা সমিতি খাড়া করে রবীন্দ্রনাথকে তার সভাপতি করলেন। কয়দিন দেশময়, বিশেষ করে কলিকাতায় ভীষণ উত্তেজনা গেল। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও নানা শ্রেণীর লোক আসছে যাচ্ছে। অবশেষে নিখিলভারত-কংগ্রেস-কমিটি অ্যানি বেসাণ্ট্‌কে সভানেত্রী করতে রাজি হলে কবি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিপদ ত্যাগ করলেন। ধীরপন্থী দলের সভাপতি রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন-ই যথাবিধি কাজ চালালেন। বেসাণ্ট্ মুক্তি পেয়ে কলিকাতায় এলেন (৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৭); কবির সঙ্গে একদিন দেখা করে গেলেন।

রাজনীতির ঝড়-ঝাপটা কবিচিত্তকে কতক্ষণ আঁধিতে আচ্ছন্ন রাখতে পারে? কংগ্রেসী গণ্ডগোল চুকিয়ে দিয়ে জীবনশিল্পী কবির মন তদ্‌দণ্ডেই ডুবেছে 'ডাকঘর' অভিনয়ের মধ্যে। বিচিত্রার উপর-তলার ঘরে দুদিন 'ডাকঘর' অভিনয় হল। একদিন হল বিচিত্রার সদস্যদের জন্য, আর-এক দিন বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। সেদিন অ্যানি বেসাণ্ট, বালগঙ্গাধর তিলক, মদনমোহন মালব্য, গান্ধীজি প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেদিন অভিনয়ের নূতন রীতি এবং মঞ্চসজ্জার উন্নত মান লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

১৯১৭ সালের শেষ দিকের দুই-একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে এক কমিশন বসেছিল; সভাপতি ছিলেন ইংলন্ডের লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্‌সেলর, স্যর মাইকেল স্যাডলার। তিনি শান্তিনিকেতনে ঘুরে গেলেন। স্যাডলার সাহেব শিক্ষা সম্বন্ধে কবির মত জানতে চাইলে তিনি কমিশনের কাছে তাঁর মতামত লিখে পাঠালেন; তাতে তিনি বললেন, **ইংরেজি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে খুব ভালো করে শেখাতে হবে। কিন্তু স্কুল কলেজ**

য়ুনিভার্সিটিতে পর্যন্ত মাতৃভাষার আধারে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানো দরকার। এ কথা রবীন্দ্রনাথ বহুকাল থেকেই বলে আসছেন।

আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে তৎকালীন ভারতসচিব স্যামুয়েল মণ্টেগু সাহেব হঠাৎ ভারতে এলেন। আগস্ট মাসে তিনি পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতকে দায়িত্বপূর্ণ স্বরাজ ধাপে ধাপে দেওয়া হবে। সেই ঘোষণা-অনুসারে দেখতে এলেন দেশের অবস্থা, শুনতে এলেন লোকের মতামত। তিনি সকল দলের সব কথা শুনলেন; নিজে কথাটি বললেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মণ্টেগুর সাক্ষাৎ হয় বিচিত্রাভবনে। শোনা যায় কবি মণ্টেগু সাহেবকে দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখেছিলেন।

যথাসময়ে বাংলায় কংগ্রেসের অধিবেশন হল; কবি প্রথম দিন India's Prayer কবিতাটি পাঠ করলেন।

এইটি নৈবেদ্যর অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতা—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির।

খ্যাতি লাভ করার পর রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম ও এই শেষ কংগ্রেস-মণ্ডপে উপস্থিতি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৮৮৬) কলিকাতায় আহূত প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরচিত গান 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গেয়েছিলেন, আর ১৮৯০-এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-এ সুর-সংযোগ করে কলিকাতার দ্বিতীয় কংগ্রেসে গান করেছিলেন।

৮৮

নূতন বৎসরের গোড়ায় (১৯১৮) কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। এখানে তিনি ইস্কুল-মাস্টার। ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, খাতা দেখছেন, তাদের জন্য পাঠ প্রস্তুত করছেন। দু-একটা গল্প লিখছেন।

বৈশাখ মাসে (১৩২৫) কলিকাতায় এলেন; জন্মোৎসব হল খুব জাঁকিয়ে। কয়েকদিন পরে খবর পেলেন চীনের পিকিঙ নগরীতে ইংরেজ পুলিস পিয়ার্সনকে বন্দী করে ইংলন্ডে চালান করে নজরবন্দী করেছে। এই খবর পেয়ে এন্‌ড্রুজ সেই রাত্রে দিল্লি চলে গেলেন ব্যাপার কী

জানতে। সাত দিন পরে ফিরে এসে বললেন, বড়োলাট চেমস্‌ফোর্ড্ পিয়ার্সনের উপর খুবই বিরক্ত; ব্রিটিশ শাসনের নিন্দা করে তিনি এক পুস্তিকা ছাপিয়েছেন বিদেশে, গবর্মেণ্ট সেটা বাজেয়াপ্ত করেছেন। সুতরাং কিছু করবার উপায় নেই।

আরো বড়ো আঘাত এল (১৬ই মে) জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যুতে। বেলা দীর্ঘকাল ভুগছিলেন; কবি এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। শেষ দিন কন্যার গৃহে গিয়ে শুনলেন তার মৃত্যু হয়েছে। উপরে উঠলেন না, যে গাড়িতে এসেছিলেন সেই গাড়িতেই ফিরে এলেন। সেদিন সন্ধ্যায় বিচিত্রা ক্লাবে তাঁকে দেখেছিলাম— যথারীতি সামাজিকতা করছেন, খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা চলছিল। বুঝলাম কবিজীবনে 'গীতাঞ্জলির' উৎস কোন্ গভীরে নিহিত।

কিছুকাল থেকে কবি লিখছেন নূতন গল্পকবিতা, যা পরে 'পলাতকা' গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। তাঁর বড়ো আদরের কন্যা বেলা আজ ইহলোক-পলাতকা, তাই কি লিখলেন :

এই কথা সদা শুনি—
'গেছে চলে' 'গেছে চলে'।
তবু রাখি ব'লে
বোলো না 'সে নাই'।
সে কথাটা মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে—
মর্মে গিয়ে বাজে।

কলিকাতায় আর ভালো লাগছে না বিচিত্রাভবনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সত্ত্বেও। দারুণ গ্রীষ্মে শান্তিনিকেতনে ফিরলেন; একা আছেন দেহলিতে, দিনযাপনের একমাত্র সহায় ভৃত্য সাধুচরণ।

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুললে, আবার সমস্ত মনটা ঢেলে দিলেন ছাত্র-পড়ানোতে। আর, 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' লিখছেন ছোটো রানুকে। এই ছোট্ট মেয়েটি ঘন ঘন পত্র লিখে ও 'ভানুদাদা'র কাছ থেকে উত্তর আদায় ক'রে বেলার অভাবটা কিয়ৎ পরিমাণে দূর

করেছিল। এই কন্যাটি এখন আমাদের সমাজে সুপরিচিতা— লেডি রাহু মুখার্জি।

৮৯

শান্তিনিকেতনে এবার অনেকগুলি গুজরাটি ছাত্র এসেছে। এর পূর্বেও নেপালি মারাঠি রাজস্থানি মালয়ালি ছাত্র এসেছিল; কিন্তু অন্য একটি-কোনো প্রদেশের একই ভাষার এতগুলি ছাত্র ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। নূতন ছাত্রদের দেখে ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে কবির মনে নূতন চিন্তার উদয় হয়েছে— শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্র করতে হবে। দুই বৎসর পূর্বে আমেরিকা থেকে লিখেছিলেন (১৯১৬)— "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে। ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব-চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে— ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।"

৭ই পৌষ উৎসবের পরদিন (৮ পৌষ ১৩২৫) মহাসমারোহে বিশ্বভারতীর ভিত্তি-পত্তন হল; এজন্য গুজরাটিদের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা পাওয়া যায়। যে জায়গাটায় মাঙ্গলিকাদি পুঁতে বিশ্বভারতীর বাড়ি করবার কথা, শেষ পর্যন্ত বাড়ি সেখানে উঠল না— শিশুদের থাকবার জন্য লম্বা একটা ঘর উঠল। ভিত্তিপ্রস্তরের তলে সোনা-রুপোয়-মন্ত্র-লেখা ফলক এখনো মাটিতে পোঁতা আছে।

বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে কবি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কলিকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আনলেন। আঠারো বৎসর পূর্বে বালক রথীন্দ্রনাথের শিক্ষাদির জন্য শান্তিনিকেতনে এসে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আজ তাঁর নবকল্পিত বিদ্যায়তন বিশ্বভারতীতে সহায়তা করবার জন্য রথীন্দ্রনাথকে সেখানে আনলেন।

৯০

গত বৎসর (ডিসেম্বর ১৯১৭) কলিকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন হয়ে গেলে অ্যানি বেসাণ্ট্ মাদ্রাজে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে এক নূতন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করে রবীন্দ্রনাথকে করলেন তার চান্সেলর। এই নবগঠিত বিদ্যায়তন-পরিকল্পনার মধ্যে ছিল ইন্জিনীয়ারিং, কমার্স, কৃষি প্রভৃতি ব্যবহারিক বিদ্যাচর্চার বিশেষ ব্যবস্থা।

কবি দক্ষিণভারতের জাতীয় বিদ্যালয়ের চান্সেলর হয়েছেন; সেখানে তো একবার যাওয়া দরকার। সুযোগ মিলল; আহ্বান এল মহীশূর থেকে। সরকারি আহ্বান নয়; আহ্বান বঙ্গলুর নাট্যনিকেতনের। জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী তখন মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান; তাঁরই উদ্যোগে এটা হয়েছিল। ১৯১৯ জানুয়ারি মাসে কবি তরুণ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণভারত-সফরে চললেন।

মহীশূর ও বঙ্গলুরের নানা প্রতিষ্ঠানে কবি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্পর্কে বহু বক্তৃতা করলেন। উটির পাহাড়ে কয়দিন বিশ্রাম করে কবি এবার বক্তৃতার ঘূর্ণিঝড়ে পাল তুলে বেরিয়ে পড়লেন। পালঘাট, সালেম, তিরচিনপল্লী, শ্রীরঙ্গপট্টন, কুম্ভকোণম, তাঞ্জোর, মাদুরাইয়ে বক্তৃতার পর বক্তৃতা করতে করতে অবশেষে মদনপল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন। মদনপল্লী থিওজফিস্ট্দের জায়গা। এখান থেকে মাদ্রাজ যাবেন ভেবেছিলেন; কিন্তু তখন সেখানে রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাব বড়োই তীব্র। মাদ্রাজে তখন ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য; রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁদের ক্রোধের কারণ যে, কবি বিঠলভাই পাটেলের অসবর্ণবিবাহ বিল্ বা প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। সেই অপরাধে ব্রাহ্মণশাসিত মাদ্রাজ কবির প্রতি অপ্রসন্ন। আজ সেখানে দ্রাবিড় কাজেগম দলের লোক উন্মত্তভাবে সেদিনের পাল্টা জবাব দিচ্ছে। একেই বলে কালান্তর। কয়েক দিন পরে তিনি মাদ্রাজ হয়ে আডিয়ারে গেলেন। সেখানে বেসাণ্টের নবপরিকল্পিত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চান্সেলর রূপে কবি শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনটি

য়ুনিভার্সিটিতে পর্যন্ত মাতৃভাষার আধারে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানো দরকার। এ কথা রবীন্দ্রনাথ বহুকাল থেকেই বলে আসছেন।

আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে তৎকালীন ভারতসচিব স্যামুয়েল মণ্টেগু সাহেব হঠাৎ ভারতে এলেন। আগস্ট মাসে তিনি পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতকে দায়িত্বপূর্ণ স্বরাজ ধাপে ধাপে দেওয়া হবে। সেই ঘোষণা-অনুসারে দেখতে এলেন দেশের অবস্থা, শুনতে এলেন লোকের মতামত। তিনি সকল দলের সব কথা শুনলেন; নিজে কথাটি বললেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মণ্টেগুর সাক্ষাৎ হয় বিচিত্রাভবনে। শোনা যায় কবি মণ্টেগু সাহেবকে দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখেছিলেন।

যথাসময়ে বাংলায় কংগ্রেসের অধিবেশন হল; কবি প্রথম দিন India's Prayer কবিতাটি পাঠ করলেন।

এইটি নৈবেদ্যর অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতা—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির।

খ্যাতি লাভ করার পর রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম ও এই শেষ কংগ্রেস-মণ্ডপে উপস্থিতি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৮৮৬) কলিকাতায় আহূত প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরচিত গান 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গেয়েছিলেন, আর ১৮৯০-এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-এ সুর-সংযোগ করে কলিকাতার দ্বিতীয় কংগ্রেসে গান করেছিলেন।

৮৮

নূতন বৎসরের গোড়ায় (১৯১৮) কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। এখানে তিনি ইস্কুল-মাস্টার। ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, খাতা দেখছেন, তাদের জন্য পাঠ প্রস্তুত করছেন। দু-একটা গল্প লিখছেন।

বৈশাখ মাসে (১৩২৫) কলিকাতায় এলেন; জন্মোৎসব হল খুব জাঁকিয়ে। কয়েকদিন পরে খবর পেলেন চীনের পিকিঙ নগরীতে ইংরেজ পুলিস পিয়ার্সনকে বন্দী করে ইংলন্ডে চালান করে নজরবন্দী করেছে। এই খবর পেয়ে এন্ড্রুজ সেই রাত্রে দিল্লি চলে গেলেন ব্যাপার কী

জানিতে। সাত দিন পরে ফিরে এসে বললেন, বড়োলাট চেমস্‌ফোর্ড্‌ পিয়ার্সনের উপর খুবই বিরক্ত; ব্রিটিশ শাসনের নিন্দা করে তিনি এক পুস্তিকা ছাপিয়েছেন বিদেশে, গবর্মেণ্ট সেটা বাজেয়াপ্ত করেছেন। সুতরাং কিছু করবার উপায় নেই।

আরো বড়ো আঘাত এল (১৬ই মে) জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যুতে। বেলা দীর্ঘকাল ভুগছিলেন; কবি এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। শেষ দিন কন্যার গৃহে গিয়ে শুনলেন তার মৃত্যু হয়েছে। উপরে উঠলেন না, যে গাড়িতে এসেছিলেন সেই গাড়িতেই ফিরে এলেন। সেদিন সন্ধ্যায় বিচিত্রা ক্লাবে তাঁকে দেখেছিলাম— যথারীতি সামাজিকতা করছেন, খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা চলছিল। বুঝলাম কবিজীবনে 'গীতাঞ্জলির' উৎস কোন্ গভীরে নিহিত।

কিছুকাল থেকে কবি লিখছেন নূতন গল্পকবিতা, যা পরে 'পলাতকা' গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। তাঁর বড়ো আদরের কন্যা বেলা আজ ইহলোক-পলাতকা, তাই কি লিখলেন :

এই কথা সদা শুনি—
    'গেছে চলে' 'গেছে চলে'।
তবু রাখি ব'লে
বোলো না 'সে নাই'।
সে কথাটা মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে—
মর্মে গিয়ে বাজে।

কলিকাতায় আর ভালো লাগছে না বিচিত্রাভবনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সত্ত্বেও। দারুণ গ্রীষ্মে শান্তিনিকেতনে ফিরলেন; একা আছেন দেহলিতে, দিনযাপনের একমাত্র সহায় ভৃত্য সাধুচরণ।

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুললে, আবার সমস্ত মনটা ঢেলে দিলেন ছাত্র-পড়ানোতে। আর, 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' লিখছেন ছোটো রানুকে। এই ছোট্ট মেয়েটি ঘন ঘন পত্র লিখে ও 'ভানুদাদা'র কাছ থেকে উত্তর আদায় ক'রে বেলার অভাবটা কিয়ৎ পরিমাণে দূর

ভাষণ দিলেন (১০-১২ মার্চ ১৯১৯)। এই-সব ভাষণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *The Centre of Indian Culture* প্রবন্ধটি। এটি 'তপোবন' প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা হলেও বিশ্বভারতীর কল্পনার আভাস দিলেন এই ভাষণে।

দক্ষিণভারত সফর করে কবি কলিকাতায় ফিরেছেন। এম্পায়ার থিয়েটার গৃহে তিনি সর্বপ্রথম 'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনা বাংলাদেশে পেশ করলেন। প্রবন্ধটি ইংরেজিতে ছিল। সভার ব্যবস্থার একটা নূতনত্ব ছিল; সেটি হচ্ছে সভায় প্রবেশের জন্য মূল্যগ্রহণ। এটি আমেরিকা থেকে শেখা; দক্ষিণভারতে তার প্রয়োগ করা হয়েছিল। বসুবিজ্ঞানমন্দিরেও একদিন বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, সেখানে ছিল মুক্তদ্বার।

বিশ্বভারতীর ভাবনা আকস্মিক নয়; শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন কালেই তাহা যুক্ত ছিল। ১৯০৪ সালে লেখেন, "যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে যাহা রাজ্য ও সমাজের সকল প্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। এখানে আমরা খণ্ড কালের অতীত।…

"যদি বৈদিক কালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি… উচ্চ আদর্শ মাত্রই 'মিলেনিয়ামের' দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে?" (সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা'র ভূমিকা শ্রাবণ ১৩১১, আগষ্ট ১৯০৪)।

বিশ্বভারতীর আদর্শ এখন কবির কাছে আর-একটু বাস্তব-ঘেঁষা হচ্ছে। তিনি লিখলেন, "ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত-সম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে।"

আর বললেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ, সেই বিদ্যাকে দান করা।"

এই কথাই লেখেন আমেরিকা থেকে ১৯১২ সালে—"আমার ইচ্ছা ওখানে এক-একটা ল্যাবরেটরি নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন, তা হলে ক্রমশ আপনিই **বিশ্ববিদ্যালয়ের** সৃষ্টি হইবে।"

চার বৎসর পরেও লেখেন, "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে। ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে··· ।"

৯১

দক্ষিণভারতে ও কলিকাতায় বক্তৃতার পালা শেষ করে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন দারুণ গ্রীষ্মে। রইলেন দেহলি বাড়িতে।

১৩২৬ সালের বৈশাখ মাস থেকে কবি 'শান্তিনিকেতন' নামে একটি চার পাতার পত্রিকা সম্পাদন করিয়ে প্রকাশ করলেন। আমেরিকার 'লিন্‌কল্‌ন্‌' শহর থেকে একটা মুদ্রাযন্ত্র উপহার এসেছিল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নামে; সেইটাকে কেন্দ্র করে ছোটোখাটো একটা ছাপাখানার পত্তন হয়েছে (১৯১৭)। এই পত্রিকা সেখানেই ছাপা হল। বলা বাহুল্য এই চার পৃষ্ঠা কাগজের বারো আনাই কবির বিচিত্র রচনাসম্ভারে পূর্ণ।

শান্তিনিকেতনে বেশ মন দিয়ে কাজ করছেন, হঠাৎ মনের উপর দিয়ে কালবৈশাখী ঝড় বয়ে গেল— তার পটভূমে রয়েছে এ দেশের পরাধীনতার গ্লানি আর অসহায় বেদনা। সে ঘটনা সংক্ষেপে বলা দরকার।

পাঠকের মনে আছে, ১৯১৭ সালের শেষ দিকে ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব ভারতে এসেছিলেন। পরে অনেক শলা-পরামর্শের ফলে ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে ছাপা হয়ে বেরোল ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া। এই পরিকল্পনা-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হল সিডিশন কমিটির প্রতিবেদন বা রাওলাট্ কমিটির রিপোর্ট্। এটাতে ছিল গত কয় বৎসর দেশের মধ্যে যে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন চলছে তার বিস্তারিত ইতিহাস এবং সেই প্রচেষ্টা দমন করতে হলে কী করণীয় তারই ফলাও সুপারিশ বা পরামর্শ। এটা ঠিক এই সময়েই প্রকাশ করার বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ইংরেজ জগৎকে দেখাতে চায় যে, যারা ভারত থেকে ব্রিটিশদের তাড়াবার জন্য এমন মারাত্মক ষড়যন্ত্রে ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত তাদের খুব বেশি স্বাধীনতা দেওয়া যায় না; ধীরে-সুস্থে ধাপে ধাপে শাসনের দায়িত্ব দেওয়ার যে প্রস্তাব পেশ হয়েছে, তাতে ইংরেজের অশেষ উদারতাই প্রকাশ পাচ্ছে।

সিডিশন কমিটির প্রতিবেদনে রাজদ্রোহদমন সম্বন্ধে যে-সব সুপারিশ ছিল তারই উপর সরকারি বিল এল; গান্ধীজি এবার রাজনীতিতে ভালো ভাবেই নামলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, এই আইন ভারতবাসীর ন্যায়সংগত অধিকার ও মনুষ্যোচিত স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাধীনতার বিরুদ্ধ, অতএব এ আইন মানা হবে না এবং এর জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করতে হবে— অর্থাৎ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমরা মার খাব, কিন্তু মারব না। ('প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর আদর্শ।) ইতিপূর্বে আফ্রিকায় গান্ধীজি এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন।

অহিংসক রাজনীতি যে কী, হরতাল কী ভাবে সফল হতে পারে, তখন এ-সব অশ্রুতপূর্ব রণনীতি অধিকাংশের বুদ্ধির অগম্য। ফলে গান্ধীজির আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনিয়ন্ত্রিত অশিক্ষিত জনতা মাত্রা রক্ষা করতে না পেরে উপদ্রব শুরু করলে। জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা কঠোর হস্তে পঞ্জাবের ইংরেজ শাসকেরা বন্ধ করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে সব দেখছিলেন। তিনি ১৬ই এপ্রিল গান্ধীজিকে এক খোলা-চিঠিতে জানালেন, লোকের মনকে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত না ক'রে, এ ভাবে অহিংস প্রতিরোধের আন্দোলন চলতে পারবে না— পদে পদে অনর্থের ও সমস্যার সৃষ্টি হবে। ইতিমধ্যে অমৃতসরের জালিনবালাবাগে, নববর্ষের দিন (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) মেলার জনতার উপর সরকারি সৈন্য অতর্কিত গুলি চালিয়ে হত্যা করল ৩৭৯ জনকে— আহতের সংখ্যা অনেক বেশি। এতবড়ো নিদারুণ ঘটনা ঘটে গেল অথচ পঞ্জাবের বাইরে কোনো খবরের কাগজে কোনো খবর ছাপা হল না। কড়া সামরিক আইন জারি হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।

প্রায় দেড়মাস কেটে গেল। লৌহকবাট ভেদ ক'রে জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের খবর দেশে রাষ্ট্র হয়ে গেল। কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, টুঁ শব্দ করতে সাহস পাচ্ছে না।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পেয়ে পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছেন। শান্তিনিকেতন থেকে রানুকে লিখছেন (২২ মে), "আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম সইতে পারি, কিন্তু মর্তের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পঞ্জাবে

আছ, পঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপে আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিল।" স্থির করলেন প্রতিবাদ করতেই হবে— চলে এলেন কলিকাতায়। কয়েকজন খ্যাতনামা দেশনেতার সঙ্গে দেখা করে সভা ডাকতে বললেন। রাজি হলেন না কেউ। কবি গেলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে; কী পরামর্শ হয়েছিল কেউ জানে না। তার পর ২৯ মে রাত্রিতে লিখলেন তাঁর চিঠি ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ডকে উদ্দেশ করে। বাড়ির আত্মীয়স্বজন কাউকে কবি পত্রের কথা জানালেন না— একমাত্র জানতেন এন্‌ড্রুজ। জুন মাসের দুই তারিখে সকালের সংবাদপত্র খুলে লোকে পড়ে যে রবীন্দ্রনাথ জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর 'সার্‌' উপাধি প্রত্যর্পণ করেছেন।

দেশের লোকে অভিনন্দন জানালো, ইংরেজি-কাগজ-ওয়ালারা টিট্‌কিরি দিল, বিদেশে খবরটা রাষ্ট্র হওয়ায় শাসকসম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হল।

উপাধিত্যাগের এই পত্র-লেখার পর রবীন্দ্রনাথ বালিকা রাণু অধিকারীকে লিখছেন, "তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখো, আমি ভাবলুম; ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়; তাই কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেছি— আমার ঐ ছার্‌ (Sir) পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। ...আমি বলেছি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে— তাই ঐ ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছি নে।"

ঠিক চার বৎসর পূর্বে ভারত সম্রাটের জন্মদিনে কবি 'সার্‌' উপাধি পেয়েছিলেন। সইলো না সে সম্মানের ভার!

৯২

বৈশাখী ঝড় বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে, কবির মনের উপর দিয়েও। তার পর শান্তিনিকেতনে বর্ষা নেমেছে, কবির মনেও। নানা ক্ষেত্রে নানা কর্তব্যেই তাঁকে মন দিতে হচ্ছে।

গ্রীষ্মাবকাশের পর (আষাঢ় ১৩২৬) শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী'র অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজ শুরু হল (৩ জুলাই ১৯১৯)। কবি সাহিত্যের

ক্লাস নিচ্ছেন আর এনড্রুজ, বিধুশেখর, সিংহলী মহাস্থবির, কপিলেশ্বর মিশ্র, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি যে যার মতো পড়াচ্ছেন। ছাত্র বাইরের নয়— শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও আশ্রমবাসী বা বাসিনীরাই ছাত্র।

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে নূতন পরীক্ষা চলছে। রবীন্দ্রনাথ তখন লিখছেন কথিকা বা ছোটো ছোটো গল্প, রূপকথা; আর নিত্য-উপাসনার মতো করে নিত্যই নূতন গান। উক্ত কথিকাগুলি পরে 'লিপিকা' পুস্তকে সংকলিত হয়। এই রচনাধারাতেই গদ্যছন্দ কবিতার প্রথম অনতিস্ফুট কলালাপ শোনা গিয়েছে। (লিপিকার কয়েকটি রচনা অতি পুরাতন লেখা ভেঙে রচিত।) এই গেল রবীন্দ্রনাথের একটি রূপ, যেখানে তিনি সাহিত্যস্রষ্টা।

নোবেল পুরস্কার-লাভ ও বিদেশের সঙ্গে নানাভাবে যোগস্থাপন হওয়ার পর থেকে শান্তিনিকেতনে যেমন দেশী-বিদেশী অতিথির সংখ্যা বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি-লেখালেখি। সমস্ত পত্রের উত্তর তিনি নিজেই দেন; কোনো সহকারী নেই। কবি অতি দুঃখে এক পত্রে লিখছেন, "এক-একবার ক্লান্ত হয়ে ভাবি একটা সেক্রেটারি রাখা যাক। কিন্তু সে আমিরিটুকুও হিসাবে কুলোয় না দেখতে পাই। কেননা রথীর সংসারেরও দেখি অনটন, আমার ইস্কুলেও দেখি তাই, অতএব ডাইনে বাঁয়ে হিসাবের নিষ্ঠুর খাতার দিক থেকে দৃষ্টি বাঁচিয়ে চক্ষু বুজে মনের শান্তি রাখতে চেষ্টা করি।"

৯৩

পূজাবকাশে (১৯১৯) কবি সপরিবারে শিলঙ পাহাড়ে চললেন। বোলপুর থেকে কলিকাতায় যাবার পথে নৌকায় গঙ্গা পার হবার সময় কিভাবে ঝোলা-কাপড়-চোপড়-সুদ্ধ জলে পড়ে কর্দমাক্ত হয়েছিলেন, তার রসাল বর্ণনা আছে ভানুসিংহের পত্রে।

শিলঙে কবি তিন সপ্তাহ (অক্টোবর ১৯১৯) ছিলেন; উল্লেখযোগ্য ঘটনাও নেই, রচনাও নেই। ফেরবার পথে গৌহাটি থেকে আসাম-বঙ্গ রেলপথ দিয়ে সিলেটে আসেন (৬ নভেম্বর)। সিলেটে কবিসম্বর্ধনা খুবই

সমারোহ-সহ হয়েছিল। শিলঙ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে দেহলি বাড়িতে উঠলেন না ; উঠলেন উত্তরের ডাঙায় তাঁর নূতন পর্ণকুটিরে। মাঠের মধ্যে দুটো খড়ের ঘর হয়েছে। কবির শখ, মাটির ঘরে থাকবেন—কাঁকর-পেটা মেঝে, দর্মা-আঁটা দরোজা, কেবল স্নানের ঘরটা পাকা। সে বাড়ির অস্তিত্বও নেই ; বদলাতে বদলাতে কোণার্কের পাকা বাড়ি হয়েছে।

সেদিনকার সেই মাটির ঘরে কবির পরম আনন্দের দিন ছিল। সন্ধ্যার পর য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে পড়ে শোনান আশ্রমবাসীদের কাছে ; নিজের নূতন লেখাও পড়েন, আলোচনা করতে বলেন অন্যদের, সে আলোচনায় যোগ দেন নিজে। কোনো-কোনোদিন সন্ধ্যার সময় ছাত্রদের ঘরে এসে নানাপ্রকার কৌতুককর বুদ্ধির খেলা উদ্‌ভাবন করেন। সকালে ছেলেদের ক্লাস নেন, দুপুরে 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'র লেখা লেখেন। এই ভাবে দিন যায়।

৯৪

বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা কাজ কবির পক্ষে বেশি দিন ভালো লাগা সম্ভব নয়। মনে মনে বোধ হয় মুক্তির প্রার্থনা চলছিল। আহ্বান এল গান্ধীজির কাছ থেকে, অহমদাবাদে গুজরাটি সাহিত্য-সম্মেলনে কবিকে সভাপতি হতে হবে। অত্যধিক গ্রীষ্মের জন্য এবার তিন মাস ছুটি দেওয়া হল—চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ। কবি মার্চ মাসের শেষ দিকে (১৯২০) অহমদাবাদ রওনা হলেন— সঙ্গে এনড্রুজ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও কিশোর ছাত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশী। কবি এই বালকটির প্রতিভায় তখনই মুগ্ধ হয়েছিলেন ; শ্রীমান্ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে বিশ্বভারতীতে পড়াশুনা করেন ও কিছু-কিছু ক্লাসও নেন। অহমদাবাদে তাঁরা অতিথি হলেন অম্বালাল সারাভাইয়ের ; এঁরা অহমদাবাদের বিখ্যাত ধনী, ক্যালিকো মিলের মালিক। শুধু ধনী বললে এঁদের ছোটো করা হবে ; ধনীদের মধ্যে এরূপ শিক্ষিত পরিবার কমই দেখা যায়।

গুজরাটে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পদার্পণ। সাহিত্যসম্মেলনের বিরাট ব্যবস্থা হয়, কবি ইংরেজিতেই তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন।

গান্ধীজির আশ্রম সবরমতী অহমদাবাদের নিকটে ; কবি একদিন সন্ধ্যায় সেখানে যান এবং আশ্রমেই রাত্রিবাস করেন। পরদিন প্রাতে আশ্রমের উপাসনায় যোগদান ক'রে অম্বালালদের বাড়ি ফিরে আসেন।

এর পর চললেন কাঠিয়াবাড় সফরে ; নানা স্থানে ঘুরে ফিরে এলেন বোম্বাইয়ে। সেখানে তখন জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সাংবৎসরিক সভা হচ্ছে ১৩ই এপ্রিল তারিখে। কথা চলছে জালিনবালাবাগে ব্রিটিশের অমানুষিক আচরণকে স্তম্ভাদি দ্বারা চিরস্থায়ী করতে হবে। এই সভার অধিনায়ক বোম্বাইয়ের ব্যারিস্টার কংগ্রেসকর্মী জনাব মহম্মদ আলি জিন্না। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ লিখে পাঠালেন। কবি কেন স্মৃতিখণ্ড প্রতিষ্ঠার বিরোধী— সে কথাটাই এই রচনায় ব্যাখ্যা করে বলছেন।

যে-কংগ্রেসনেতা জিন্নাসাহেবের অনুরোধে এটি লিখিত হল, রাজনীতির এমনিই পরিহাস যে তিনিই কালে হলেন কংগ্রেসের পরমবিরোধী।

বোম্বাই থেকে বরোদায় এলেন। এখানে গয়কাবাড়ের অতিথি। ন্যায়মন্দিরে বা হাইকোর্টে কবিসম্বর্ধনা হল। কবি এখানে একদিন অন্ত্যজ-সমাজের এক সভায় উপস্থিত হন ; তাদের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন এবং লোকমান্য টিলককে এই অন্ত্যজসমস্যা দূর করবার ভার নিতে অনুরোধ ক'রে পাঠালেন। টিলক তখন মৃত্যুশয্যায়। বহুকাল পরে গান্ধীজি এই সমস্যা-সমাধানে হরিজন-আন্দোলন শুরু করেন।

বরোদা থেকে সুরাট ও সেখান থেকে বোম্বাই হয়ে কলিকাতায় ফিরে এলেন ; পশ্চিমভারতে এক মাস কাটল। সর্বত্র কবি তাঁর বিশ্বভারতীর আদর্শের কথা প্রচার করেছেন।

৯৫

গুজরাট সফর থেকে ফেরবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কবি সপরিবারে চললেন বিলাত-ভ্রমণে। ইতিপূর্বে শেষ সফর হয়েছিল ১৯১২-১৩ সালে। তার পর চার বৎসর চলেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। তার পর চলছে য়ুরোপের ভাঙাগড়া, কূটনীতিকদের বৈঠকে

—কার রাজ্য কাকে দেবে, কার সঙ্গে কার মিতালি হবে, কার সঙ্গে কার মিলন হতে দেওয়া হবে না, এই-সব শলাপরামর্শ হচ্ছে। পূর্ব য়ুরোপে জাগছে নূতন গণদেবতা ; বৈশ্যের হাত থেকে শূদ্রের হাতে আসছে রাজ্য-ব্যবস্থার ভার— শ্রমের ন্যায্য মূল্য ও মর্যাদা পাবার জন্য এই আন্দোলন।

কবি যাচ্ছেন য়ুরোপে। ভাবছেন সেখানকার লোকসমুদ্রে যে মন্থন হয়ে গেছে, তার পর সে-সব দেশের যাঁরা মনীষী, যাঁরা ভাবুক, তাঁদের দেখা মিলবে। আজ তাঁরা য়ুরোপের পুনর্গঠন নিয়ে চিন্তা করছেন, তাঁদের সেই চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যাবে।

বোম্বাই ছাড়বার একুশ দিন পরে ইংলন্ডের বন্দরে এসে জাহাজ ভিড়ল (৫ জুন ১৯২০)। জাহাজ-ঘাটে পিয়ার্সন এসেছেন। তিন বৎসর পরে তাঁর সঙ্গে দেখা ; ছাড়াছাড়ি হয়েছিল জাপানে ১৯১৭ সালে। স্থির হল পিয়ার্সন কবির সেক্রেটারির কাজ করবেন।

লন্ডনে পৌছবার পর রোটেনস্টাইন প্রভৃতি পুরাতন বন্ধুরা দেখা করতে এলেন। ভোজসভা পার্টি প্রভৃতি মামুলি ভদ্রাচার চলল। কিন্তু সকলের মধ্যেই একটু দূরত্বের ভাব— আন্তরিকতার স্পর্শ নেই। কবি যে গত বৎসর জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর সম্রাট-প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে পত্র দিয়েছিলেন, সেটা রাজভক্ত ইংরেজ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না ; তার প্রমাণ পেলেন অচিরেই। অক্স্ফোর্ডের এক সভায় কবির বক্তৃতায় রাজকবি রবার্ট্ ব্রিজেস সভাপতি হবার কথা হয় ; শেষ মুহূর্তে তিনি সভায় উপস্থিত হলেন না। রাজকবি হয়ে রাজোপাধিত্যাগীর সভায় কেমন করে তিনি আসবেন! দু মাস ইংলন্ডে থাকলেন ; পুরাতন বন্ধুমণ্ডলীর বাইরে যাঁদের সঙ্গে এবার পরিচয় হল, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হচ্ছেন আইরিশ কর্মবীর স্যর হোরেস প্লাংকেট ও উদ্বাস্তু রুশীয় চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোএরিখ। রোএরিখের ছবি দেখে কবি বিস্মিত হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন ; তখন রোএরিখ প্রায় অজ্ঞাতনামা শিল্পী।

কবি যখন বিলাতে সে সময়ে পার্লামেন্টে ভারতের জালিনবালাবাগের ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছে। সরকারি পক্ষ থেকে যে তদন্তকমিটি বসেছিল, পদাধিকারে ভারতসচিব মণ্টেগুকে তজ্জন্য কিছু মন্তব্য লিখতে

হয়। সেটা ভারতীয়দের অনুকূলে ছিল বলে ব্রিটিশ জনসাধারণ মণ্টেগুর উপর খুবই খাপ্পা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে এক পত্র দেন। এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ভারতে; সেখানকার উগ্রজাতীয়তাবাদীদের নিকট তিরস্কৃত হলেন এই চিঠি লেখার ফলে।

কবি একদিন ইন্‌ডিয়া-আপিসে গিয়ে মণ্টেগুর সঙ্গে দেখা করে বললেন যে, ভারতীয়েরা জালিনবালাবাগের হত্যাকারী জেনারেল ডায়ার ও হত্যাপ্ররোচক ছোটোলাট ওডায়ারকে শাস্তি দেওয়াবার জন্য উৎসুক নয়; ব্যাপারটা অন্যায় হয়েছে এইমাত্র কর্তৃপক্ষ কবুল করুন। কিন্তু মুশকিল তো সেইখানেই, অন্যায় স্বীকার করতে গেলে যে ইংরেজের প্রেসটিজে বাধে। তবে মণ্টেগু বললেন যে, ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ঘটনা আর না ঘটে সে দিকে তাঁরা হুঁশিয়ার হবেন। মোট কথা, চার দিকের আবহাওয়া থেকে কবি বুঝলেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আলোচনায় ভারতের কোনো সুরাহা হবে না। কবি এক পত্রে লিখলেন, ব্রিটিশ আমলারা ভারতীয়দের উপর যত দানবীয় অত্যাচারই করুক-না কেন ইংলণ্ডের নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে তাতে কোনোরকম লজ্জা বা ক্ষোভের সঞ্চার হয় না।

৯৬

ইংলন্‌ড্ থেকে কবি ফ্রান্‌সে গেলেন (৬ অগস্ট ১৯২০)। প্যারিস অপরিচিত, ফরাসী ভাষা অজ্ঞাত। সহায় হলেন সুধীর রুদ্র। ইনি এন্‌ড্রুজের বন্ধু দিল্লি সেণ্ট স্টিফেন্‌স্ কলেজের অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্রের পুত্র, প্যারিসে অধ্যয়ন শেষ করতে এসেছেন। আর পেলেন শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলেসকে; এঁদের না পেলে কবি ও তাঁর সঙ্গীদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হত।

ভাগ্যক্রমে কান্ (Kahn) নামে এক ধনী রবীন্দ্রনাথদের আতিথ্যভার গ্রহণ করলেন। থাকবার জন্য পেলেন শহর থেকে দূরে, সেন নদীর তীরে শান্ত পরিবেশের মধ্যে অতি পরিপাটি ক'রে সাজানো বাগান ও বাড়ি। বেশ আরামেই আছেন।

প্যারিস থেকে একদিন মোটর গাড়ি করে কবি ফ্রান্‌সের রণবিধ্বস্ত

অঞ্চল্ দেখতে যান। চার দিকের গাছপালা কঙ্কালসার দাঁড়িয়ে, ইতস্তত কামানের গোলার গভীর গর্ত— এখনো লোকে ভরাট করে উঠতে পারে নি। আধভাঙা ঘর বাড়ি চার্চ ফ্যাক্টরি এখানে সেখানে। সে এক বিশাল শ্মশানের মূর্তি। এই দৃশ্যে কবির চিত্তে নিদারুণ আঘাত লাগল; তাঁর মনে হল এতকালের মানবসভ্যতার এই পরিণতি! এই সমস্যার সমাধান কী এবং কোথায়, এই মর্মান্তিক প্রশ্নই তাঁর কাছে সব থেকে বড়ো হয়ে উঠল।

শহরতলীতে কানের এই সুন্দর উদ্যানবাটিকায় ফ্রান্সের অনেক মনীষী আসেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে— দার্শনিক আঁরি বের্গসঁ, লে ব্রন, সিলভ্যাঁ লেভি, কঁতেস দ্য নোআই প্রভৃতি অনেকে। বের্গসঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় জানা গেল, এই ফরাসীভাবুক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক সংবাদই রাখেন। লেভি ও নোআই-এর প্রসঙ্গ পরেও উঠবে।

ইতিমধ্যে নেদার্ল্যান্ড্ থেকে নিমন্ত্রণ এল— বক্তৃতা দিতে হবে। ওলন্দাজদের দেশে কবি দিন-পনেরো ছিলেন; সেখানেও শহর থেকে দূরে পল্লীপরিবেশে এক ধনীর গৃহে তিনি অতিথি হলেন। আমস্টার্ডাম, হেগ, লাইডেন, য়ুট্রেক্ট্, রটার্ডামে বক্তৃতা হল। সমসাময়িক এক ডাচ্ ভদ্রলোক লিখছেন, কবি যখন হল্যান্ডে এলেন, শ্রোতৃমণ্ডলীতে এমন একটি লোক পান নি যে তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; হাজার হাজার লোক কবির গ্রন্থ ইংরেজিতে বা ডাচ্ ভাষায় পড়েছিল। দেশে Spirit of Tagore বলে একটা কথাই সে সময়ে চালু হয়েছিল।

কবিকে সব থেকে সম্মান দিয়েছিল রটার্ডাম্বাসী, নগরের প্রধান চার্চের বেদি থেকে কবিকে ভাষণ দেবার ব্যবস্থা ক'রে। এ পর্যন্ত কখনো কোনো অখৃষ্টানকে তারা এ সম্মান দেয় নি।

হল্যান্ড্ বেলজিয়াম পাশাপাশি দেশ। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেল্সের প্রধান বিচারালয়ের বিশাল কক্ষে কবির বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল।

প্যারিসে ফিরলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, ঠিক করতে পারছেন না। ভাবছেন আমেরিকায় যাবেন। কিন্তু মেজর পন্ড্ যিনি গতবার কবির বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন, এবার তিনি লিখলেন,

মার্কিন মুলুকে কবির বক্তৃতার ব্যবস্থা সম্ভব হবে না। আসলে পন্ড্ তখন প্রায় দেউলিয়া, ব্যবস্থা করার অসুবিধা তাঁর অনেক। কিন্তু তার থেকেও গভীর কারণ ছিল, সেটা বোঝা গেল আমেরিকায় গিয়ে।

৯৭

হল্যান্ডের বন্দর রটার্ডাম থেকে কবি ও পিয়ার্সন আমেরিকায় রওনা হলেন— রথীন্দ্ররা য়ুরোপে থেকে গেলেন, পরে যাবেন। নিউইয়র্কে পৌঁছে (২৮ অক্টোবর ১৯২০) তাঁরা হোটেলে উঠলেন। কী খরচের দেশ! একদিনে যা খরচ করলেন, তাতে ইংলন্ডে বা ফ্রান্সে সাত দিন চলে। তার পর আকাশচুম্বী হোটেলের খাঁচায় বাস!

আমেরিকায় তো এলেন, কিন্তু কোনো আহ্বান নেই কোনো দিক থেকে। কাগজওয়ালারাও বেশ হুঁশিয়ার— কোনো উচ্ছ্বাস নেই, স্বাগত নেই। ব্রুক্লীনে ও নিউইয়র্কে কয়েকটা বক্তৃতা হল বটে, কিন্তু কোনো আন্তরিকতা নেই। হার্ভার্ডে বক্তৃতা হল, আরো দু-এক জায়গায়, কিন্তু আন্তর্জাতিকতার বার্তা বা বিশ্বভারতীর মর্মবাণী শোনবার কারো কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। আদর্শবাদের আদর্শ বাদ দিয়ে যা ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা শোনা যায়, ধরা ছোঁওয়া যায়, তারই খবর তারা রাখে; তারা 'প্র্যাগমেটিক', 'মা ফলেষু কদাচন' তারা বোঝে না। তারা কাজ করে, ফল চায়। কার্নেগি-গৃহিণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেখা করতে চাইলেন; তিনি জানালেন, দেখা হবে না। মাসখানেক অপেক্ষার পর ধনীকন্যাদের জুনিয়ার লীগ ক্লাবে তাঁর আহ্বান এল, কিন্তু তাঁর কথা কারো কানে পৌঁছল না। সকলে যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপের উদ্বাস্তুদের জন্য তহবিল তোলার হৈ চৈ নিয়েই মত্ত। পূর্বোক্ত সভার পর অধ্যাপক উড্স্ কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ইংরাজ সরকারের মনোভাব কিরূপ। এই একটি প্রশ্নেই কবি বুঝতে পারলেন কেন মেজর পন্ড্ তাঁকে আনবার জন্য উৎসাহ দেখান নি, কেন মাসাধিক কালে তাঁর কথা কাউকে শোনাতে বা বোঝাতে পারেন নি। বুঝলেন তাঁর 'সার্' উপাধি-ত্যাগের সংবাদ আট্লান্টিক মহাসাগর পার হয়ে এসে আমেরিকানদেরও আহত করেছে। বিগত মহাযুদ্ধের

অন্তিম কালের বান্ধব আমেরিকানরা রাজোপাধিত্যাগী রবীন্দ্রনাথকে ক্ষমা করতে পারে না। মার্কিনরা সকলেই 'মিস্টার'; কিন্তু ধনাগম হলেই ইংলন্ডের দেউলে লর্ড বা ডিউকদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কবি বুঝলেন, মার্কিন মুলুকে তাঁর বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা বৃথা সময় নষ্ট করা মাত্র।

যা হোক, নিউইয়র্ক্ ছাড়বার আগে মার্কিনের মুখ রক্ষা করলেন মুষ্টিমেয় সাহিত্যিকের দল; তাঁদের পোএট্রি সোসাইটি থেকে কবিসংবর্ধনার ব্যবস্থা হল। তার পর কবি শিকাগোতে গিয়ে শ্রীমতী মুডির বাড়িতে কয়েক দিন থাকলেন। এই মহিলার স্বামী ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, অল্পবয়সে মারা যান; তাঁর স্ত্রী রবীন্দ্রনাথকে খুবই ভক্তি করতেন। মিসেস মুডির প্রতি কবির প্রীতির নিদর্শন রয়ে গেছে, ইংরেজি 'চিত্রা' কাব্য তাঁকে উৎসর্গ করা।

শিকাগোতে থাকতে থাকতে খবর পেলেন মেজর পন্ড্ কবির জন্য এক কিস্তি বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। টেক্সাস স্টেটে পনেরোটি বক্তৃতা দিতে হবে।

পনেরোটা দিন শহর থেকে শহরে পন্ড্ সাহেব তাঁকে ঘোরালেন— রাতে পুল্‌ম্যান গাড়িতে নিদ্রা ও বিশ্রাম, দিনে বক্তৃতা ও দেখা-সাক্ষাৎ। টেক্সাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনগ্রসর অঙ্গরাজ্য; তবুও আরাম পাচ্ছেন। নিউইয়র্কের দুঃস্বপ্নময় স্মৃতি এবং ব্যর্থতার গ্লানি কিছু প্রশমিত হল।

কবি 'মিলিয়ন' ডলারের স্বপ্ন দেখে আমেরিকায় এসেছিলেন। ধনমান কিছুই পেলেন না। এ দিকে শান্তিনিকেতন থেকে এন্ড্রুজ লিখছেন, দারুণ অর্থাভাব। বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এন্ড্রুজের উপর ছেড়ে দিয়ে কবি নিশ্চিন্ত ছিলেন, অভাব হলেই এন্ড্রুজ টাকা জোগাড় করে আনতেন।

এইবার আমেরিকা-সফরের সময় কবির সঙ্গে লেনার্ড্ এলম্‌হার্স্ট্ নামে এক তরুণ ইংরেজের পরিচয় হয়। এই অদ্ভুতকর্মা যুবকটি কবির গ্রাম-সংস্কার সম্বন্ধে কথাবার্তা শুনে তাঁর আদর্শকে রূপদান করতে আত্মনিবেদন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এঁর তরুণী বান্ধবী মিসেস স্ট্রেট, জুনিয়র লীগের বিশিষ্ট সদস্যা, বিশ্বভারতীকে টাকা দিলেন। এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে

পরে এঁর বিবাহ হয়, তখনও বহু বৎসর ধরে শ্রীনিকেতনের কাজের জন্য নিয়মিত টাকা দিয়ে গেছেন।

সুতরাং আপাতব্যর্থ মনে হলেও কবির এই আমেরিকা-সফর আসলে ব্যর্থ হয় নি। টাকা পেয়েছেন, আর তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে, বিশ্বভারতীর এক অকৃত্রিম বন্ধু ও কর্মসহযোগী লাভ করেছেন।

৯৮

আমেরিকা থেকে ইংলন্ডে ফিরে (২৪ মার্চ ১৯২১) রবীন্দ্রনাথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ইংলন্ড্ ত্যাগ করে যাবার সময় মনে হয়েছিল, এই দ্বীপবাসীরা আদর্শহীন; কিন্তু সমুদ্রপারে আদর্শবাদের যে আরো অভাব সে ধারণা তখন ছিল না।

সপ্তাহ-তিন সেখানে থেকে প্যারিসে এলেন বিমানপথে— এই কবির প্রথম আকাশপথে বিচরণের অভিজ্ঞতা। প্যারিসের ম্যুজে গিমে (Muse Guimet) প্রতিষ্ঠান থেকে কবির বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত প্রাচ্যবন্ধু-সমিতি (Les Ami L' Orient) বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তুলে অতি দামী দামী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকাদি কিনলেন; এই কাজে শ্রীকালিদাস নাগ প্রচুর সহায়তা করেছিলেন। তখন তিনি সেখানে ডক্টর উপাধির জন্য তৈরি হচ্ছেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে উক্ত অমূল্য গ্রন্থরাজি আজও আছে।

প্যারিসে বাস-কালে কবির সঙ্গে রোমাঁ রোলাঁার সাক্ষাৎ হল। পূর্বে পত্রবিনিময় হয়েছে, চাক্ষুষ পরিচয় হয় নি। আর দেখা হল পেট্রিক গেডিসের সঙ্গে। ইনিও একজন অসামান্য ভাবুক ও কর্মী। গেডিসের প্রতিষ্ঠিত মঁপলিয়ের বিদ্যায়তনের কবি পৃষ্ঠপোষক হলেন।

প্যারিস থেকে কবি চললেন স্ট্রাস্‌বুর্গ। মহাযুদ্ধের পর ফরাসীরা আল্‌সেস্-লোরেন ফিরে পেয়ে সে দেশকে ফরাসী-করণের কাজে লেগেছে। অধ্যাপক লেভি সেখানকার নতুন ইউনিভারসিটির অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন। লেভির পাণ্ডিত্যে ও সৌজন্যে কবি খুবই মুগ্ধ; তাঁকে বিশ্বভারতীতে কিছুকালের জন্য আনবার কথা ভাবছেন।

ফ্রান্স থেকে কবি গেলেন সুইস্‌দের দেশে; লুসার্‌ন্‌, বাস্‌ল্‌, জুরিক প্রভৃতি স্থানে সফর করলেন। লুসারনে এসে খবর পেলেন যে, জর্মানরা কবির জন্মদিন উপলক্ষে বিরাট জর্মান সাহিত্যের রাশি রাশি গ্রন্থ তাঁকে উপহার দিয়েছে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে। এ সংবাদে কবি খুবই অভিভূত হন—বিদেশীর নিকট থেকে এমন অভাবনীয় অভিনন্দন তাঁর প্রত্যাশার অতীত ছিল।

সুইস্‌দেশ থেকে কবি জর্মেনির ডার্মস্টাট ও হামবুর্গ হয়ে গেলেন ডেন্‌মার্কে। ডেন্‌মার্কের রাজধানী কোপেন্‌হাগেনে পৌঁছে দেখেন, নোবেল পুরস্কার -প্রাপক ভারতীয় কবিকে দেখবার জন্য সে কী বিরাট জনতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পর ছাত্রেরা মশাল জেলে শোভাযাত্রা ক'রে কবিকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল; এবং তার পর অনেক রাত পর্যন্ত প্রাঙ্গণে উৎসব ও হৈ-হুল্লোড় করল। কবি সহাস্যমুখে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

ডেন্‌মার্ক থেকে সুইডেনের রাজধানী স্টক্‌হলমে এসে দেখেন স্টেশনে সুইডিশ অ্যাকাডেমির সদস্যগণ তাঁকে স্বাগত করবার জন্য উপস্থিত; আর বাইরে বিরাট জনতা। সুইড্‌রা যে ভারতীয় কবিকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করেছিল তিনিই আজ তাদের মধ্যে উপস্থিত, তারই আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য সমস্ত নগর ভেঙে পড়েছে।

কবি যখন স্টক্‌হলমে এসেছিলেন তখন মহানগরীতে সাংবৎসরিক লোক-উৎসব চলছে। কবি অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত হলেন; সুদূর উত্তর য়ুরোপের লোকনৃত্য দেখবার ও লোকসংগীত শোনবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেলেন।

নোবেল প্রাইজের নিয়মানুসারে পুরস্কৃতকে অন্তত একবার এসে অ্যাকাডেমির সম্মুখে কিছু বলে যেতে হয়। কবিকেও ভাষণ দিতে হল। কবির ভাষণান্তে উপ্‌সালা খৃষ্টমন্দিরের প্রধান পুরোহিত বা আর্চ্‌বিশপ বললেন যে, ঋষি ও শিল্পীর সমন্বয় হয়েছে কবির মধ্যে—নোবেলের সাহিত্য-পুরস্কার যোগ্যপাত্রে অর্পিত হয়েছে।

আর্চ্‌বিশপের অনুরোধে কবি উপ্‌সালায় গেলেন; সেখানকার মহা-দেবালয়ে (ক্যাথিড্রালে) কবিকে বক্তৃতা করতে হল; এই নগরের আর্চ্‌-

বিশপ উপস্থিত থাকতে অন্যধর্মাবলম্বী লোককে চার্চের ভিতর থেকে উপদেশ দেবার সম্মান ইতিপূর্বে কখনো কাউকে দেওয়া হয় নি। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা সে সম্মানও দিল।

সুইডেন থেকে কবি এলেন জর্মেনিতে। তখন জর্মেনি পরাভূত হয়েছিল সত্য, দুটো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে নি। বর্লিনে কবি অতিথি হলেন ধনকুবের স্টাইনেসের গৃহে। এই নিয়েও কবিকে কথা শুনতে হয়। এত লোক থাকতে শোষকগোষ্ঠীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এত বেশি হৃদ্যতা কেন? অভিযোগকারীরা ভুলে যান রবীন্দ্রনাথের বংশের কথা— আভিজাত্যের কথা। ধনী ব্যক্তি যদি সংকারপ্রার্থী হয়ে থাকে এবং তিনিও সে আতিথ্য গ্রহণ করে থাকেন, সেজন্য তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

বর্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার দিন যে ভিড় হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। পনেরো হাজার লোক ভারতীয় কবিকে দেখতে সমবেত হয়েছিল। এক দিনে রেহাই পান নি, কবিকে পরের দিনও বক্তৃতা করতে হয়।

'প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমি' জর্মেনির নাম-করা বিদ্বৎসমাজ; রবীন্দ্রনাথ সেখানেও একদিন বক্তৃতা দিলেন। তার পর সেখানকার কর্তৃপক্ষ কবির বাংলা ও ইংরেজি কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে রাখলেন। শুনেছি সে রেকর্ডগুলি বিশেষ মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি, বহুকাল নষ্ট হয় না। অ্যাকাডেমি তাঁদের ষাট বৎসরের অতি মূল্যবান পত্রিকা বিশ্বভারতীকে দান করলেন; সে এক ঐশ্বর্য!

বর্লিন থেকে ম্যুনিকে এসে কয়দিন থাকলেন ও সেখান থেকে গেলেন ডার্মস্টাটে। ডার্মস্টাটে মনীষী কাইসারলিঙ থাকেন— মহাযুদ্ধের পূর্বে ইনি ছিলেন কাউন্ট, এখন হৃতসর্বস্ব। তিনি জ্ঞানমন্দির নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন ১৯২০ সালে। দশ বৎসর পূর্বে তরুণ কাইসারলিঙ যখন ভারতভ্রমণে এসেছিলেন (১৯১১)— কবিকে দেখেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। তখন বিদেশীরা জোড়াসাঁকোয় আসতেন অবনীন্দ্রনাথদের চারুকলার সংগ্রহ দেখতে। কাইসারলিঙ রবীন্দ্রনাথকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেবার পরিচয় হয় নি।

ডার্মস্টাটে কবি যে এক সপ্তাহ ছিলেন সেটার নামকরণ হয় Tagore

Woch, অর্থাৎ ঠাকুর-সপ্তাহ। চারি দিক থেকে লোক আসত প্রশ্ন নিয়ে, প্রশ্ন লিখেও পাঠাত। বৈকালিক সভায় কবি জবাব দেন; দোভাষী বুঝিয়ে দেন।

একদিন ডার্মস্টাট শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের আড্ডায় কবি গেলেন। শ্রমিকদের গ্রাহ্যই নেই ঘরে কে এল। বীআরের বোতল সামনে খোলা, চুরুটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার—তারই মধ্যে গিয়ে কবি বসলেন। ধীরে ধীরে দুই চারটি কথা আশে-পাশে বলতেই, দেখা গেল লোকেদের মধ্যে একটু ভাবান্তর। মদের বোতল টেবিলের তলায় ঢোকালো, চুরুট নিবিয়ে পকেটে ভরলো; আসনের উপর ঘুরে বসল কবি কী বলছেন শোনবার জন্য। কবি পরে বলেছিলেন যে তাঁর জীবনে এত বড়ো বিজয় আর কখনো হয় নি।

কবির মন দেশে ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা হতে নিমন্ত্রণ এল, প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। পাশেই নূতন রাষ্ট্র চেকোশ্লোভেকিয়া—তারাও কবিকে দেখতে চায়। সেখানে জর্মান অধ্যাপক বিন্টারনিট্জ ও তাঁর চেক শিষ্য অধ্যাপক লেস্নি উভয়েই প্রগাঢ় রবীন্দ্রভক্ত ও প্রাচ্যবিদ্যায় পণ্ডিত। কবিকে প্রাগ নগরীতে যেতে হল তাঁদের ঐকান্তিক আহ্বানে।

আর ঘুরতে ভালো লাগছে না। দেশ থেকে যে-সব পত্র পাচ্ছেন তাও তাঁকে উতলা করে তুলছে। দেশে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে কবির দেশত্যাগের কিয়ৎকাল পরেই। শান্তিনিকেতনেও শান্তি নেই; রাজনীতির উত্তেজনা অনেককেই স্পর্শ করেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কবি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে এলেন।

৯৯

কবি যখন বিদেশে (১৯২০-২১) সে সময়ে ভারতে আরম্ভ হয়েছে প্রথম অসহযোগ-আন্দোলন। ইংরেজ-সরকার-প্রভাবিত বিদ্যালয়, আদালত, আপিস সবই বর্জন করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন গান্ধীজি। এ ভাবে অসহযোগ চালাতে পারলে এক বৎসরের মধ্যে নাকি স্বরাজ লাভ হবে।

দেশে ফিরে কবি দেখেন শান্তিনিকেতন অসহযোগ-আন্দোলনের একটা বড়োরকম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কস্মিন্‌কালেও যাঁরা রাজনীতিচর্চা করেন নি তাঁরাই আজ অগ্রণী ; এক বৎসরে স্বরাজ-লাভের আশায় সকলেই উৎসুক। কবি দেশে দেশে ফিরছেন বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্রের সন্ধানে, শান্তিনিকেতনকে সর্বমানবের মিলনতীর্থ করবেন এই কল্পনা মনে নিয়ে, আর সেখানেই অধ্যাপক-ছাত্র-মিত্র মিলে একটা 'সংকট' সৃষ্টি করে তুলেছেন অসহযোগের—একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস ! গান্ধীজি শিক্ষালয় বয়কট করবার কথা বলেছিলেন এক বৎসরের জন্য। কথাটা নূতন নয়, পদ্ধতিও পুরাতন। কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হবে কি ? জাতির চিন্তার আকাশকে কুয়াশামুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষায় রবীন্দ্রনাথ য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে (১৫ অগস্ট ১৯২১) একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন—'শিক্ষার মিলন'। কবির মতে য়ুরোপ যে জয়ী হয়েছে সে তার বিদ্যার জোরে ; সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধই বাড়বে। কবি বললেন, আসলে বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার মূলে। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিলাভই শিক্ষার আসল লক্ষ্য ; আমাদের দেশের বিদ্যায়তনগুলিকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলনকেন্দ্র করে তুলতে হবে।

লোকে কবির ভাষণ থেকে বুঝল, তিনি গান্ধীজির অসহযোগনীতি সমর্থন করছেন না। লোকে তখন পাগলের মতো, কবির কথা তারা শুনতে বা বুঝতে চাইবে কেন ? কবি 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধ লিখে আবার কলিকাতায় এসে পড়লেন। গান্ধীজির মহত্ত্ব স্বীকার করেও কবি তাঁর মত ও পথ মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, চরকা কাটতে বলা ও অসহযোগ করতে বলা কখনো নবযুগের 'সত্যের আহ্বান' হতে পারে না। "স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য। তথ্যানুসন্ধান ও বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকে ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে—অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগাতে হবে।" এর নির্গলিত অর্থ হচ্ছে ন্যাশনাল প্ল্যানিং ছাড়া সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

১০০

রাজনীতির আলোচনা বা সমালোচনা কবিজীবনের চরম কর্তব্য তো নয়ই, পরম আনন্দও নয়। রাজনীতির উত্তেজনা কখন মন থেকে সরে গেল। বীণাপাণি দেখা দিলেন বর্ষার আগমনে। সুরের বৈভব নিয়ে কবি বর্ষামঙ্গল-উৎসব করালেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে (২-৩ সেপ্টেম্বর ১৯২১)। এটিই বোধ হয় রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম প্রকাশ্য জলসা। চারি দিকে অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা— ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ গানের জলসা করছেন। ঘরে বাইরে লোকনিন্দা মুখর হয়ে উঠল।

গান্ধীজি কলিকাতায় এলেন কয়দিন পরে, কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হচ্ছে। তিনি কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। প্রায় চার ঘণ্টা উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলল; কী কথা হয়েছিল তা প্রকাশিত হয় নি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র এন্‌ড্রুজ। উভয়ে যখন বিচারে প্রবৃত্ত তখন অত্যুৎসাহী অসহযোগীর দল— ঠাকুর-বাড়ির মাঠে এসে বিলাতি কাপড় পুড়িয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল তাদের দেশভক্তি। বলা বাহুল্য; গান্ধীজি এদের ব্যবহারে খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।

কবি ও কর্মীর মধ্যে মতের ও কর্মপদ্ধতির সর্বৈব মিল হতে পারে না। স্বরাজ জিনিসটা কী, কোন্ উপায়ে সেটা লভ্য— লোকের কাছে সবই অস্পষ্ট। গান্ধীজি ঠেকে ঠেকে শিখতে রাজি আছেন— তাই তিনি চলে গেলেন অতিনিশ্চিত বিপদের মুখে। রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন তাঁর নিরালা শান্তিনিকেতনে, তাঁর ছাত্রমণ্ডলীতে। সেখানে এক নীড়ের মধ্যে বিশ্বকে বাঁধবার উদ্দেশ্যে সর্ব জাতির ও সর্ব ধর্মের লোককে আহ্বান করেছেন।

১০১

বহুদিন পরে কবির মন ছাড়া পেল কাব্যরচনার মধ্যে; সে কাব্য শিশু-ভোলানাথের লীলামৃতকথা। আমেরিকা থেকে শুরু হয়েছিল কেজো জীবনের ঘূর্ণিপাক, দেশে ফিরেও তিনি আটকা পড়লেন রাজনীতির তর্কজালে আর বিশ্বভারতীর নানা পরিকল্পনার মধ্যে— কবির ভয় "খেলার চেয়ে দায়িত্ব পাছে বড়ো হয়ে ওঠে"। তাই লিখছেন শিশুর মনের কথা— "এই কবিতা

লেখবার একমাত্র তাগিদ ছিল বয়স্ক লোকদের দায়িত্ববোধের জীবনকে ক্ষণকালের জন্য মন থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছায়।" এই কবিতাগুলি 'শিশু ভোলানাথ' নামে প্রকাশিত হয়।

পূজাবকাশের পূর্বে 'ঋণশোধ' নাটক অভিনীত হল। এটা নূতন নাটক নয়, 'শারদোৎসবের'ই পরিবর্তিত রূপ। কবি কখনো ফিরে ছাপান নি, অভিনয়ও করান নি। মনে যখন সাহিত্যসৃষ্টির আবেগ থাকে না তখন পুরাতন রচনা নিয়ে কাটাছাঁটা করে নূতন রূপ দেন— কখনো তা উৎরোয় কখনো উৎরোয় না ; 'ঋণশোধ' এই শেষের কোঠায় পড়ে।

পূজার ছুটির সময় পিয়র্সন ফিরলেন ; আর এলেন লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট্— যাঁর সঙ্গে আমেরিকায় দেখা হয়েছিল। তিনি এসেছেন কবির গ্রামোন্নোগ পরিকল্পনার ভার নেবেন বলে ; টাকারও ব্যবস্থা করে এসেছেন আমেরিকায়। বিদ্যালয় খোলবার মুখে সস্ত্রীক ফ্রান্‌স্ থেকে এলেন অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি (নভেম্বর ১৯২১)। লেভি আসাতে বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগ, অর্থাৎ বিদ্যাভবনের কাজ নূতন পথ নিল। লেভি থেকে বিশ্বভারতীতে শুরু হল চীনাভাষা সাহিত্য ও তিব্বতী বৌদ্ধধর্মাদির চর্চা ; যে চীনা ভবন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালে, তার বুনিয়াদ পত্তন হয়েছিল সেইদিন। এইবার পৌষ-উৎসবে (৮ পৌষ ১৩২৮ : ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১) কবি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানকে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিলেন, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হবার ঠিক বিশ বৎসর পরে। এতকাল এর সমস্ত দায় ছিল একা রবীন্দ্রনাথের ; বিদ্যালয়-পরিচালনার ব্যয়ের অধিকাংশ তিনি একাই বহন করে এসেছেন। কিন্তু আর সম্ভব নয়। কবি তাঁর ঐ সময় পর্যন্ত প্রচারিত সমস্ত বাংলা গ্রন্থের লভ্যাংশ আর অত্রস্থ স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিদ্যালয়ে দান করলেন ; নোবেল প্রাইজের টাকার সুদটা বিশ্বভারতীর প্রাপ্য বলে যথোচিত ব্যবস্থা করলেন।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে সে দিনের সভায় বিশ্বভারতী-পরিষদ গঠিত ও বিশ্বভারতীর সংবিধান-প্রণয়নের ব্যবস্থা বিহিত হল। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। বিশ্বভারতীর কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে-'ভারতী' এতদিন

অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন, আজ তিনি প্রকট হলেন।··· কিন্তু এর মধ্যে আর একটি ধ্বনিগত অর্থও আছে, বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত ক'রে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করা !··· সেইভাবেই বিশ্বভারতীর সার্থকতা আছে।"

কবির আন্তরিক বিশ্বাস, আন্তর্জাতিকতার আবহাওয়ায় না বাড়তে পেলে ভাবীকালের শিক্ষা অসম্পূর্ণ হবে। আজকাল ইউনেস্‌কো (UNESCO) যে-সব পরিকল্পনা করছেন তার অনেকখানি কবিকল্পনায় ছিল। একখানি সমসাময়িক পত্রে লিখেছিলেন, "শান্তিনিকেতনে নূতন যুগের আবির্ভাব প্রকাশমান হল, এখানে আমাদের নবযুগের অতিথিশালা খুলেছে।"

পৌষ-উৎসবের উত্তেজনার পর কবি পদ্মাতীরে কয়দিন বাস করে এলেন। এক পত্রে লিখছেন "আমরা যে ডাঙার উপর বাস করি সে ডাঙা তো নড়ে না। নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে। এইজন্য নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব।" বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা ইন্‌স্‌টিটিউশন গড়েই মনে শঙ্কা হচ্ছে, সে কি অচলায়তন হবে! তার মধ্যে কি বহতা থাকবে না? 'মুক্তধারা' নাটক লিখলেন আধুনিক জগতের একান্ত যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে। মনে ভয়, তাঁর সৃষ্টির মুক্তধারা যদি সংবিধানের ধারা-জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমেরিকা থেকে এক পত্রে লিখেছিলেন তাঁর আশঙ্কা হয় যে, কালে শান্তিনিকেতনে সুদক্ষ হিসাবনবিশদের প্রাধান্য হবে, তখন তার জাগ্রত চিন্তা ও চেষ্টা হতে শান্তম্‌-শিবম্‌-অদ্বৈতম্‌ নির্বাসিত হবেন।

বিশ্বভারতীর কাজ নানা দিক দিয়ে চলছে। কবি এখন শিক্ষাব্রতী। একটা অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে; তার অনেক কাজ। এই-সব কাজে সহায়তা করছেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ, অল্পকাল পরে এলেন শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। সুরুলের শ্রীনিকেতনে গ্রামসংস্কারের কাজ শুরু করে দিলেন এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্‌।

দেশের মধ্যে উত্তেজনার শেষ নেই। গান্ধীজি কর-বন্ধ-আন্দোলন

শুরু করবেন গুজরাটের বরদৌলী তালুকে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের নিরালায় বসে সমস্ত খবর পড়ছেন, নানা কথা শুনছেন। তিনি গুজরাটের এক নাম-করা সাহিত্যিককে এক খোলা চিঠিতে লিখলেন যে, অহিংসা-মন্ত্রকে এ ভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মধ্যে বিপদ অনেক; লোকের মনকে প্রস্তুত না করে এরূপ আন্দোলনের প্রবর্তন আর রণশিক্ষা না দিয়ে যুদ্ধে সৈন্য নামানো একই। ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্রোধকে উত্তেজিত ক'রে, তার পর অহিংসার মন্ত্র দ্বারা সে রিপুকে বশ মানানো যায় না। ক্রোধ তার ইন্ধন খোঁজে। কবির চিঠি প্রকাশিত হল ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯২২ তারিখে; আর উত্তর-প্রদেশের চৌরিচৌরার পুলিশ থানায় দেশের নামে নৃশংস ভাবে দেশীয় পুলিশ ও চৌকিদারদের হত্যা করল জনতা প্রায় ঠিক সেই সময়। এই ঘটনার দু দিন পরে কবি গ্রামসংস্কার ব্রতে ব্রতী করলেন একদল যুবককে সুরুল গ্রামে (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২); তার নেতৃত্ব করছেন একজন ইংরেজ। শ্রীনিকেতনের গ্রামোদ্যোগের জন্ম হল পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে। অর্থ এল আমেরিকা থেকে, শক্তি ও বিজ্ঞান এল ইংলন্ড থেকে, কর্মকেন্দ্র হল বোলপুরের নিকটবর্তী এক গ্রাম।

১০২

দিন যায় শান্তিনিকেতনে, কলিকাতায়, কখনো শিলাইদহে। শিলাইদহের বৈষয়িক কার্য কবিকে দেখতে হয়। কলিকাতায় যেতে হয় বিশ্বভারতীর কাজে অথবা সভা-সমিতির আহ্বানে। গ্রীষ্মকালে জনবিরল শান্তিনিকেতন। লেভিরা নেপালে, পিয়ার্সন-এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌ পাহাড়ে— কবি একা, আপন মনে গান লিখছেন। সেই তাঁর পূজা— সেই তাঁর উপাসনা।

১৩২৯ ভাদ্রে দ্বিতীয় বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হল কলিকাতায়; প্রথমে রামমোহন লাইব্রেরি-হলে, পরে এক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম গীতাভিনয়। তখন এ জিনিসটা সমাজে চালু হয় নি। জলসায় টিকিট কেটে লোক আসে— বিশ্বভারতীর অর্থের প্রয়োজন, তার খানিকটা সাশ্রয় হয়ে থাকে এইভাবে।

বিশ্বভারতীর ব্যয় বেড়ে চলেছে; টাকা জোগাতে হবে, সে দায়িত্ব

একা রবীন্দ্রনাথেরই। তাই চললেন বক্তৃতা-সফরে; বোম্বাই পুনা হয়ে মহীশূর গেলেন; তখন সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। বঙ্গলুর হয়ে মাদ্রাজ কোয়াম্বতুর মঙ্গলুর ঘুরে চললেন সিংহলে। সর্বত্রই বক্তৃতা ও দেখাসাক্ষাৎ চলছে। কলম্বো গালে ঘুরে গেলেন নেবার-এলিয়াতে। কিন্তু শরীর আর চলছে না, কয়দিন বিশ্রাম করতেই হল। একখানি পত্রে লিখছেন, "আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চি; হাতে নিয়ে বললে ঠিক হয় না, কণ্ঠে নিয়ে! এ বিদ্যা আমার অভ্যস্ত নয়, তৃপ্তিকরও নয়। সুতরাং দিনগুলো যে সুখে কাটচে তা নয়।... যখন মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন বিশ্বভারতীকে মরীচিকা বলে মনে হয়।... আইডিয়া জিনিসটা সজীব, কিন্তু কোনো ইন্‌স্‌টিটিউশনের লোহার সিন্দুকে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না— মানুষের চিত্তক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায় তবেই সে বর্তে গেল।" সিংহল থেকে ফিরে এলেন ভারতে। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন (অধুনা কেরল) রাজ্যদ্বয়ের কয়েকটি স্থান ঘুরে মাদ্রাজে এলেন। দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল -ভ্রমণে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, অর্থাগম খুব কম—যা পেয়েছিলেন, বক্তৃতার টিকিট-বেচা টাকা। তাই লিখেছিলেন "ভিক্ষাপাত্র কণ্ঠে নিয়ে" ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মাদ্রাজ থেকে ফিরে এলেন বোম্বাই। এখান থেকেই বস্তুত সফর শুরু হয়েছিল। সপ্তাহখানেক রইলেন ও পার্শিসমাজের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন। বিশ্বভারতীতে সর্বধর্ম সর্বসংস্কৃতি সর্বজাতির মিলন-কেন্দ্র হবে— ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে পার্শি ধর্ম ও সাহিত্য-চর্চার স্থানও করতে হবে— এ কথা নিবেদন করলেন ওঁদের সমাজের কাছে। পার্শিসমাজ উদারভাবে কবিকে অর্থ দিয়েছিলেন।

বোম্বাই থেকে অহমদাবাদে এসে উঠলেন অম্বালাল সারাভাইদের বাড়ি; একদিন সবরমতী আশ্রমে গেলেন। মহাত্মাজি কারাগারে; গতবার এখানে যখন এসেছিলেন তখন মহাত্মাজি আশ্রমে ছিলেন।

১০৩

পৌষ-উৎসবের পূর্বে কবি তাঁর দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভারত সফর শেষ করে

আশ্রমে ফিরেছেন (ডিসেম্বর ১৯২২)। বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হল। এখন এখানে অনেক-ক'টি বিদেশী— বিন্টারনিট্জ, লেস্নী, বগদানোভ, কলিন্স, স্টেলা ক্রামরিশ, বেনোয়া, সাণ্টা ফ্লাম। এ ছাড়া পূর্ব থেকে আছেন এন্ড্রুজ, পিয়ার্সন ও এল্ম্হার্স্ট্। শ্রীনিকেতনে এসেছেন শ্রীমতী গ্রীন ও আর্থার গেডিস— অধ্যাপক পেট্রিক গেডিসের পুত্র। এই তালিকাটা দিলাম বিশ্বভারতীর বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টার আভাস দেবার জন্য। বিদেশাগত এই-সব খাস সাহেব-মেমরা কী ভাবে কী বাড়িতে কী আসবাব নিয়ে থাকতেন ভাবলে আজ অবাক লাগে। এখানকার কারও বেতন তখন বেশি নয়— একশো টাকার মধ্যেই। কেবল বিদেশাগতেরা পাঁচ শো টাকা পেতেন। তা হলেও এই বিরাট ব্যয়ভার কবিকে বহন করতে হয় বলে ভিক্ষাপাত্র হাতে মাঝে মাঝে বের হতেই হয়।

সাহিত্যসৃষ্টিতে বড়োই মন্দা। একমাত্র গান লিখে ও গান গেয়ে চিত্তের মুক্তি খুঁজে পান— তার পর সমস্ত সময় যায় বিশ্বভারতীর কাজে-অকাজে ও ভাবনায়-দুর্ভাবনায়। অনেকগুলি গান লেখা হলে একত্র গুছিয়ে, সংলাপ যোগ করে একটা অভিনেতব্য নাটিকা করে তুললেন। নজরুল ইসলাম মাঝে মাঝে আসেন কবির সঙ্গে দেখা করতে ; এই 'বসন্ত' কাব্যখানি কবি তাঁকেই উৎসর্গ করলেন (২২ ফেব্রুআরি ১৯২৩)। নজরুলকে কবি খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর দুটো কাগজের জন্য কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। নজরুল তখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আলিপুর জেলে, সেখানে 'বসন্ত' বইখানি তাঁকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন।

বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ চাই। কবি পুনরায় সফরে বের হলেন ; প্রথমে গেলেন কাশী, সেখানে প্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্যসম্মেলন। উঠলেন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটোরাহুর পিতা অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর বাড়িতে।

সম্মেলনের সভাপতিরূপে কবি যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার মধ্যে আজও ভাববার মতো কথা আছে। কবি বললেন, ভারতব্যাপী মিলনের বাহন একটা ভারতীয় ভাষা করবার কথা হচ্ছে। তাঁর মতে এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না ; হয়তো একাকারত্ব (uniformity) হতে

পারে, কিন্তু একত্ব (unity) হতে পারে না। দড়ি দিয়ে বাঁধা, মিলনের প্রয়াস মাত্র। সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন অথবা বাহ্য শৃঙ্খলার মিলন মাত্র। তবে প্রবাসী বাঙালিদের উদ্দেশে কবি বললেন, তাঁরা যেন যে দেশে বাস করেন সে দেশ সম্বন্ধে উদাসীন না থাকেন। তিনি বললেন, প্রায়ই দেখা যায় বাংলার বাইরে যেখানে বাঙালিরা থাকেন তার ভাষা সাহিত্য তথ্যাদি সম্বন্ধে তাঁদের একটা ঔদাসীন্য আছে ; এই ঔদাস্য বা অবজ্ঞা অজ্ঞতারই নামান্তর। বাঙালির প্রধান রিপু এই আত্মাভিমান।

কাশী থেকে লখনৌয়ে গেলেন। অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িতে কয়দিন থেকে কবি চললেন পশ্চিমভারত সফরে। বোম্বাই থেকে অহমদাবাদ হয়ে গেলেন সিন্ধুদেশের রাজধানী করাচি শহর। তখন সিন্ধুদেশ বোম্বাই-প্রেসিডেন্সির বিভাগ। করাচি ও হায়দরাবাদে সফর বিশ্বভারতীর দিক হতে নিরর্থক হয় নি, সিন্ধী বণিকেরা মুক্তহস্তেই দান করেছিলেন।

করাচি থেকে স্টিমারে করে এলেন কাঠিয়াবাড়ের পোরবন্দরে। সেখানকার রাজা যথোচিত সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশ করেছিলেন। এবার সফরে কাঠিয়া-বাড়ের লোকসংগীত শোনবার ও লোকনৃত্য দেখবার বিশেষ সুযোগ হয়েছিল ; এই লোকনৃত্য কবির এতই ভালো লেগেছিল যে, দেশে ফেরবার সময়ে একটি গুজরাটি চাষী পরিবারকে শান্তিনিকেতনে সঙ্গে করে আনলেন। মেয়েদের দু হাতে মন্দিরা বাজিয়ে নাচতে ও গাইতে দেখে লেখেন, "দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে" গানটি।

বর্ষশেষের পূর্বেই বোম্বাই থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরেছিলেন। নববর্ষের দিন (১৩৩০) রতন-কুঠির ভিত্তি স্থাপিত হল। এই বাড়ির জন্য পঁচিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন সার্ রতন টাটার কাছ থেকে। বিশ্বভারতীর বিদেশী অতিথিদের বাসযোগ্য ভবন নির্মিত হল।

১০৪

১৩৩০ সনের গ্রীষ্মাবকাশে কবি গেলেন শিলঙ পাহাড়ে ; সেখানে লিখলেন 'যক্ষপুরী' নামে এক নাটক— কিছুকাল পরে সেটাই নূতন করে লিখে 'রক্তকরবী' নামে প্রকাশ করেন।

কলিকাতায় যখন ফিরলেন তখন দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। চিত্তরঞ্জন দাশ সর্বত্যাগী হয়ে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। কয়েক বৎসর নেতি-মার্গে আন্দোলন করে তিনি খুশি হতে পারছেন না; তাই মোতিলাল নেহরু প্রভৃতির সহযোগে 'স্বরাজ দল' গঠন করে স্থির করলেন, কাউন্সিলে প্রবেশ করে সেখানে ইংরেজ সরকারের প্রবল প্রতিপক্ষরূপে কাজ করবেন। এ সম্বন্ধে সাংবাদিকেরা রবীন্দ্রনাথের মত কী জানতে এলেন। তিনি বললেন, দলাদলির জন্য বা দলাদলির ফলে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তা জীবনেরই লক্ষণ। একটিমাত্র কর্মধারা মেনে নিয়ে সবাইকে কাজ করতে হবে এ কথায় তিনি সায় দেন না। তবে পরস্পরের প্রতি হীন অভিসন্ধি আরোপ করাটা অসংগত।— এটা বিশেষ করে বললেন এইজন্যই যে, ইতিমধ্যে দুই দলের মধ্যে নিন্দাবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে।

কলিকাতায় আছেন 'বিসর্জন' অভিনয়ের জন্য। সেই একই কারণ— বিশ্বভারতীর অর্থের প্রয়োজন। অভিনয় দেখে দেশের লোক টাকা দেবে। তবে এ কথাও সত্য, অভিনয় করে ও অভিনয় করিয়ে কবি নিজে আনন্দ পান— সেটা তাঁর আর্টিস্ট-সত্তার সম্ভোগ— যদিও তাঁর বয়স এখন বাষট্টি বৎসর। কবি জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। দর্শকেরা যৌবনের রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেল— নিজের সাজসজ্জা (মেক্‌-আপ) কবি নিজেই করেন।

শান্তিনিকেতনে ফিরলেন দুই মাস পরে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াচ্ছেন; বিদ্যালয়ের কাজে মনোনিবেশের চেষ্টা করছেন। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল পিয়ার্সন ভারতে ফেরবার পথে ইটালিতে ট্রেন-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আর পেলেন সুকুমার রায়ের মৃত্যুসংবাদ। দুটিই সমান দুঃসংবাদ; দুজনেই ছিলেন কবির পরম স্নেহের পাত্র। ব্যক্তিগত দুঃখ-আঘাত তো আছেই, দেশব্যাপী সমস্যাও কবির বিশেষ উদ্‌বেগের কারণ হয়ে ওঠে।

১০৫

খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করে, অসহযোগ আন্দোলনের গোড়ায়

(১৯২০-২১ সালে) কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানের মিলনস্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বদেশসীমা-পেরোনো একটা আনুগত্যের ভাব আর একটা মধ্যযুগোচিত ধর্ম-বিশ্বাসকে সমর্থন করে নেতারা ভেবেছিলেন, মুসলমানদের দলে টানা সহজ হবে ও হিন্দু মুসলমান মিলে ব্রিটিশ সরকারকে জব্দ করা সম্ভব হবে। পরিণামে দেখা গেল, ধর্মচেতনা ধর্মান্ধতায় রূপান্তরিত হতে বেশি সময় লাগে না। নানা বিষয়ে মতভেদ শুরু হল। হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে এখনো ফাটল ধরে নি সত্য, কিন্তু চিড় দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে দুটি প্রবন্ধ লেখেন 'সমস্যা' ও 'সমাধান'। বহু বৎসর কেটে গিয়েছে, একটির জায়গায় দুটি স্বাধীন দেশের উদ্ভব হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের ঐ সময়ের ভাবনা ও ভাষণ অনুধাবন করলে পাঠক দেখতে পাবেন, আজও সেই সমস্যাই রয়েছে— তার সমাধানও সেই। কারণ, ধর্মের গোঁড়ামি আর ধর্মে ও রাজনীতিতে জট পাকানো সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা অবধি, আজও নির্মূল করা যায় নি— ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত সর্বদাই মেঘাচ্ছন্ন, মোহাচ্ছন্ন।

কবি সেদিন বললেন, ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু মুসলমানে কেবল মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সমকক্ষ হতে হলে, মুসলমানদের পক্ষে যেমন সংঘশক্তি গড়বার স্বাধীনতা আছে হিন্দুর পক্ষেও সেটা তেমনি আবশ্যক হওয়া উচিত। তিনি স্পষ্ট করেই বললেন, "মুসলমানদের পক্ষে জোট বাঁধা যত সহজ হিন্দুর পক্ষে তা সম্ভব নয়; হিন্দু বিপুল, অথচ দুর্বল। এ ক্ষেত্রে শুধু চরকায় সুতো কাটলে সমস্যার সমাধান হবে না। বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে, এমন-কি স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখ-দহনের নিবৃত্তি হবে না। আজ দুশো বছর আগে চরকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয় নি, সেই সঙ্গে আগুনও দাউ দাউ করে জ্বলেছিল। সেই আগুনের জ্বালানি কাঠ হচ্ছে ধর্মে কর্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।" এই অবুদ্ধির রিপু সকল ধর্মের মধ্যে শিকড় গেড়ে বিদ্যমান। কবির মতে, "দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে এ কথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যে রয়ে গেছে ফাঁকির 'পরে বিশ্বাস; বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে

নয়।” একটা কবিতায় লিখলেন :

মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা,
একটা বাঁধন কাটে যদি বেড়ে ওঠে চারখানা।
লোভে ক্ষোভে উঠিস মাতি, ফল পেতে চাস রাতারাতি—
মুঠোরে তোর করবে ফুটো আপন খাঁড়ার ধারখানা।

এই সময়ে লেখেন ‘রথের রশি’ (‘রথযাত্রা’ শিরোনামে সাময়িকে মুদ্রিত ও পরে ‘কালের যাত্রা’য় সংকলিত) নাটিকা— তাতে ধর্মমূঢ়তাকে করেছেন ধিক্কৃত, যেমন যন্ত্রদানবের নিন্দা করেছেন ‘মুক্তধারা’য় ও ‘রক্তকরবী’তে। প্রাচ্যের বিশ্বাস সন্ন্যাসীর মন্ত্রে, আর পাশ্চাত্যের বিশ্বাস বিজ্ঞানীর যন্ত্রে। আসলে অন্তঃশুদ্ধির প্রয়োজন— “ভিতরে রস না জমিলে, বাহিরে কি গো রঙ ধরে।” ভিতরে যে-রস জমছে সে যে ধর্মান্ধতার গরল-পূর্ণ।

১০৬

ইংরেজি ১৯২৩ সনে পূজার ছুটির শেষ দিকে কবি গুজরাট সফর করে এলেন। সেবার পোরবন্দর ছাড়া অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে ঘোরা হয় নি। এবার রাজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে মোটা টাকা পেলেন, তাই দিয়ে পত্তন হল নূতন কলাভবন বাড়ির।

পৌষ-উৎসবের পরে কবি গেলেন শ্রীনিকেতনে। সেখানকার নূতন আকর্ষণ হয়েছে, অশথ গাছের উপর কাঠের বাড়ি; আশ্রমের অন্যতম জাপানী কর্মী কাসাহারা সেটা বানিয়েছেন। নূতন বাড়ি হলেই কবির সেখানে কিছুদিন থাকা চাই; নূতন পরিবেশে পুরাতনের আবেশ খানিকটা কেটে যায়। বহুদিন পরে এল নূতন কাব্যসৃষ্টির আনন্দময় আবেগ। ‘বলাকা’র পর দীর্ঘকাল গানের রাজ্যে বাস করেছেন; বিচিত্র কর্মোদ্যমের ক্লান্তির মধ্যে সেই গানেই পেতেন অন্তরের তৃপ্তি।

যৌবনের জীবনদেবতাকে আবাহন করে বলছেন :

কবে নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী।

...

ডাকিলে আবার কবেকার চেনা স্বরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

...

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুলি ?

...

দেখ না কি, হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।

এবার যে কবিতাগুলি লিখলেন সেগুলি 'পূরবী' কাব্যের প্রথম অংশে স্থান পেয়েছে (মাঘ-ফাল্গুন ১৩৩০)।

ইতিমধ্যে চীনদেশ থেকে কবির নিমন্ত্রণ এসেছে; সে দেশে যাবার পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে প্রতিশ্রুত তিনটি বক্তৃতা দিয়ে গেলেন।

চীনদেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে (১৯১২) বহু বৎসর ধরে অশান্তি চলে। মাঝে কিছুকাল যখন শান্তি ছিল সেই সময়ে পেকিঙের বক্তৃতা-সমিতি বিদেশ থেকে কয়েকজন মনীষীকে আহ্বান করেছিলেন। প্রথম বৎসরে আমেরিকা থেকে দর্শনশাস্ত্রী জন ডিউই, দ্বিতীয় বৎসরে ইংলনড্ থেকে মনীষী বার্ট্রান্ড্ রাসেল, আর এবার ভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ।

কবির সঙ্গে চললেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু ও এল্ম্হার্স্ট্, তা ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কালিদাস নাগ।

কলিকাতা থেকে তাঁরা স্টিমারে যাত্রা করলেন (২১ মার্চ ১৯২৪)। পথে রেঙ্গুন, পেনাঙ, মালয় উপদ্বীপের কুয়ালা-লম্পুর প্রভৃতি স্থানগুলিতে নেমে

দেখে গেলেন। মালয় সম্বন্ধে কবি লিখলেন যে, দেশটা মালয় জাতের নয়, সেটা ভাগ করে খাচ্ছে ব্রিটিশ রবার-বাগিচা-ওয়ালা ও টিন-খনির মালিকেরা। শ্রমিকের কাজ করে চীনেরা ও ভারতীয়েরা আর খাস মালয়রা নিজবাসভূমে পরবাসী— উঞ্ছবৃত্তি করে বেঁচে আছে। এল্ম্হার্স্ট্ লিখছেন যে, এ দেশে রাজনৈতিক জাগরণ দেখা দিয়েছে, কিন্তু এখনো তা মারমুখো হয় নি। এটা ১৯২৪ সালের কথা।

সিঙাপুরে জাহাজ বদল করে জাপানী জাহাজ ধরে কবি ও তাঁর দল চীনে পৌছলেন। কান্টন থেকে সান্ইয়াৎ সানের দূত এল তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে। কান্টনে যাবার যোগাযোগ হল না— কেন হল না জানা যায় না, হাতে সময় যথেষ্ট ছিল। প্রাচ্যের দুই নেতৃস্থানীয় পুরুষের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ আর হল না— ১৯২৫ সালের গোড়ায় সান্ইয়াৎ সানের মৃত্যু ঘটে।

চীনের বন্দর শাংহাই পৌছলেন ১২ এপ্রিল। শাংহাই বিশাল নগর, সেখানে বহু প্রতিষ্ঠান ও ক্লাব। জাপানী ব্রিটিশ মার্কিনদের অসীম প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্পত্তি এখানে। নগরটাকে তারাই ভাগ করে ভোগ করছে— চীনারা যেন সেখানে উহ্য। যাই হোক, স্থানীয় এক পার্টিতে বহু গণ্যমান্য নাগরিক কবিসম্বর্ধনা করলেন। কবি বললেন, এশিয়ার সাধকেরা যুগে যুগে পৃথিবীকে আর-একটু সুন্দর, আর-একটু মধুর করবার বাণী শুনিয়েছেন; এশিয়া আজও সেই শ্রেণীর ভাবুকেরই প্রতীক্ষায় আছে। চীন ও এশিয়ার অপর প্রতিবেশী জাতিসমূহের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীপূর্ণ মিলন ঘটাবার জন্য আজ চীনের যুবজনকে কবি আহ্বান করলেন। বিংশ শতকের গোড়ায় জাপানী শিল্পী ও ভাবুক ওকাকুরা বলেছিলেন: *Asia is one*। আজ রবীন্দ্রনাথ সারা এশিয়ার সেই ঐক্যের বাণীই বহন করে এনেছেন চীনে।

শাংহাই থেকে চেকিয়াঙ প্রদেশের প্রধান নগর হাংচৌ গেলেন; সেখানে বহু প্রাচীন বৌদ্ধকীর্তি আছে, সঙ্গীরা তন্ন-তন্ন করে দেখলেন। কবি ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু বোধিজ্ঞানের ধর্মসাধনার উল্লেখ করে বললেন, অতীতেও যেমন চীন ও ভারত এক সাধনার ডোরে বাঁধা পড়েছিল তেমনি ভবিষ্যতেও উভয় দেশকে আবার প্রীতির বন্ধুত্বে এক হতে হবে।

শাংহাই ফিরে জাপানীদের সভায় কবি যে ভাষণ দিলেন তাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বেশ সমালোচনা ছিল ; প্রাচ্যকে পশ্চিমদেশের আদিমানবোচিত মনোভাবের চর্চা থেকে নিবৃত্ত হবার উপদেশ দিলেন।

কবির এই বক্তৃতায় য়ুরোপীয়েরা খুশি হল না, চীনে যুবক যারা পশ্চিমের দিকে ঝুঁকেছে তারাও ক্ষুণ্ণ হল, সাময়িকপত্রে কবির মতের সমালোচনা হল— তবে তাতে অশ্রদ্ধার প্রকাশ ছিল না। কবির সম্বন্ধে তীব্রতর সমালোচনা চলতে থাকে ইংরেজি কাগজে। তৎসত্ত্বেও শাংহাই ত্যাগের পূর্বে পঁচিশটি সমিতি সম্মিলিত ভাবে কবিসম্বর্ধনা করেছিল বেশ সাড়ম্বরে।

শাংহাই থেকে ইয়াংৎসে নদীপথে নান্‌কিঙে এলেন ; নান্‌কিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট হলে কবির বক্তৃতা হল। অসম্ভব ভিড়— ভয় হল হলঘরের বারান্দা বুঝি ভেঙে পড়বে !

এবার চলেছেন পেকিঙ-অভিমুখে। শান্‌টুঙ থেকে কবির জন্য স্পেশাল ট্রেন ও দেহরক্ষীর দল দেওয়া হল। ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় পেকিঙ পৌঁছে দেখেন স্টেশনে বেশ ভিড়, পথে চারি দিক থেকে লোক ফুল ছড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে চীনারীতি অনুসারে কর্ণভেদী পটকা ফাটাচ্ছে। অভ্যর্থনার ব্যাপার দেখে বিদেশী পত্রিকাওয়ালারা বিস্মিত হয়ে লিখল, পেকিঙে আগেও তো লোক এসেছে গিয়েছে, কিন্তু এমন উন্মত্ত আবেগ তো কখনো দেখা যায় নি, এর কারণ কি ?

কবির বক্তৃতা নানা স্থানে হল। নবীন চীনারা ভাবছে রবীন্দ্রনাথ প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রাচীনদলের মানুষ। তা নিয়ে কবিকে প্রথম দিকে বেশ বেগ পেতে হয়। কিন্তু যতই যুবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, কবির মত সম্বন্ধে তাদের ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হল।

সপ্তাহখানেক পেকিঙে বাস করে, শহর থেকে বারো মাইল দূরে আমেরিকান বিত্তায়ত্তঃ সিন-হুআ কলেজে গিয়ে কয়দিন বিশ্রাম করলেন। ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়— তারা বহু বিচিত্র প্রশ্ন লিখে পাঠায়, কবি তার উত্তর দেন। এতে করে খুব একটা হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়।

৮ মে তারিখে কবির জন্মদিনে পেকিঙে বিরাট উৎসব-সভা হল, চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাবুক ও মনীষী হু-শি পৌরোহিত্য করলেন। সভায় কবিকে

চু-চেন-তান বা 'মেঘ-মন্দ্রিত-প্রভাত' এই উপাধি দান করা হয়। উৎসবে চীনা ভাষায় 'চিত্রা'র অভিনয় হল।

পেকিঙে বাস-কালে চীনের ভূতপূর্ব সম্রাট কবিকে একদিন আহ্বান করেন; তখন সম্রাট ছিলেন এক প্রকার বন্দী। এই নিষিদ্ধ পুরীতে কেউ যেতে পেত না। এই নির্বাসিত সম্রাট পরে জাপানীদের শিখণ্ডী হয়ে হেনরী পু-য়ী নামে মানচু-কুয়ো রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের সময় তিনি নিতান্ত বালক ছিলেন বলে চীনারা তাঁকে দয়া করে মারে নি। ২০ মে কবি ও তাঁর সঙ্গীরা পেকিঙ ত্যাগ করে আরো কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করে শাংহাই ফিরে এলেন। সেখান থেকে নন্দলাল কালিদাস ও এল্‌ম্‌হার্স্টকে নিয়ে কবি জাপানে চলে গেলেন। ক্ষিতিমোহন বৌদ্ধ-সংস্কৃতির স্থানগুলি ভালো করে দেখবার জন্য চীনে থেকে গেলেন কয়েক দিন।

রবীন্দ্রনাথের জাপানে আগমন এই তৃতীয়বার। টোকিওর একটি বক্তৃতায় কবি জাপানীদের উগ্র জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে তীব্র নিন্দাবাদ করে তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, তোমরা যদি শান্তি চাও তবে 'নেশন'- রাক্ষসের বিরুদ্ধে তোমাদের লড়াই করতে হবে। বলা বাহুল্য কবির কথায় কখনো কোনো রাজনীতিজ্ঞ কর্ণপাত করে নি, আর জাপানীরা করবে! প্লেটো তো রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্বাসন করতেই বলেছিলেন। তবু চীনদেশের আদিগুরু কুংফুৎসু রাজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন তাদের ভালো করবার জন্য। গ্যেটে হ্বাইমার দরবারকে সভ্য করবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও ত্রিপুরা দরবার সম্বন্ধে অনেক ভেবেছিলেন।

জাপানে কবির সঙ্গে ভারতের অন্যতম বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর দেখা হয়। রাসবিহারী কলিকাতা থেকে যখন পালিয়ে যান তখন তিনি কবির আত্মীয় পি. এন. টাগোর নাম নিয়ে সেখানে যান (১২ এপ্রিল ১৯১৬)। জাপানে বসুর সঙ্গে দেখাশোনা করলে ব্রিটিশ দূতাবাসের চরদের চোখে পড়বেই, তাই রবীন্দ্রনাথ একাই দেখা করেন।

রবীন্দ্রনাথের চীন জাপান-সফরের একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল প্রাচ্য জগতে। কবির প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাসের মধ্যে নানা দেশের

বিপ্লবীরা একত্র হয়ে শাংহাইয়ে এশিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশন গঠন করলেন। সমসাময়িক আমেরিকান সংবাদপত্রে জানা যায় যে, উদ্যোক্তারা স্পষ্ট করেই বললেন যে, এই সম্মেলনের প্রেরণা এসেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এশিয়ার আত্মবোধ সম্পর্কিত ভাষণ থেকে।

আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কোনো ভারতীয় মনীষী চীনদেশে যান নি ; এ কালে তিনিই ভারতের দূত-রূপে চীনে গিয়ে ভারত-চীন-মৈত্রীর ভিত্তি পত্তন করলেন।

১০৭

চার মাসে চীন জাপান -সফর সমাধা করে কবি কলিকাতায় ফিরলেন (২১ জুলাই ১৯২৪)। কিন্তু দেশে দু মাসের বেশি থাকা হল না। আহ্বান এসেছে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্য থেকে। সেখানে তাদের স্বাধীনতার শতবার্ষিক উৎসব হবে ডিসেম্বর মাসে। এক শত বৎসর পূর্বে (৯ ডিসেম্বর ১৮২৪) আয়াকুচোর যুদ্ধে পেরুবাসীরা স্পেনের সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল ; সেই দিনের স্মরণ উপলক্ষে মহোৎসব। পেরুবাসীরা ভারতের কবিকে সেই মহোৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করে এবং যাওয়া-আসার সমস্ত ব্যয় দিতে চায়।

কবির সঙ্গে চললেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, তাঁদের গৃহীতা কন্যা নন্দিনী ও বিশ্বভারতীর শিল্পকলার অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর। এঁরা য়ুরোপে বেড়াতে যাচ্ছেন। যাত্রার কয়দিন পূর্বে কবি ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়লেন, ভালো করে সারবার আগেই যাত্রা করতে হল। অসুস্থ শরীর নিয়েই কলম্বোতে জাহাজে উঠলেন ; কেবিনে বসে লিখছেন 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি', সেই সঙ্গে সঙ্গে কবিতা।

কবির খুব ইচ্ছা পোর্ট্‌সৈয়দে নেমে ইস্‌রেলের নূতন দেশ দেখে যান ; কিন্তু সময়াভাবে হল না। এ দুঃখ তাঁর বরাবর ছিল ; ইহুদী কবি বালিক্ (Balik) এসেছিলেন একবার ; মিস্ সাণ্টা ফ্লাম এখানে কাজ করছিলেন। অধ্যাপক লেভি, বিন্‌টারনিট্‌জ, উভয়েই ইহুদী ; কবির ইচ্ছা ইহুদীদের নূতন দেশে তাদের দেশোন্নয়নের কাজ দেখেন।

ফ্রান্স্ থেকে দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জেন্টিনাগামী জাহাজ ধরলেন। কবির সঙ্গে চললেন এল্ম্হার্স্ট সেক্রেটারি হয়ে। জাহাজের কেবিনে লেখা চলছে, কবিতা লিখছেন। বন্দর থেকে বের হবার চার-পাঁচ দিন পর কখন শরীর গেল বিগড়ে, বিছানা ছাড়া গতি রইল না— কেবিন-বন্দী দিন, নিদ্রাহীন রাত্রি। তবুও বিছানায় পড়ে পড়ে কবিতা লেখা চলল। তিন সপ্তাহ জাহাজে কাটল। আর্জেন্টিনার রাজধানী ও বন্দর বুনোস এয়ারসে পৌঁছলেন যখন, শরীর খুবই দুর্বল ; ডাক্তারেরা বললেন এ অবস্থায় পেরুযাত্রা অসম্ভব, পথ দূর ও দুর্গম। ডাক্তারদের নিষেধে পেরু-যাত্রা নাকচ হল। বুনোস এয়ারস দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম নগরী ; শহর থেকে বিশ মাইল দূরে সান্ইসিড্রো নামে পল্লীর এক বাগানবাড়িতে কবির থাকবার ব্যবস্থা হল। কবিকে বোঝানো হল যে, পেরুর উৎসব একটা যুদ্ধের স্মরণদিন মাত্র, ওর মধ্যে কোনো আদর্শবাদ নেই ইত্যাদি। এই-সব যুক্তি দেখিয়ে কবিকে নিবৃত্ত করার মধ্যে স্থানীয় ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের কোনো চাল ছিল কি না সে বিষয়টা স্পষ্ট নয়। পরে ১৯২৬ সালে যেবার য়ুরোপ যান তখন তাঁর সোভিয়েট রাশিয়ায় যাওয়া পণ্ড হয়, সেও কবির মন্দ স্বাস্থ্যের অজুহাতে।

দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণের ফলে বাংলা ভাষা পেল দুখানা বই, 'যাত্রী' ও 'পূরবী' ; সেই সঙ্গে কবি পেলেন এক অকৃত্রিম বান্ধব— শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। এঁরই সেবা যত্নে প্রবাসের দিনগুলি কাটে ; 'বিজয়া' নামকরণে 'পূরবী' কাব্য এঁকেই উৎসর্গ করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও ভিক্টোরিয়ার কথা বলতেন :

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেয়েছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।
ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা ;

আর্জেন্টিনা থেকে ফেরবার পথে ইটালির জেনোয়া বন্দরে নামলেন; রথীন্দ্রনাথেরা য়ুরোপ সফর শেষ করে এখানে কবির সঙ্গে মিলিত হলেন।

ইটালিতে সে সময়ে মুসোলিনীর অপ্রতিহত প্রতাপ। রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করবার জন্য মিলান নগরে আয়োজন হয়েছিল। অধ্যাপক ফর্মিকি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত; তাঁর খুব উৎসাহ। তিনি কবির দোভাষী ও সঙ্গী হলেন। অনেক শহর থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগল— কিন্তু কবির শরীর ভালো নয়, সবই প্রত্যাখ্যান করলেন। ভেনিসে এসে জাহাজ ধরে দেশে ফিরলেন (১৭ ফেব্রুআরি ১৯২৫)।

১০৮

কবি দেশ থেকে পাঁচ মাস অনুপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক জটিল সমস্যা এসে গেছে। ১৯২৪ সালে ২৪ অক্টোবর তারিখে বেঙ্গল অর্ডিনান্স্ পাস করে স্বরাজ্য-দলের ৭২জন কর্মীকে গ্রেপ্তার ও নজরবন্দী করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিদেশে থাকতেই এ খবর পান। আর্জেন্টিনা থেকে পত্র-কবিতায় লেখেন:

ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলা দেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।

বেলগাঁওয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজি সভাপতি; সভায় স্থির হল অসহযোগ-নীতি স্থগিত করা হবে। কংগ্রেস গঠনমূলক কর্মনীতি গ্রহণ করবেন— সে কাজ হল চরকা-কাটা, খদ্দর-প্রচার এবং মাদক-নিবারণ। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে দেখেন ৯০টা চরকা ও তকলি সেখানে চলছে— পণ্ডিত বিধুশেখর ও শিল্পী নন্দলাল চরকা কাটছেন। কবি কোনো মন্তব্য করলেন না; তবে সকলকে কাজ করতে দেখে খুশি হলেন।

গ্রীষ্মাবকাশে কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। গান্ধীজি কলিকাতায় এসেছেন; শান্তিনিকেতনে এলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে এলেন

মহাদেব দেশাই ও সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন। কবির সঙ্গে চরকানীতি নিয়ে দুদিন আলোচনা হল, বলা বাহুল্য কেউ কাউকে নিজের মতে আনতে পারলেন না।

কবির নূতন কিছু লেখার প্রেরণা খুব কম; 'পূরবী' কাব্যের পর কবিতা লেখায় ছেদ পড়েছে। তাই পুরাতন রচনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

এই সময় কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে "প্রজাপতির নির্বন্ধ" অভিনয় করার কথা হয়। কবি সেটাকে 'চিরকুমারসভা' নাম দিয়ে নূতন করে পুরোপুরি নাটকাকারে লিখে দিলেন। কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটকটা খুব উৎরে গেল। কবি উপস্থিত ছিলেন প্রথম রাত্রির অভিনয়ে। অভিনয় দেখে খুব উৎসাহ হল; আরো দুটি নাটক লিখলেন— 'কর্মফল' গল্পটা ভেঙে 'শোধবোধ' আর সবুজপত্রে প্রকাশিত 'শেষের রাত্রি' গল্পটাকে অবলম্বন করে 'গৃহপ্রবেশ'। এ দুটিও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

এই-সব পুরোনো লেখা ভেঙে নাটক লেখা ছাড়া এ যুগের একটা রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বন্ধু কাইসার্‌লিঙ বিবাহ সম্বন্ধে একটা বই সম্পাদনা করছেন। ভারতীয় বিবাহের আদর্শ কী সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে দেবার অনুরোধ এসেছে কবির কাছে। তাই লিখলেন 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ', ইংরেজিতে অনুবাদ করে জর্মেনিতে পাঠিয়ে দিলেন; সেটা কাইসার্‌লিঙের Das Ehe Buch-এ জর্মান তর্জমায় বের হয়। সমস্ত বইটার ইংরেজিও প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় বিবাহের মধ্যে প্রেমের স্থান কী, নারীর স্থান কোথায় ইত্যাদি অনেক জটিল কথার আলোচনা করেছেন কবি। এই প্রবন্ধটার উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, কিছুকাল পরে কবি যে-দুটি উপন্যাস লিখলেন 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' আর 'মহুয়া' কাব্য তা এই প্রেমতত্ত্বেই প্রতিষ্ঠিত।

স্বরাজ্য-সাধনার সমস্যা নিয়েও লেখনী ধরতে হয়; লিখলেন 'চরকা' ও 'স্বরাজসাধন'। আজ থেকে ত্রিশ বৎসর পূর্বে লিখিত হলেও এবং দেশের অনেক পরিবর্তন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, এই প্রবন্ধ দুটির মধ্যে কবি যে-সব কথা বলেছিলেন তা এতকাল পরেও বাতিল হয়ে যায় নি। স্বরাজসাধন প্রবন্ধে

ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কবি যে কথাগুলি বলেছিলেন তা ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও, ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষিত হলেও, দেশের জনসাধারণ, এমন-কি দেশের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আজ পর্যন্ত কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেন নি। ধর্মবিদ্বেষের বিষবাষ্প ও কোলাহল আজও দেশের আকাশ বাতাসকে থেকে থেকে বিষিয়ে তুলছে।

১০৭

১৯২৫ সালের শেষ দিকে ইটালি থেকে কার্লো ফর্মিকি এলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হয়ে ; আর এলেন তরুণ অধ্যাপক জোসেফ তুচ্চি। সঙ্গে এল বহু শত মূল্যবান ইটালীয় গ্রন্থ— বইগুলি মুসোলিনীর দান। তুচ্চির বেতন ইটালীয় সরকারই বহন করলেন। এত বদান্যতা দেখে কবি তো মুগ্ধ! মুসোলিনীকে ধন্যবাদ দিয়ে টেলিগ্রাম করলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন নি মুসোলিনীর কবিপ্রীতি ও ভারতপ্রীতি কিজন্য।

ইটালিতে মুসোলিনী সর্বময় কর্তা। চার বৎসরে দেশের বিশেষ উন্নতি করেছেন সত্য, কিন্তু আপন শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ও একচ্ছত্র শাসন কায়েম করবার জন্য বহু দুষ্কার্যও করেছেন। রাজনৈতিক মতলবে খুন-খারাপির গোপন প্ররোচক বলে আন্তর্জাতিক বদনাম কিনেছেন যথেষ্ট। তাই দেশ-বিদেশের সাধু ব্যক্তিদের প্রশংসাপত্র খুঁজছেন।

ফর্মিকি বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রিত হয়ে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করতে এলেন— মুসোলিনীর ভারতপ্রীতি-প্রচারের সুযোগ মিলল।

ফর্মিকির শান্তিনিকেতনে আসার দিন তিন পরে সেখানে এলেন বাংলার গবনর লর্ড্ লিটন ; তিনি যাচ্ছিলেন সিউড়ির দরবারে, পথে শান্তিনিকেতনে নেমে কবির সঙ্গে দেখা করে গেলেন। এই ঘটনা নিয়ে জনৈক পত্রলেখক সংবাদপত্রে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। এই লাট-সমাগম কবির নিজের আকাঙ্ক্ষিত ছিল না, অযাচিত ছিল— এ কথা হয়তো তিনি ভাবেন নি।

এই বৎসর (১৯২৫) ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রথম ভারতীয় দর্শন-

সম্মেলন হল; সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক নন, এ কথা সর্বজনবিদিত। তৎসত্ত্বেও দর্শনশাস্ত্রীরা কেন রবীন্দ্রনাথকে এই পদের জন্য আহ্বান করলেন তার কারণ নিশ্চয়ই আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে দর্শন-শাস্ত্রের তরুণ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একখানি বই লেখেন, তার নাম দেন *The Philosophy of Rabindranath Tagore*— অর্থাৎ ধীমান্ অধ্যাপক স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের একটা নিজস্ব দর্শন আছে। সেই অধিকারে কবি দর্শনসম্মেলনের সভাপতি হলেন (১৯ ডিসেম্বর ১৯২৫)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণে উপেক্ষিত অজ্ঞাত ব্রাত্য জনতার ধর্মাদর্শের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে বলেন। ইতিপূর্বে জনতার ধর্ম নিয়ে কেউ এ ভাবে আলোচনা করে নি।

১১০

কবির আমন্ত্রণ এসেছে লখ্‌নৌ থেকে; সেখানে নিখিলভারত-সংগীত-সম্মেলন। উঠেছেন ছত্রমঞ্জিলে নবাবী আমলের প্রাসাদে। সেখানে খবর পেলেন শান্তিনিকেতনে তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে (১৮ জানুয়ারি ১৯২৬)। এই সংবাদ পেয়ে কবিকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হল। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর পূর্বে মারা গেছেন, সাংসারিক ও সামাজিক অনেক ব্যাপারের সুব্যবস্থা কবিকেই করতে হবে।

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবির আহ্বান এল; ফর্মিকি এবং তুচ্চিরও নিমন্ত্রণ হয়েছে। কবির সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কয়েকজন শিক্ষক চলেছেন—কারণ, কবি ঢাকা থেকে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি স্থানে ঘুরবেন। সে-সবের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁরা চলেছেন, কেউ কেউ আগেই গেলেন।

ঢাকায় কবি উঠলেন নবাব বাহাদুরের নৌকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির ভাষণের বিষয় ছিল *The Philosophy of Art*। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে কত সভায় যেতে হল— সর্বত্রই ভাষণ আর ভাষণ। ঢাকায় কবি কী সম্মানই পেয়েছিলেন! খ্যাতিলাভের পর পূর্ববঙ্গে তাঁর এই প্রথম ও এই শেষ পরিভ্রমণ।

ঢাকায় সাত দিন থেকে কবি ময়মনসিংহ গেলেন। সেখানে পাঁচ দিন কাটল, সভাসমিতির অন্ত নেই। এলেন কুমিল্লায়। তখন সেখানে অভয়-আশ্রমের কর্মীরা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমাজসেবা করে সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। কবি তাঁদের উৎসবে যোগদান করলেন, অভয়-আশ্রমের অন্যতম প্রধান কর্মী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন পূর্ববঙ্গের সকল শ্রেণীর লোকের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

কুমিল্লা থেকে আগরতলায় এলেন বহুকাল পরে। কিশোর-সাহিত্য-সমাজ থেকে কবির সম্বর্ধনা হল। এবার এখানে কবিকে মণিপুরী নৃত্য দেখাবার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল। কবি মণিপুরী পুরুষদের নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে একজন নাম-করা নৃত্যশিল্পীকে সঙ্গে করে ফিরলেন। সেই থেকে শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যের চল হল। সেখান থেকে ভারতের নানা স্থানে ছাত্রছাত্রীদের মারফত এই নৃত্যকলা ছড়িয়ে পড়েছে।

পূর্ববঙ্গের সফর শেষ করে কবি কলিকাতায় ফিরলেন ১৯২৬ সনের মার্চ মাসের গোড়ায়। এবার সফরের শেষ দিকে সুরের প্রেরণা নেমেছিল অবাধ অজস্রতায়। গানের ধারা সদাই বয়ে চলেছিল কবিজীবনে, কখনো প্লাবনে, কখনো অন্তঃশীল গতিতে।

১১১

পূর্ববঙ্গভ্রমণ শেষ করে কবি কলিকাতায় ফিরেছেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা দ্রুত মন্দের দিকে চলেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে খিলাফত আশ্রিত হিন্দু-মুসলমানের প্রেমের বাঁধ বুঝি টেঁকে না। কলিকাতায় হঠাৎ হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধল চৈত্র মাসের দারুণ গরমে (১৩৩২)। মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে আর্যসমাজীদের সঙ্গে কলহের সূত্রপাত, তারই পরিণতি সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামায়। ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হলে মসজিদের সামনে বা কাছাকাছি গান বা বাজনা বন্ধ করা একান্ত দরকার; হিন্দুর পক্ষে ঠিক সেই কারণেই বাজনা বাজানোটা হয় জরুরি। বিদেশী সরকার দুই পক্ষে বিবাদ করতে দেখে নিরপেক্ষতার ভাণ করে, আর দূরে থেকে ক্লাবে বসে ভারতীয়দের

স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিণতি নিয়ে হাসাহাসি করে।

কবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আছেন; স্বচক্ষে দেখছেন ভীতত্রস্ত দীন-দরিদ্র মুসলমানেরা প্রাণভয়ে তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছে। কবি এই-সব দেখে শুনে বিরক্ত হয়ে এক পত্রে লিখছেন, "এই মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো।... আজ মিছে ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটি ধর্ম, খাঁটি নাস্তিকতা পায়, তবে ভারত সত্যই নবজীবন লাভ করবে।" কয়েক দিন পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্মমোহ'-শীর্ষক কবিতাটিতে লেখেন:

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।

শান্তিনিকেতনে ফিরলেন; বর্ষশেষ এবং নববর্ষ (১৩৩৩) উদ্‌যাপিত হল। জন্মোৎসব উপলক্ষে আশ্রমবাসীরা 'কথা ও কাহিনী'র 'পূজারিনী' কবিতাটির মূকাভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন জেনে, কবি ঐটি নিয়ে নিজেই ছোটো একটি নাটিকা লিখে দিলেন, সেটি 'নটীর পূজা'। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর দিকে তাকিয়ে কবির মনে ভগবান বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার কথা মনে হচ্ছে। 'নটীর পূজা'য় সেইটি ব্যক্ত করলেন। জন্মদিনের সন্ধ্যায় অভিনয় হল; শ্রীনন্দলাল বসুর বালিকা কন্যা গৌরী নটীর ভূমিকায় নৃত্য করেছিলেন। কয়েক মাস পরে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে 'নটীর পূজা'র পুনরভিনয় হল। গৌরীর অতুলনীয় নৃত্যভঙ্গীতে কলিকাতার রসিকসমাজও মুগ্ধ হলেন।

পূর্বে বলেছি পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণের শেষে কবি গান লিখতে শুরু করেন; সেই ধারায় 'নটীর পূজা'র গানগুলিও এল। অন্যান্য গানগুলি 'বৈকালী' শিরোনামে প্রবাসী মাসিক পত্রে (আষাঢ়-কার্তিক ১৩৩৩) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এ গানের ধারার জের চলেছিল পরবর্তী য়ুরোপ-ভ্রমণ কালে। হস্তাক্ষরে মুদ্রিত কিন্তু বিরল প্রচারিত 'বৈকালী' গ্রন্থ তার সাক্ষ্য বহন করছে।

১১২

জন্মোৎসবের পরে কবি আবার য়ুরোপে চলেছেন। এবার যাচ্ছেন ইটালি। অধ্যাপক ফর্মিকি দেশে ফিরে গিয়ে কবিকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। কিন্তু কবির আপ্যায়নের ভার নিয়েছেন মুসোলিনী। অর্থাৎ, সরকারি নিমন্ত্রণ এল বেসরকারি লেফাফায়। কবি নিজেকে বিশ্বাস করালেন যে, আমন্ত্রণটা ফর্মিকির। তার পিছনে যে কালোছায়া আছে সেটা দেখেও দেখলেন না; খানিকটা ভ্রমণের নেশায়, খানিকটা পার্ষদদের উৎসাহে ইটালি যাওয়াই স্থির হল। কবিকে মুসোলিনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে দেখে অনেকে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিলেন; কাগজেও লেখালেখি হয়েছিল।

বোম্বাই থেকে ইটালীয় জাহাজে কবির জন্য ছয়টা কেবিনের ব্যবস্থা হয়েছে। সঙ্গী হলেন অনেকে—সস্ত্রীক রথীন্দ্রনাথ, গৌরগোপাল ঘোষ। সস্ত্রীক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পরের স্টিমারে গিয়ে কবিকে রোমে ধরেন। এবার য়ুরোপ-সফরে প্রশান্তচন্দ্র ও তাঁর পত্নী রানী দেবী (নির্মলকুমারী) কবির নিত্য সহায় ও সঙ্গী ছিলেন।

কবি নেপল্‌সে পৌঁছলে স্পেশাল ট্রেনে করে তাঁকে রোমে নিয়ে যাওয়া হল; রোমের সেরা হোটেলে সরকার থেকেই থাকার ব্যবস্থা। তাঁর স্থানীয় অভিভাবক ও দোভাষী হলেন অধ্যাপক ফর্মিকি, তাঁর কাজ হল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লোকেদের কবির কাছে ঘেঁষতে না দেওয়া আর কবির কাছে মুসোলিনীর মহিমা কীর্তন করা।

রোমে পৌঁছানো মাত্র সাংবাদিকের দল মৌমাছির মতো কবিকে ছেঁকে ধরল তাঁর মধুময় বাণীর কামনায়। কবি বললেন, আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি নে যে, যে দেশকে শেলী কীট্‌স্ বায়্‌রন গ্যেটে ব্রাউনিঙের কাব্যের মধ্য দিয়ে দেখা সেই দেশে সত্যই এসেছি।

মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা থেকে এবং রোমের নানা স্থান দেখে ফ্যাসিস্ট্ মতবাদের যে রূপটা কবির নিকট প্রকাশ পেল তার মধ্যে এমন-কিছু নিন্দনীয় দেখতে পেলেন না। কর্মক্ষেত্রে কল্যাণেচ্ছু স্বেচ্ছাচার আর দলাদলির নাগরদোলায় ঘূর্ণ্যমান লোকতন্ত্র—উভয়ের মধ্যে কোন্‌টা যে ভালো ও কাম্য সে বিষয়ে কবি মনস্থির করতে পারেন নি। তবুও

ভাসা-ভাসা ভাবে রোমে যা দেখলেন বা ফর্মিকি সাহেব তাঁকে যা দেখালেন ও বোঝালেন তার থেকে এটুকু সাব্যস্ত হল যে, স্বভাবশিথিল ইটালীয়দের উপর শাসন জবরদস্তির সঙ্গে চলছে; তাতে তারা সুখী কি অসুখী তা বোঝবার উপায় নেই, কারণ দেশের সাময়িক পত্রিকাগুলি ফাসিস্তদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে এটাও দেখলেন যে, দেশের জলুস অনেক বেড়েছে— তৎপরতাও। সাংবাদিকদের কাছে দুই-একটা কথা অস্পষ্টভাবে বললেন— সেটাই সরকারি আর আধা-সরকারি কাগজে ফলাও করে, রঙ চড়িয়ে, ভারতীয় কবির মুসোলিনী-প্রশস্তি-রূপে প্রচারিত হল। ইটালীয় ভাষায় কাগজপত্রে কী যে বের হচ্ছে তা ভালো করে জানার উপায় নেই, সঙ্গীদের মধ্যেও কেউ সে ভাষা জানেন না।

রোমে নানাভাবে কবির সম্বর্ধনা হল; এক বক্তৃতাসভায় মুসোলিনী ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের দল শ্রোতারূপে উপস্থিত হলেন। আর একদিন প্রাচীন রোমান সম্রাটদের সময়ে নির্মিত কলোসিয়ামে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার লোক জমায়েত হয়ে কবিকে সম্মান দেখাল।

চৌদ্দ দিন রোমে কাটল। রোম ত্যাগের দিন কবির বিশেষ অনুরোধে অধ্যাপক বেনেডেক্তো ক্রোচেকে নেপল্‌স্‌ থেকে এনে কবির সঙ্গে দেখা করানো হল। ক্রোচে ফ্যাসিস্ট্‌ নীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন বলে তাঁকে অধ্যাপনা থেকে সরিয়ে নেপল্‌সে নজরবন্দীর মতো রাখা হয়েছিল। ক্রোচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক জায়গায় খুবই মিল পাওয়া যায়; অধ্যাপকের নন্দনতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বিচারতত্ত্ব উভয়ই কবি ভালো ভাবে জানতেন।

রোমের পর ফ্লোরেন্স্‌ ও ট্যুরিন হয়ে কবি সুইসদের দেশে এলেন; সেখানে ভিলেন্যুভ পল্লীতে রোমাঁ্যা রোলাঁ বাস করেন। ভিলেন্যুভ গ্রাম হলেও সে স্থানটা ভাবুকদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। একটা ভালো হোটেলে কবি উঠলেন। কবি যে ঘরে উঠলেন সেই ঘরেই ভিক্‌তর হুগো নাকি বহুকাল বাস করেছিলেন; রোমাঁ্যা রোলাঁর বাড়ি অদূরে; তাঁর সঙ্গ-সম্ভাবনায় কবির পক্ষে স্থানটি আরো রমণীয় হয়ে উঠল। এই স্থানে কবি বারো দিন থাকলেন।

ইটালীয় কাগজপত্রে রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিস্ট্-প্রীতি ও মুসোলিনী-প্রশস্তি পাঠ করে রোলাঁ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইটালির আভ্যন্তরীণ সংবাদ রাখা সম্ভব নয় বুঝে রোলাঁ কবিকে সেখানকার আসল রূপটি বুঝিয়ে বললেন এবং যে-সব পলাতক অধ্যাপক ও মনীষী দেশত্যাগী হয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কবির মোহ ভাঙল।

কবির মন মোহাচ্ছন্ন হতে যতক্ষণ, মোহমুক্ত হতে তার থেকে বেশিক্ষণ লাগে না। এন্‌ড্রুজকে এক পত্র লিখে ইটালি ও মুসোলিনী সম্বন্ধে তাঁর মত জানালেন, পত্রখানা বিলাতে ম্যান্‌চেস্টার গার্ডেনে ছাপা হল। সেই পত্র পাঠ করে মুসোলিনী ও তাঁর উপগ্রহের দল রবীন্দ্রনাথের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন— চলল গালিবর্ষণ। অধ্যাপক তুচ্চিকে বিশ্বভারতী থেকে সরিয়ে নেওয়ার হুকুম এল। ভাগ্যে ভিলেন্যুভেতে কবির সঙ্গে রোলাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সময়মত তিনি তাঁর আসল মতটা ব্যক্ত করবার অবকাশ পেয়েছিলেন, নয়তো য়ুরোপীয় মনীষীসমাজে কবি কী বদনামেরই ভাগী হতেন!

১১৩

ভিলেন্যুভের মানসতীর্থে কবির সঙ্গে ফরাসী, জর্মান, কত দেশের কত মনীষীর দেখা হল। মন এখন বেশ প্রসন্ন; কিছুদিন খুব একটা অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়েছিলেন।

জুরিক ভিয়েনা ও প্যারিস হয়ে অবশেষে ইংলন্ডে এলেন; লন্ডন থেকে সোজা মোটরে করে চলে গেলেন ডেভন্‌সায়ারে টট্‌নেস গ্রামে। সেখানে গত বৎসর (১৯২৫) এল্‌ম্‌হার্স্ট্ ডারটিংটন হল নামে বাড়ি কিনে সেখানে একটি বিদ্যায়তন পত্তন করেছেন; শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের আদর্শে নূতন ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে হচ্ছে। এল্‌ম্‌হার্স্ট্ তাঁর আমেরিকান বান্ধবীকে বিবাহ করে বিপুল ধনের অধিকারী হয়েছেন; সেই অর্থ দিয়ে বহু হিতকর কাজ এখন করছেন।

ইংলন্ড্ থেকে কবি চললেন মধ্য য়ুরোপে—এটা তাঁর এ অঞ্চলে

দ্বিতীয় সফর। সঙ্গে আছেন প্রশান্তচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী রানীদেবী। রথীন্দ্রনাথ অসুস্থ বলে তাঁর সঙ্গে ঘুরতে পারছেন না।

নরওয়ে এলেন; গতবার সুইডেনে এসেছিলেন, নরওয়ে আসা হয়ে ওঠে নি। ইতিমধ্যে নরওয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে অধ্যাপক স্টেন কোনো'র মারফত; তিনি বিশ্বভারতীর তৃতীয় বিদেশী অধ্যাপক ১৯২৪-২৫ খৃস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে ছিলেন—লেভি ও বিন্টারনিটজের পরে ও ফর্মিকির আগে। কবিকে স্বদেশে আনবার জন্য তাঁর খুবই আগ্রহ। কবির নিজের আগ্রহও কিছু কম নয়। কারণ, নরওয়ের সাহিত্যিক ইব্সেনের নাটক তাঁর খুবই প্রিয় ছিল এবং ইব্সেনের প্রভাব কবির উপর পড়েছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস। সেই ইব্সেনের দেশও দেখা হল এবার।

অতঃপর সুইডেনে ও ডেন্মার্কে অল্প সময়ের মতো থেকে কবি চললেন মধ্যয়ুরোপ-ভ্রমণে। এই নিরন্তর ঘোরাঘুরির মধ্যে কোথা থেকে মনের ভিতর গান নেমে এল। পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণের সময় থেকে যে গানের পালা শুরু হয়েছিল, চার মাস স্তব্ধ থাকার পর হঠাৎ তারই নূতন উৎস্থতি। বল্টিক সাগর পার হবার সময় প্রথম গান লিখলেন। সে গান পদ্মার তীরে বা শান্তিনিকেতনের মাঠেও লেখা যেতে পারত; বৈদেশিক পরিবেশের কোনো প্রভাব তার কোথাও নেই। এখন থেকে বহু দিন ধরে চলল গান-রচনা।

হাম্বুর্গ্, বর্লিন, ম্যুনিক, ন্যুর্ন্বার্গ্, স্টুট্গার্ট্, ড্যুসেল্ডর্ফ, কত স্থানে ঘুরলেন। বক্তৃতা সর্বত্রই করছেন, অসংখ্য লোকের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে—তারই মধ্যে চলছে গান-রচনা। কবিমনের এ কী বিবিক্ত আনন্দ ও স্বচ্ছতা!

এর মধ্যে সংসারের দুর্ভাবনাও আছে। রথীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে বর্লিনের নার্সিংহোমে পড়ে আছেন; তিনি কাউকে না জানিয়ে একটা কঠিন অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। কবি তাঁকে দেখতে গেলেন; রথীন্দ্রনাথকে একটু সুস্থ দেখে চললেন চেকোস্লোভাকিয়ায়। রাজধানী প্রাগে পাঁচদিন ছিলেন; সেখানে তাঁর বিশেষ সহায় হলেন বিশ্বভারতীর এককালীন অধ্যাপক বিন্টারনিট্জ্ ও অধ্যাপক লেস্নী।

কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে?
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে॥
তারি বাণী দু হাত বাড়ায়
শিশুর বেশে,
আধো ভাষায় ডাকে তোমায়
বক্ষে এসে।
তারি ছোঁওয়া লেগেছে এই
কুসুম বনে॥

কোথায় ফিরিস ঘরের লোকের অন্বেষণে?
পর হয়ে সে দেয় যে দেখা ক্ষণে ক্ষণে।
তার বাসা সে সকল ঘরের
বাহির দ্বারে।
তার আলো সে সকল পথের
ধারে ধারে,
তাহারি রূপ গোপনরূপে
জনে জনে॥

প্রাগ
১২ অক্টোবর

হৃতসর্বস্ব অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা হয়ে যখন হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্টে পৌছলেন তখন কবির শরীর সহ্যশক্তির শেষ সীমানায়। এই বয়সে এত ঘোরাঘুরি সহ্য হবে কেন। তবু বক্তৃতা দিলেন। অবশেষে ডাক্তারদের পরামর্শে বাধ্য হয়ে বালাটন হ্রদের তীরে স্বাস্থ্যনিবাসে আশ্রয় নিলেন। এখানে এ যাত্রার শেষ গানগুলি লিখলেন। সেখানে কবি একটি চারাগাছ রোপণ করেন; লোকের সযত্ন রক্ষণায় সেটি এখনো জীবিত আছে।

বালাটনে এসে হাতে আর ভারী কাজ নেই; প্রশান্তচন্দ্রের ব্যবস্থায় 'লেখন' ও 'বৈকালী' নিজের হাতের অক্ষরে ছাপাবার জন্য লিখলেন— প্রথম বইটি কবির জীবিতকালে কিছু প্রচারিত হয়েছিল, দ্বিতীয়টি (প্রবাসীতে মুদ্রিত 'বৈকালী' থেকে অভিন্ন নয়) আরো অল্প সংখ্যায় পাওয়া গিয়েছিল কবির দেহত্যাগের বহু বৎসর পরে।

শরীর একটু ভালো বোধ করতেই চললেন যুগোশ্লাবিয়ায়। বেল্‌গ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ে দু দিন বক্তৃতা দিলেন। অতঃপর বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় বক্তৃতা করে রুমানিয়ার বুখারেস্টে পৌছলেন। এখানে পাঁচ দিন কাটল রাজা ও রাজপরিবারের লোকেদের আপ্যায়নে আর সাহিত্যিক-মহলের ভোজসভায় ও মজলিশে। কিছুমাত্র বিরাম বিশ্রাম নেই।

বুখারেস্ট্ থেকে কৃষ্ণসাগরের এক বন্দরে এসে জাহাজে চড়লেন। ইস্তাম্বুলের ঘাটে পৌছে জাহাজ দুদিন থাকল। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রণ এল। কিন্তু শরীর এত ক্লান্ত যে জাহাজ ছেড়ে নামতেই ইচ্ছা হল না; সঙ্গীরা ইস্তাম্বুল বেড়িয়ে এলেন।

গ্রীসের পিরাস বন্দরে নেমে এথেন্সের উপর একবার চোখ বুলিয়ে এলেন; গ্রীক সরকার কবিকে তাঁদের রাজকীয় একটা উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন।

এথেন্স্ থেকে মহলানবিশ-দম্পতি কবির কাছে বিদায় নিলেন। তাঁরা য়ুরোপে আরো ঘুরবেন। কবি ফেরার মুখে মিশরের বন্দর আলেক্‌জেন্দ্রিয়াতে একবার নামলেন ও সেখান থেকে রাজধানী কাইরোয় গেলেন।

কাইরোতে এক সম্বর্ধনাসভায় মিশরীয় সংগীতের জলসা হল। কবির মনে হচ্ছে, আরব-পারস্যের গানের রাগরাগিণীর একটা জ্ঞাতিত্ব কোথাও আছে। পূর্ব-এশিয়ায় ভারতের ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতির অনেক কিছুই গিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে এমন-কিছু পায় নি যা স্মরণীয়। কিন্তু পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারত শুধু যে ধর্ম পেয়েছিল তা নয়, পেয়েছিল শিল্পকলা সংস্কৃতি ও সংগীতের অনেক ঠাট—কাইরোতে সংগীত শুনে কবির সে-সব কথা মনে হচ্ছে।

কাইরোতে বিখ্যাত ম্যুজিয়মে প্রাচীন মিশরের কীর্তিকলাপ অতি সযত্নে রক্ষিত। জাদুঘরে এই-সব কীর্তিস্মৃতি দেখে কবি লিখছেন, মনে মনে ভাবি যে, বাইরে মানুষ সাড়ে তিন হাত, কিন্তু ভিতরে সে কত প্রকাণ্ড! মিশরের রাজা ফুয়াদ একদিন কবিকে আপ্যায়িত করলেন ও বিশ্বভারতীর জন্য অতি মূল্যবান আরবী গ্রন্থরাজি কবিকে উপহার দিলেন।

ফেরবার পথে সুয়েজ বন্দরে দেশের চিঠিপত্র পেলেন, তার মধ্যে সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ ছিল। আশ্রমপ্রতিষ্ঠার দিন থেকে তিনি এর সঙ্গে ছাত্ররূপে এবং শিক্ষকরূপে যুক্ত ছিলেন; কবির একনিষ্ঠ ভক্তদের অন্যতম ছিলেন সন্তোষচন্দ্র।

১১৪

য়ুরোপে সাত আট মাস কাটিয়ে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন পৌষ-উৎসবের মুখে (১ ডিসেম্বর ১৯২৬)। এবার বিদেশে থাকতে গান লিখেছেন আর শেষকালে লিখেছেন ‘পত্রধারা’। ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ গ্রন্থে সংকলিত সেই চিঠিগুলি লেখেন শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে; তাঁর সেবা যত্ন কবিকে মুগ্ধ করেছিল এবারের য়ুরোপ-ভ্রমণ-কালে। দেশে ফিরে দেখেন শান্তি নেই। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-আশা মরীচিকা-মাত্র—কোথায় গেল ১৯২১ সালের সৌহার্দ স্বপ্ন! বড়োদিনের সময় গৌহাটিতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছে; নেতারা সকলেই সেখানে উপস্থিত। দিল্লিতে সেই সময়েই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক মুসলমান যুবকের গুলিতে নিহত হলেন। যে দিল্লিতে পাঁচ বৎসর পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের

মিলন-উৎসব উপলক্ষে জুমা মসজিদের চত্বর থেকে এই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ উভয় সম্প্রদায়ের কাছে মিলনমন্ত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন সেখানেই তিনি বুকের রক্ত ঢেলে দিলেন। এই হচ্ছে রাজনীতি, ধর্মের উপরেও যার স্থান! কিছুদিন পূর্বে স্বামীজি শান্তিনিকেতনে ঘুরে গিয়েছিলেন; কবি তখন দেশে ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের কাছে এক ভাষণে বললেন, মুসলমান-সমাজ ঈশ্বরের নামে যখন সধর্মীদের ডাক দেয় তখন তারা সাড়া দেয়, জমায়েত হয়; কিন্তু হিন্দু যখন ডাকে তখন হিন্দু তাতে সাড়া দিয়ে কাছে আসে না। "যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ ক'রে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে— কেউ বাধা দিতে পারে না।" দেশব্যাপী উত্তেজনার মুখে কবি দেশবাসীকে শান্তভাবে সমস্যাসমাধানের জন্য চিন্তা করতে বললেন।

রাজনীতির উত্তেজনা কখন মন থেকে মুছে গেল, মন রসরূপের সৃষ্টিতে নিবিষ্ট হল— কলিকাতায় 'নটীর পূজা'র অভিনয় করালেন। হিংসায় উন্মত্ত দেশে বুদ্ধের বাণী শোনাবার উপযুক্ত নাটক এখানি, কিন্তু শোনে কে। সাধারণ মানুষের কাছে নিত্যধর্মের চেয়ে গুরুতর হল দলগত ধর্ম বা দলাদলি।

'নটীর পূজা'র অভিনয় ঘটনাটি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদের সূচনা করল। কলিকাতার জনগণের সম্মুখে এই বোধ হয় প্রথম যখন কোনো ভদ্রগৃহস্থ ঘরের কন্যা ও বধূ নৃত্যকলার সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হল।

নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী সদ্যবিবাহের পর নটীর ভূমিকায় নামলেন। সেদিন থেকে বাঙালি মেয়েদের শৃঙ্খলিত পদযুগলে নূপুর নিক্বণের ধ্বনি নৃত্যের তালে উন্মুখরিত হল।

'নটীর পূজা'র অভিনয়ের পর এক সময় কবি মগ্ন হলেন নটরাজের ধ্যানে; লিখলেন 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'। ষড়্‌ঋতুর আনন্দরূপ ও প্রকাশ ছিল এই কবিতা ও গানের বিষয়। এর পর আরম্ভ করলেন ঋতুরঙ্গশালার আসল নট নটী তরুলতার বন্দনা— 'বৃক্ষবন্দনা'য় তার সূত্রপাত। একে

একে বহু তরুলতা ও পুষ্পের পৃথক্ পৃথক্ বন্দনা চলল। এই কাব্যগুচ্ছ 'বনবাণী'তে সংকলিত হয় পরে।

১১৫

শান্তিনিকেতনের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জীবনে আবার বাধা পড়ে। ভরতপুরে হিন্দিসাহিত্যসম্মেলন; রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি হবার জন্য আমন্ত্রণ নিয়ে ভরতপুরের মহারাজ কিষণ সিংহের দূত এল। চৈত্র মাসের দারুণ গরমেও কবি যেতে স্বীকৃত হলেন। ভরসা, বিশ্বভারতীর জন্য মহারাজের কাছ থেকে যদি কিছু পাওয়া যায়। এবার (১৯২৭) কবির সঙ্গে চলেছেন কবির জীবনীকারও।

ভরতপুরের রাজপ্রাসাদেই কবির স্থান করে দেওয়া হয়। হিন্দি-সাহিত্য-সম্মেলন একটা বিরাট ব্যাপার, কত হাজার লোক যে সমবেত হয়েছিল বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণ ইংরেজিতে দিলেন। হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করবার কথা ইতিপূর্বে উঠেছে; তাই কবি বললেন, ভাষা কেবল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের তাগিদে 'রাষ্ট্রীয়' হয় না, সাহিত্যের দিক থেকেও তার যোগ্যতা দেখাতে হবে।

ভরতপুরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি কবিকে দেখানো হল। শহর থেকে দূরে বিশাল এক জলাশয় বা বিলের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম বলে কবিকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। জলে নানা জাতের অসংখ্য পাখি কলরব করছে; ভালোই লাগছে সবটা দেখে। কিন্তু হঠাৎ দেখেন একটা ফলকে কোন্ জঙ্গীলাট বা কোন্ সাহেব ক হাজার ক'রে পাখি মেরেছেন তার তালিকা। এই দেখে কবির মন এত ব্যথিত হল যে তিনি তদ্দণ্ডেই সে স্থান ত্যাগ করলেন। পাখি মারার বিরুদ্ধে আদিকবির অমর বাণী রামায়ণে প্রথম ঘোষিত হয়েছিল। জমিদার রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রথম নোটিশ জারি হয় সেও এই বিষয়ে। তাঁর জমিদারির এলাকায় কোনো শিকারী, এমন-কি কোনো রাজকর্মচারি, পাখি মারতে পেত না।

ভরতপুর থেকে জয়পুর হয়ে কবি অহমদাবাদে আসেন। এখানে অম্বালাল সারাভাইদের বাড়িতে কয়েকদিন আরামে রইলেন। কিন্তু

সভাসমিতির অন্ত নেই ; নানা জায়গায় নানা বক্তৃতা। সারাভাইদের বাড়িতে থাকতেই রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে অধ্যাপক টম্‌সন-লিখিত সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থ কবির হাতে পড়ল। বইখানি পড়ে তাঁর আদৌ ভালো লাগে নি। একখানি পত্রে তাঁর অসন্তোষ প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়' ছদ্মনামে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। টম্‌সন সাহেবের গ্রন্থে ভুল ছিল, অশিষ্টতাও কিছু কিছু ছিল— তৎসত্ত্বেও এ কথা বলব যে, টম্‌সন রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর সমস্ত মন্তব্য 'বিদ্যামন্নতা' ও উন্নাসিকতা বলে অগ্রাহ্য করা যায় না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান বা বোধ তাঁর যথোচিত ছিল না, খৃস্টান হিসাবে বা ইংরাজ হিসাবে কতকগুলি বদ্ধমূল সংস্কারও ছিল— হয়তো লেখকের অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ পেয়েছিল জাতিগত আত্মাভিমান।

অহমদাবাদ্‌ থেকে আগ্রা হয়ে ১১ই এপ্রিল শান্তিনিকেতনে ফিরলেন ও যথাসময়ে বর্ষশেষ এবং নববর্ষের (১৩৩৪) উৎসব করলেন।

১১৬

গ্রীষ্মাবকাশে কবি কলিকাতায় এলেন। উদ্দেশ্য, শিলঙ যাবেন। ইতিমধ্যে প্রবর্তক-সংঘের আহ্বানে চন্দননগরে তাঁদের বার্ষিক উৎসবে যেতে হল।

অম্বালাল সারাভাইয়ের একান্ত ইচ্ছায় কবি শিলঙ গেলেন ; সারাভাইদের বাড়ির পাশেই কবির জন্য একখানি বাড়ির ব্যবস্থা হয়।

শিলঙে এবার জনসভায় বক্তৃতা করতে হয় নি ; আপন মনে একটা উপন্যাস লিখছেন। 'বিচিত্রা' নামে নূতন পত্রিকা মহা আড়ম্বরে আষাঢ় মাস থেকে প্রকাশিত হবে— গল্পটা সেই পত্রিকার জন্য লিখছেন। আসলে গল্পটা বিচিত্রার জন্য ততটা নয় যতটা কবির নিজের জন্য অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজনে। তবে তার চেয়ে বড়ো তাগিদ রয়েছে ভিতরে— নবনবোন্মেষ-শালিনী প্রতিভার নূতন আত্মপ্রকাশের। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনের সেই প্রয়োজন আজও অনিঃশেষ। 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নরনারীর যৌনসমস্যা পূর্ণ যে-সব কথা মনে

হয়েছিল, সেগুলি উপন্যাসের মধ্যে এসে গিয়েছে। নূতন আখ্যায়িকার প্রথম নাম হয় 'তিনপুরুষ', পরে হয় 'যোগাযোগ'।

১১৭

চীন থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত কবির মনে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতভূমির পরিচয় -লাভের জন্য খুব একটা ঔৎসুক্য দেখা দেয়। সে-সব দ্বীপ ও দেশের সঙ্গে ভারতের যে যোগ ছিল তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সে দেশ সম্বন্ধে নূতন করে তথ্য সংগ্রহ করা জরুরি। এক কালে সেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়; এখনো বর্মা থেকে কম্বোডিয়া পর্যন্ত ভূভাগে বুদ্ধের ধর্ম জীবন্ত। কবির ইচ্ছা, যেমন করে চীনদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগ সম্বন্ধে বিশ্বভারতীতে গবেষণা চলছে তেমনি বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের পথও তিনি উন্মোচন করেন। এই বৃহত্তর ভারতকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায়, জানবার আগ্রহে, কবি চললেন মালয় জাভা ও বলি দ্বীপে। দানবীর যুগলকিশোর বিড়লা এবারও কবি ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যয়ভার বহন করলেন, যেমন চীন-ভ্রমণের সময় করেছিলেন।

কবির সঙ্গে চললেন অধ্যাপক বাকে ও তাঁর পত্নী। এঁরা ডাচ, কিছুকাল যাবৎ শান্তিনিকেতনে আছেন, রবীন্দ্রসংগীত ও প্রাচ্য সংগীত সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণা করছেন। আর চললেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর ও শিল্পীছাত্র ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। মালয় উপদ্বীপে কবি প্রথমে যাবেন বলে আরিয়াম উইলিয়াম্‌স্ তাঁর অগ্রদূত হিসাবে আগেই যাত্রা করে গেছেন। (আরিয়াম এখন গান্ধীপন্থী সুপরিচিত দেশসেবক আর্যনায়কম। ইনি দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন, মূলতঃ ইনি সিংহলী-তামিল।) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কবির সঙ্গে চলেছেন শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুনীতিবাবু রবীন্দ্রনাথের এই সফরের আনুপূর্বিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে। এমন তথ্যপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী আর কেউ লেখেন নি, আর সেগুলি সমকালীন রচনা বলে তার মূল্যও বেশি—স্মৃতি মন্থন করে লিখিত গ্রন্থ থেকে এর স্থান অনেক উঁচুতে।

১৯২৭ খৃস্টাব্দের ২১শে জুলাই তারিখে কবি সদলবলে সিঙাপুরে পৌছলেন। বাকে-দম্পতি চলে গেলেন যবদ্বীপে কবির অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে। সে দেশ তখন ডাচ্‌দের অধীন।

সিঙাপুরে কবির পাঁচ-ছয় দিন কাটল—কত সভা, কত বক্তৃতা, কত অপরিচিতের সঙ্গে নিত্য নূতন পরিচয়। সিঙাপুরের ভারতীয়েরা অধিকাংশই শ্রমজীবী। তাদের দেশ হিন্দুস্থান থেকে এক অভিজাত সর্বজনমান্য ব্যক্তি এসেছেন এই খবর পেয়ে সকলে ভিড় করে এল কবিকে দেখতে। কবির সেই সৌম্যমূর্তি পরিণত বার্ধক্যের সৌন্দর্যে অতুলনীয়, তা দেখে তারা মুগ্ধ—আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

সিঙাপুর থেকে মালয় উপদ্বীপে। মালয়বাসীরা অধিকাংশই মুসলমান; দেশীয় সুলতানদের শাসনাধীন অনেকগুলি ছোটো ছোটো রাজ্য, ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে চালিত। দেশের আসল মালিক রবার-বাগিচা আর টিন-খনির মালিক শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ। ভারতীয়, চীনা ও মালয়দেশীয়রা তাদের বাগিচার এবং খনির কুলি-মজুর এবং মুষ্টিমেয় কেরানি।

মালাক্কা বন্দরে নামার পর থেকে শুরু হল মালয়-উপদ্বীপ-পরিক্রমণ। দিন ছাব্বিশ ঘুরলেন শহর থেকে শহরে, ট্রেনে, মোটরে। এরই মধ্যে লিখছেন জাভাযাত্রীর পত্রধারা। একখানি পত্রে লিখছেন, "ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। দিনের মধ্যে দুই তিন রকমের প্রোগ্রাম। নতুন নতুন জায়গায় বক্তৃতা নিমন্ত্রণ ইত্যাদি।… চলেছি উজান বেয়ে গুণ টেনে, দাঁড় বেয়ে, পদে পদে জিব বেরিয়ে পড়ছে।… পথ সুদীর্ঘ, পাথেয় স্বল্প; অর্জন করতে করতে গর্জন করতে করতে, হোটেলে হোটেলে ডলার বর্জন করতে করতে, আমার ভ্রমণ—গলা চালিয়ে আমার পা চালানো।"

মালয়দ্বীপের রবার-বাগিচা এবং খনির মালিকেরা এতকাল ভারতকে জানত সস্তায় কুলি-সংগ্রহের স্থান। সেখান থেকে একজন কেউ এসে দেশময় এত সম্মান পাচ্ছে এটা ঐ ইংরেজ ধনীদের সহ্য হল না। কবির নামে তারা দুর্নাম রটাতে আরম্ভ করল। তার কড়া জবাব দিল দক্ষিণ-ভারতীয় এক তরুণ সাংবাদিক। ইংরেজ পত্রিকাওয়ালারা কিভাবে কবির লেখা বিকৃত ক'রে, তার কদর্থ প্রচার ক'রে কবিকে হীন প্রমাণ করছিল,

ছেলেটি মূল রচনা খুঁজে বার করে ছাপিয়ে দিতেই সকলে চুপ করল।

মালয় থেকে চললেন যবদ্বীপ হয়ে বলিদ্বীপে। বলিদ্বীপের ভালোমত বিবরণ পাই কবির 'জাভাযাত্রীর পত্র' থেকে। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই সুনীতিকুমারের 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে। বলিদ্বীপে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি অত্যন্ত বিকৃত হলেও এখনো বেঁচে আছে। এক কালে মালয় ও পাশের দ্বীপগুলি হিন্দুভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল; এখন তার একমাত্র চিহ্ন রয়েছে বলিদ্বীপে। কবি ভাবছেন কী ভাবে ভারতের সঙ্গে বলিদ্বীপের এই লুপ্ত আত্মিক সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায়। মালয় ও ইন্দোনেশিয়া দূরপ্রাচ্য ও ভারতের সংযোজক। সম্ভবতঃ আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কোনো ভারতীয় এই-সব দেশ ও দ্বীপের সঙ্গে ভারতের যোগ-স্থাপনের উদ্দেশে সেখানে যান নি; এ যুগের রবীন্দ্রনাথ যেমন চীনের সঙ্গে ভারতের সংযোগের পথিকৃৎ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগস্থাপনের ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী।

বলিদ্বীপ থেকে কবি ও তাঁর সঙ্গীরা এলেন যবদ্বীপে। বলিদ্বীপ যাবার পূর্বে বাটাভিয়ায় (বর্তমান জাকার্তায়) কয়দিন থেকে গিয়েছিলেন; এবার এলেন ভালো করে ঘুরে দেশটাকে দেখতে।

যবদ্বীপের বন্দর সুরবায়া থেকে যাত্রা শুরু হল। শূরকর্তায় সে দেশের সব চেয়ে বড়ো রাজপরিবারের বাস; রাজারা এখন হৃতসর্বস্ব হলেও হতশ্রী হন নি, জাভানী সংস্কৃতিকে তাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখানে কবি দেখলেন জাভানী নৃত্য; কবিকে মুগ্ধ করল সে নৃত্যের নিজস্ব ভঙ্গী। রাজবাড়ির মেয়েরাও যে নৃত্যের অনুশীলন করেন তার সব কাহিনী মহাভারত রামায়ণ থেকে নেওয়া—এখন যদিও এরা মুসলমান তাতে এদের ধর্মে বাধে না। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির বিরোধ এরা কল্পনা করে নি। এরা পিতৃপুরুষের কৃতিত্ব বা সভ্যতাকে অস্বীকার বা অশ্রদ্ধা করে না—এখনো মন দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত শোনে; তার পুতুল নাচ, ছায়াছবি, যাত্রা-গান সারারাত জেগে দেখে; ছেলেমেয়েদের বড়ো বড়ো সংস্কৃত নাম দিয়ে থাকে; অথচ মসজিদেও যায়, নমাজও পড়ে, হজ করতেও দলে দলে আরব দেশে যায়।

যোগ্যকর্তা শহরেও তিন দিন কাটালেন। এখান থেকে সকলে মিলে দেখতে গেলেন বরবুদর মন্দির। বৌদ্ধযুগের এতবড়ো স্থাপত্যসৃষ্টি ভারতেও নেই। ডাচ পণ্ডিত একজন সঙ্গে ছিলেন, ভালো করে সব-কিছু কবিকে বুঝিয়ে দিলেন। বরবুদর সম্বন্ধে একটা কবিতা লেখেন; তার ইংরেজি ডাচ ও জাভানি তর্জমা সাময়িক-পত্রে বের হয়েছিল।

তিন সপ্তাহ যবদ্বীপে থেকে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিন কবি সিয়াম যাত্রা করলেন। জাহাজে থাকতে লিখলেন 'সাগরিকা' কবিতাটি— ভারতের সঙ্গে দ্বীপময় ভারতের সাংস্কৃতিক লেন-দেনের সুদীর্ঘ ইতিহাস আর আজ সেটি পুনরুজ্জীবিত করে তোলার মনোগত ইচ্ছা বা অভিলাষ, সবই একটি সুন্দর রূপক কাহিনীর ছলে বলা হয়েছে।

সিয়ামে বাংকক ছাড়া আর কোথাও যাওয়া হয় নি। রাজা ও রাজ-পরিবার থেকে যথেষ্ট সম্মান পেলেন।

এবার ফেরবার পালা; জাহাজে বসেও কবিতা লেখা চলছে। এই সময়ের অধিকাংশ কবিতা 'পরিশেষ' কাব্যে সংগৃহীত হয়েছে।

১১৮

মালয় ও পূর্বদ্বীপাবলীতে ভ্রমণ করে সাড়ে তিন মাস পরে দেশে ফিরলেন (২৭ অক্টোবর ১৯২৭)। দেশে ফিরে দেখেন মালয়-যাত্রার পূর্বে রচিত ও 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে সাময়িক সাহিত্যে বেশ একটি বাদ-প্রতিবাদের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্ট হয়েছে। এ কয় মাসে যা ঘটেছে এবং যা ঘটে নি তার অনেক বার্তা শোনেন বান্ধব ও ভক্ত মহল থেকে। এ সময়ের পত্রিকাদিতে সাহিত্যের সুরুচি ও কুরুচি নিয়ে সাহিত্যিকগণ পরস্পরের উদ্দেশে বিস্তর মসীক্ষেপণ করছিলেন। কবি তাতে একেবারে নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না; কিছু কালীর ছিটে তাঁর গায়েও লেগেছিল।

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। কবি রবীন্দ্রনাথের মন ডুবেছে সুরের সুরধুনীতে। 'ঋতুরঙ্গশালা'র অনেক অদল-বদল ও সংযোজন করে 'ঋতুরঙ্গ' নাম দিয়ে সেটি গীতাভিনয়ের উপযুক্ত করলেন; কলিকাতায় অভিনয় হল। এবারকার নৃত্যকলায় জাভানী নাচের ও জাভানী সাজসজ্জার প্রভাব বেশ স্পষ্ট ভাবে

দেখা দিল। রঙ্গমঞ্চের রূপায়ণেও জাভানী প্রভাব ছিল। এ-সবের রূপকার ছিলেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। পরে বাংলা শৌখিন অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে তার অনিবার্য প্রভাব দেখা গিয়েছে।

কবির জাভা-যাত্রার আর একটি প্রত্যক্ষ ফল— এ দেশে বাটিক (বার্তিক ?) শিল্পের প্রবর্তন। কবির বলি-যবদ্বীপ-ভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ এই বিদ্যাটি আয়ত্ত করে এসে কলাভবনে সেটির প্রচলন করেন; কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যস্থতায় ক্রমশ ভারতের নানা স্থানে এই বস্ত্ররঞ্জনের কাজ ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরে বসে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের একটা ভালো আয়ের পন্থা খুলে গেছে।

কবির দিন কাটে কখনো শান্তিনিকেতনে, কখনো কলিকাতায়। যোগাযোগ উপন্যাসটি লিখে চলেছেন। লোকে ভেবেছিল, কবি যোগাযোগে অবিনাশ ঘোষালের তিন পুরুষের কাহিনী শোনাবেন; শোনাবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। কিন্তু বয়স বাড়ছে। ভাবছেন কোনো শান্ত অবকাশে অনন্যমনা হয়ে কুমুদিনী-অবিনাশ-আখ্যানের বৃত্তটি সম্পূর্ণ করে দেবেন— কিন্তু, সে অবকাশ পান নি। এ কথাও মনে হয় যে, কবির পক্ষে এই মর্মন্তুদ কাহিনীর সৃজনবেদনা বহন করে চলা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তবে বর্তমান আকারেই 'যোগাযোগে'র শিল্পমূল্য কিছু অল্প নয়; মনে হয়, কবির নানা উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি না হলেও এটি যে শ্রেষ্ঠ-সম্ভাবনা-পূর্ণ সৃষ্টি সে বিষয়ে দ্বিমত হবে না।

১১৯

কথা হচ্ছে পুনরায় বিলাত যাবার— সেখানে অক্‌স্‌ফোর্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ এসেছে 'হিবার্ট্‌ বক্তৃতা' দেবার জন্য। এ সম্মানের আহ্বান এ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় কেন, কোনো প্রাচ্যদেশবাসীই পান নি। তাই বিলাত যাচ্ছেন।

মাদ্রাজ থেকে জাহাজ ধরবার জন্য, ঐ পথে চললেন। সঙ্গে আরিয়াম উইলিয়াম্‌স্‌। সে সময়ে সস্ত্রীক প্রশান্তচন্দ্র যাচ্ছেন য়ুরোপ-ভ্রমণে; কবির সঙ্গী হলেন। পথে কবির শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ল; মাদ্রাজে নেমে

গিয়ে আদৈরে কয়দিন বিশ্রাম করলেন। তার পরে কুন্নুরে পিঠাপুরম মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করে কয়েকটা দিন কাটল। এখনো বিদেশযাত্রার আশা ত্যাগ করেন নি ; ঠিক করলেন মাদ্রাজ থেকে জাহাজে করে কলম্বো গিয়ে য়ুরোপগামী কোনো জাহাজ ধরবেন।

পথে পণ্ডিচেরির কাছে জাহাজ থামে ; সেখানে শ্রীঅরবিন্দ থাকেন। কবি তাঁকে দেখতে গেলেন ; বোধ হয় বিশ বৎসর পর দেখা হল। অগ্নিযুগের বিপ্লবী আজ অধ্যাত্মলোকের ঋষি। সাধারণতঃ তিনি মৌনী, নির্দিষ্ট দিন ছাড়া কাউকে দেখাও দেন না। রবীন্দ্রনাথের বেলায় সে নিয়ম তিনি ভঙ্গ করলেন। কবি লিখছেন, "অরবিন্দকে দেখে ভারি ভালো লাগল— বেশ বুঝতে পারলুম নিজেকে ঠিকমত পাবার এই ঠিক উপায়।"

কলম্বো পৌঁছলেন ; কিন্তু শরীর ভালো যাচ্ছে না। শেষকালে বিলাত যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করতে হল। দিন দশ কলম্বো থেকে মহীশূরের বঙ্গলুরে চলে এলেন। সেখানে তখন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। কবি এখানে বসে 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' শেষ করলেন (২৮ জুলাই ১৯২৮) ; আর লিখছেন নূতন প্রেমের কবিতা— সমকালীন অন্যান্য কবিতার সঙ্গে 'মহুয়া' কাব্যে সংকলিত।

কবি এখানে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের শেষ দিকটা লিখছেন ; কিন্তু সে কাহিনীকে আর তিনপুরুষ পর্যন্ত ঠেলে চালানো অসম্ভব। কুমুদিনীর জীবনের ট্র্যাজিক ঘটনাবলী থেকে মন মুক্তি খুঁজছিল। মনের সেই রিলিফ্ পেলেন 'শেষের কবিতা' লেখা শুরু করে। এখানে আর-এক সুর, আর-এক তাল। খরধার আলাপ, হাস্য-পরিহাস, কবিত্ব এবং মাধুরী। প্রেমের দ্বন্দ্ব আছে, আন্দোলন আছে, কিন্তু কারো জীবন ট্র্যাজেডিতে গিয়ে আছড়ে পড়ে নি। 'শেষের কবিতা'য় শেষ পর্যন্ত সব কয়টির জোড় মিলিয়ে দিব্য বিবাহ দিয়েছেন : কবিকে এক প্রহসন ছাড়া এমন করে আর কোথাও কাহিনী শেষ করতে দেখা যায় নি।

১২০

মাদ্রাজে সিংহলে ও মহীশূরে প্রায় মাস দুই কাটিয়ে কবি শান্তিনিকেতনে

ফিরেছেন বর্ষার মুখে। বসে বসে কোনো-একটা খেয়ালের কাজ করতে ইচ্ছা করছে এই 'রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়'—গুন গুন করে গান করতে কিংবা সৃষ্টিছাড়া ধরণের ছবি আঁকতে। কিন্তু ক্লান্তি-ভরা কুঁড়েমির ডিগ্রিটা অতটুকু কাজ করারও নীচে।

ক্লান্তি দূর হয়ে গেল যেমনি স্থির হল যে, বর্ষামঙ্গলকে নূতন রূপ দিতে হবে 'বৃক্ষরোপণ' অনুষ্ঠান করে। গ্রামের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন দেশের জঙ্গল ও গাছপালা প্রায় সাফ হয়ে আসছে, অথচ নূতন গাছ পোঁতবার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাগিদও নেই। বিশেষতঃ বীরভূমে ও রাঢ় অঞ্চলে বৃক্ষাভাবে মাটির কঙ্করময় কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। এই সমস্যার দিকে তাকিয়ে কবি স্থির করলেন একটা আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৃক্ষরোপণের প্রথা গ্রামে গ্রামে চালু করবেন। 'বৃক্ষবন্দনা' তো পূর্বেই করেছেন, নানা বৃক্ষ সম্বন্ধে কবিতাও লিখেছেন, এবার উৎসব-উপযোগী কবিতা লিখলেন ও মন্ত্রাদি বাছাই করলেন। মহা আড়ম্বরে বৃক্ষরোপণোৎসবের অনুষ্ঠান হল (১৪ জুলাই ১৯২৮)। উৎসবের অঙ্গ ছিল তরু-শিশুর সঙ্গে বালিকাদের শোভাযাত্রা—"সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল।" এই নৃত্যশীলা মেয়েদের উৎসবসম্ভার নিয়ে শোভাযাত্রা করতে বলিদ্বীপে দেখেছিলেন ; সেইটি ভারতীয় পরিবেশে কবি নূতন রূপ দিলেন। আজ ভারতবর্ষময় বনমহোৎসবের দিন এই ভাবেই পালিত হচ্ছে।

পরদিন শ্রীনিকেতনে হল হলকর্ষণ বা সীতাযজ্ঞ। এই উৎসবে কৃষি-প্রশংসা পাঠ করলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ও হলচালনা করলেন কবি স্বয়ং। আজকাল ভদ্রলোকে হলচালনা করে না, হলধররা সমাজে নিচু। অথচ জনক রাজা চাষ করতেন, সে দিনের সমাজে সেটা পথিকৃতের যোগ্য কাজ এবং প্রশংসনীয় ছিল।

১২১

১৯২৮ খৃস্টাব্দে রথীন্দ্রনাথেরা য়ুরোপ ভ্রমণে গেছেন। কবি একা পড়লেন। কলিকাতায় কিছুকালের জন্য আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে'র বাসায়

উঠলেন ; বিরাট বাড়ি, আরামেই আছেন। মুকুলচন্দ্র অধ্যক্ষ হয়ে কয়েক দিন এখানে এসেছেন।

কাব্যানুরাগী বন্ধুজনের অনুরোধে কবি তাঁর প্রেমের কবিতার একটা সঞ্চয়ন শুরু করলেন, বিবাহাদি ব্যাপারে উপহার দেবার মতো। তৈরি হলো 'রাখি' নামে সঞ্চয়ন। বহু বৎসর পূর্বে শিশুদের জন্য পুরানো কবিতা সংকলন করতে করতে যেমন নূতন 'শিশু' কাব্যের সূত্রপাত হয়েছিল, এবারও তাই হল। প্রেমের কবিতা বাছতে বাছতে প্রেমের প্রহেলিকা-রাজ্যে হৃদয়-মন কখন আবিষ্ট হল ; 'যোগাযোগ' 'শেষের কবিতা' লিখতে লিখতে প্রেমের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, 'শেষের কবিতার' মধ্যে তা ক্ষণে ক্ষণে লিরিকের মূর্তি পেয়েছিল ; সেই ধারাতেই 'মহুয়া'র কবিতাগুলি লিখলেন। কবির বয়স এখন আটষট্টি। এই কবিতাগুচ্ছে 'কড়ি ও কোমল' বা 'মানসী'র তাজা প্রেমের উত্তাপ বা প্রত্যক্ষতা আশা করা যেতে পারে না, তবে এগুলির মধ্যে এমন একটি গভীর ঐকান্তিকতা আছে যা আবার যৌবনের কবিতায় পাওয়া যায় না।

শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন। কবি নিজে রোজ সকালে আপিস করেন। তখন বিশ্বভারতীর সংসদ থেকে পুনর্গঠন পরিকল্পনা নিয়ে কমিটি বসেছে। দারুণ অর্থসংকটের দিন। রথীন্দ্রনাথরা য়ুরোপ সফর থেকে এখনো ফেরেন নি ; বিদ্যালয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজকর্ম কবিকেই দেখতে হচ্ছে। উপায় নেই।

দিন যায় এই ভাবে। কিন্তু একঘেয়ে রুটিনের কাজ কতদিন করতে পারেন। কানাডা থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে, বাঁধা কাজের শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পেলেন। সেখানকার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন নামে এক প্রতিষ্ঠান, তিন বৎসর পরে পরে তাঁরা এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এক-একবার এক-এক ধরণের শিক্ষাসমস্যা নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। এবার রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা শিক্ষা ও অবকাশ সম্বন্ধে ভাষণ দেবার জন্য আহ্বান করলেন। রবীন্দ্রনাথ যে একজন শিক্ষাশাস্ত্রী— বিদেশে তার প্রথম স্বীকৃতি হল এই উপলক্ষে। এর পর ১৯৩০ সালে ইংলন্ডের শিক্ষাবিষয়ক অধ্যাপক ফিন্‌ডলে তাঁর *Foundations of Education* নামে বিরাট গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করেন ; এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি জন ডিউইর সঙ্গে কবির তুলনা করেন। জন ডিউই পাশ্চাত্য জগতের সেরা শিক্ষাশাস্ত্রী। শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে কবির স্থান যে কত উচ্চে তা আমরা জানতে পারি এই অধ্যাপকের গ্রন্থ থেকে।

কানাডা-যাত্রার সঙ্গী হলেন অধ্যাপক টাকার্ (Tucker), অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ আর তরুণ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। টাকার্ সাহেব আমেরিকান-মিশনারি— তখন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, মেথডিস্ট্ চার্চ তাঁর খরচ দেন। অপূর্বকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ; পরে বাংলা সরকারের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর হন। সুধীন্দ্রনাথ কবির বন্ধু ও বিশ্বভারতীর হিতৈষী পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র, উদীয়মান মনস্বী কবি।

প্রশান্ত মহাসাগরের পথে যেতে হবে— কারণ, সম্মেলন হচ্ছে ভাংকু-বারে। জাপান হয়ে কানাডায় চলেছেন, টোকিওতে দিন দুই থেকে গেলেন (মার্চ ১৯২৯)।

কানাডায় পৌঁছে দেখেন মার্কিন যুক্তরাজ্য ঘুরতে ঘুরতে এনড্রুজ ভাংকুবারে এসে গেছেন।

কবি কানাডায় মোট দশ দিন ছিলেন। 'অবকাশতত্ত্ব' ছাড়া সাহিত্য বিষয়ে অন্য বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। সে সময়ে কানাডার বড়োলাট ছিলেন উইলিংডন— কবির সঙ্গে পরিচয় হয়। ইনি পরে ভারতের বড়োলাট হয়ে আসেন।

কানাডা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার ইচ্ছা ছিল। অনেক স্থান থেকে নিমন্ত্রণ এসেছিল। কিন্তু লস্ এন্‌জেলেসের শুল্কবিভাগের কর্মচারীদের অদ্ভুত আচরণে বিরক্ত হয়ে জাপানে ফিরে এলেন, সেখানে এক মাস থাকলেন। জাপানের ভক্তদের অনুরোধে তাদের হাত-পাখায় বা কাগজের রুমালে যে-সব 'কণিকা' লিখে দিতেন, তা পরে ছাপা হয় 'ফায়ারফ্লাইস' নামে। জাপান থেকে ফেরবার পথে ইন্দোচীনের সাইগন শহরে দিন তিন কাটিয়ে এলেন ; এখানকার যাদুঘর ইন্দোচীনের শিল্পকলার সংগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধ ; সেটি কবি ভালো করে দেখলেন। এই বয়সেও দেখবার, জানবার, বোঝবার আগ্রহ তাঁর বালকের মতো।

১২২

কানাডা জাপান ইন্দোচীন ভ্রমণ করে যখন শান্তিনিকেতনে ফিরলেন (জুলাই ১৯২৯) তখন তার অবারিত প্রান্তরে বর্ষা নেমেছে। কিন্তু মনের মধ্যে 'এমন দিনে তারে বলা'র মতো স্বর খুঁজে পাচ্ছেন না। এতদিন কবি সঙ্গের অভাব অনুভব করেন নি— আপনার মধ্যে আপনার খাসদরবার জমত। ক্রমে শরীরের দুর্বলতার সঙ্গে বুঝতে পারছেন তাঁর চিত্তলোকে আলোক কমে আসছে। অবসর সময়ে ছবি আঁকেন— রূপে ও রঙে মিশিয়ে সে খেলা। বৃদ্ধ বয়সে ছবির বেশ নেশা ধরেছে— সারা দুপুরবেলা বসে বসে ছবি আঁকছেন তো আঁকছেনই।

একপত্রে লিখছেন, "রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল।"…"কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবে ও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পর… ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে। আমি যে-সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উল্টা প্রণালী, রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌছতে থাকে মাথায়। এই রূপ-সৃষ্টির বিষয়ে মন মেতে ওঠে।" কিন্তু মন নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পারছে না বলে ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ জমছে।

এমন সময়ে খবর পেলেন কলিকাতায় গগনেন্দ্রনাথদের তত্ত্বাবধানে 'রাজা ও রানী' অভিনয়ের তালিম চলছে। এই উপলক্ষে কবি নাটকটিতে কিছু পরিবর্তন করেন; 'ভৈরবের বলি' নামে তার অভিনয় হয়। এই পরিবর্তনেও সন্তুষ্ট না হয়ে 'রাজা ও রানী' নাটকটি নূতন করে লিখে দিলেন 'ভৈরবের বলি' নাম দিয়ে। সেটা শেষ পর্যন্ত পছন্দ হল না; কবির বিশ্বাস, তাঁর যৌবনের প্রথম নাটক 'রাজা ও রানী' ঠিকমত নাটক হয়ে ওঠে নি; তার অনেক ত্রুটি কবির চোখে আজ চল্লিশ বৎসর পরে ধরা পড়ছে। সেজন্য নূতন করে লিখতে গিয়ে যা হল তা 'রাজা ও রানী'র নূতন সংস্করণ নয়, নূতন বই 'তপতী'। এটা লিখলেন গদ্যে। গদ্যে লেখার কারণ সম্বন্ধে, কবি লিখেছেন:

"নেড়া ছন্দে 'ব্ল্যাংক ভার্স'-এ নাটক লেখা থেকে গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। সাহিত্যে পদ্যটা প্রাচীন, গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠেছে—

… গদ্যরচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত।… ভাষা এখন সাবালক হয়েছে, ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝাবে বাঁধা ছন্দ।" ইহা ছন্দোবদ্ধ নাটক ও নাট্যকাব্য রচনার অক্ষমতার কৈফিয়ৎ কি না জানি না। গ্যেটে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ফাউস্ট-এর উত্তরার্ধ লেখেন, রবীন্দ্রনাথকে সেরূপ কোনো বৃহৎ সৃষ্টির মধ্যে দেখা যায় না।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চার দিন 'তপতী'র অভিনয় হল। রবীন্দ্রনাথ রাজা বিক্রমের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ের নাট্যমঞ্চ-পরিকল্পনায় বৈশিষ্ট্য ছিল যথেষ্ট, দৃশ্যপট টাঙিয়ে মানুষের মন ভোলাবার সস্তা উপায় বর্জিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে, "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রব ; ওটা ছেলেমানুষি।"

এখানে আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবান্তর একটা ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করছি। বিষয়টা হচ্ছে এই, এবার জাপানে বাসকালে কবি একজন বিখ্যাত জাপানী জুজুৎসু-বীরকে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক-রূপে আমন্ত্রণ করে আসেন। কবির একান্ত ইচ্ছা আত্মরক্ষার জাপানী কসরৎটা বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা, বিশেষভাবে মেয়েরা, আয়ত্ত করে। মেয়েদের উপর উপদ্রব হলে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে না এই বেদনা থেকেই কবি জুজুৎসু-শিক্ষককে বহু টাকা ব্যয় করে আনলেন। কিন্তু দেশবাসী সেটা গ্রহণ করল না ; বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষও সেটাকে কোনো পাকা ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারলেন না। যদি দেশ এটাকে গ্রহণ করত, তবে হয়তো ১৯৪৬-৪৭ সালের অনেক মর্মন্তুদ ঘটনা না-ও ঘটতে পারত। বহু দুর্বৃত্ততা হয়তো কতকটা শমিত থাকত।

১২৩

বরোদার মহারাজা সায়জিরাও গায়কাবাড় বিশ্বভারতীকে কয় বৎসর থেকে (১৯২৫ থেকে) ছয় হাজার করে টাকা দিয়ে আসছেন। মহারাজা প্রায়ই য়ুরোপে থাকেন ; এবার দেশে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথকে তাঁর রাজধানীতে আপ্যায়ন করেন এবং তিনি একটা বক্তৃতাও দেন। সংবাদটা নিমন্ত্রণ-রূপেই এল, কিন্তু কবির ভালো লাগছে না। এক পত্রে লিখছেন,

"বরোদায় গিয়ে একটা বক্তৃতা দিতে হবে এই আদেশ। বাঁধা আছি রাজদ্বারে রুপোর শৃঙ্খলে— বিশ্বভারতীর খাতিরে মাথা বিকিয়ে বসেছি।… একটুও ভালো লাগছে না।" তবু ভালো লাগাতেই হল।

১৯৩০ সালে জানুয়ারির শেষে বক্তৃতা। পৌষ-উৎসবের কিছু পরেই কবি অহমদাবাদে চললেন; সেখানে দিন পনেরো থাকলেন অম্বালালদের বাড়িতে। সেখানে যেমন নিরালা, তেমনি অকৃত্রিম যত্ন পান। বক্তৃতার পূর্বদিন বরোদায় পৌঁছলেন (২৬ জানুয়ারি); সেখানে তিনি রাজ-অতিথি।

কবি যখন বরোদায় সে সময়ে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন। কবি সভাপতি হবেন ঠিক আছে। সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হচ্ছে ২রা ফেব্রুয়ারি। সভায় উপস্থিত হতে পারবেন না বুঝেই রবীন্দ্রনাথ বরোদা থেকে 'পঞ্চাশোর্ধ্বে' নামে একটি ভাষণ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলিকাতায়। কিন্তু সভা কবিকে চেয়েছিল, তাঁর ভাষণ শুধু নয়। অনেকেই বিরক্ত হলেন। ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত খবর শুনলেন; রামানন্দবাবুকে এক পত্রে লিখলেন— "শুনলুম ডাক-পেয়াদার মারফতে না গিয়ে অবনের [অবনীন্দ্রনাথ] মারফতে লেখাটা যাওয়াতে তাঁরা [কর্তৃপক্ষ] অসম্মানের ক্ষোভে লেখাটার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এ-সকল বিষয়ে আমার বুদ্ধির ত্রুটি আছে, কিন্তু কাউকে অসম্মান করবার কারণ ও ইচ্ছা আমার ছিল না। এত ক্লেশ করে আমার জীবনে আর কোনোদিন লিখি নি।"

১২৪

১৯৩০ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের শেষ য়ুরোপ-ভ্রমণ। মার্চের গোড়ায় কবি সপরিবারে বিলাত চললেন— রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও তাঁদের পালিতা কন্যা। সেক্রেটারি হয়ে চলেছেন আরিয়াম। রথীন্দ্রনাথ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় শেষকালে সঙ্গে নিতে হল ডাক্তার সুহৃদ চৌধুরীকে। এই বিরাট বাহিনী নিয়ে কবি চললেন ইংলন্ড্।

এবার যাচ্ছেন অক্স্ফোর্ডে হিবার্ট্ বক্তৃতা দেবার জন্য। ১৯২৮ সালে

এই বক্তৃতা দেবার জন্য প্রথম আহ্বান এসেছিল, সেবার অসুস্থতা হেতু যেতে পারেন নি। হিবার্ট বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া এবার এই সফরের আর-একটা উদ্দেশ্য ছিল, কবি তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী করতে চান য়ুরোপে। গত কয়েক বৎসর ধরে কবি বহু ছবি এঁকেছেন। সে ছবি কোনো পদ্ধতি অনুসারে আঁকা নয়, কোনো বিশেষ স্কুলের বিশেষ ভঙ্গী তাতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কবির নিজস্ব টেক্‌নিক, মৌলিক রূপকল্পনা— খানিকটা মিল আছে য়ুরোপের অত্যাধুনিক উদ্‌ভট রূপ-স্রষ্টা শিল্পীদের কাজের সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত, আর্ট্-ক্রিটিক্‌রা তা নিয়ে সাধ্যমত চুল-চেরা বিশ্লেষণ করুন। আমরা এটুকু বলতে পারি যে, তাঁর ছবির মধ্যে এমন একটা মৌলিকতা আছে যা পাকা আর্টিস্টেরও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে থাকতে পারে না। না দেখে অন্যমনস্ক ভাবে পাশ কাটাতে কেউ পারবে না, দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, ভাবতে হবে— তার পর যার যা খুশি সমালোচনা করতে পারে। কবির ইচ্ছা য়ুরোপে সেই ছবির প্রদর্শনী করেন। তাঁর বিশ্বাস এ-সবের গুণাগুণের যাচাই সেখানেই হতে পারে। কারণ, য়ুরোপে বাঁধাধরা-পথে-চলা চিত্রশিল্পী ছাড়া অনেক অদ্ভুত খেয়ালী আর্টিস্ট্ আছেন এবং তাঁদের কলাচাতুর্য বোঝেন এমন লোকেরও অভাব কখনো হয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতে তাঁর ছবির কোনো প্রদর্শনী না করে সরাসরি প্যারিসে চললেন, সেখানে ছবির প্রদর্শনী করবার জন্য। য়ুরোপ থেকে এক পত্রে লিখছেন, "আমার এই শেষ কীর্তি এই দেশেই রেখে যাব।"

দক্ষিণ ফ্রান্‌সের মন্টি কার্লোর নিকট কাপ্ মার্তাঁ নামে ছোটো এক শহরে দানপতি কাহ্‌নের একটি বাড়ি ছিল, কবি সেখানে উঠলেন; রথীন্দ্রনাথেরা সুইস দেশে গেলেন হাওয়া বদলাতে।

ফ্রান্‌সে পৌঁছবার পর মাসাধিক কালের চেষ্টার প্যারিসে চিত্রপ্রদর্শনী হল। এর ব্যবস্থা করেন কঁতেস ছ্যনোআই, প্যারিস-সমাজের শীর্ষস্থানীয়া প্রভাবশালিনী রমণী। আর, অজস্র অর্থব্যয় করলেন আর্জেন্টিনার 'বিজয়া'— ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, কবি যাঁকে 'পূরবী' উৎসর্গ করেছিলেন। প্যারিসে

ঘর পেলেই প্রদর্শনী করা যায় না, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, অর্থব্যয়ও করতে হয় প্রচুর। কোনো বিষয়ে কোনো ত্রুটি করলেন না 'বিজয়া'। কবিকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন— এ তারই অর্ঘ্য মাত্র।

প্যারিসে সমারোহে কবির জন্মোৎসব করলেন তাঁর ফরাসী বন্ধু ও ভারতীয় ছাত্রমণ্ডলী। তার পর কবি ইংলন্ডে গেলেন (১১ মে ১৯৩০)। লন্ডনে না থেকে সোজা চলে গেলেন বার্মিংহামের শহরতলী উড্‌ব্রুকে, কোয়েকার খৃস্টান সমাজের আশ্রয়ে। তাঁদের পরিচালনাধীন সেলিওক কলেজ আছে এখানে। উডব্রুকে আছেন সস্ত্রীক অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। অমিয়চন্দ্রকে এখানে পেয়ে কবি খুবই খুশি। কারণ, লেখালেখির ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে প্রচুর সহায়তা পাবেন। তা ছাড়া কথাবার্তা বলেও আরাম পান।

ইতিমধ্যে ভারতে গান্ধীজির দ্বিতীয় দফা আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। ১৯৩৫ সালে ভারত-শাসনের নূতন সংবিধান রচিত হবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে, তার জন্যও তোড়জোড় চলছে। কমিটি, কমিশন অনেক বসেছে— গত দশ বৎসরের দ্বৈরাজ্য শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে। গান্ধীজির দাবি পূর্ণ স্বরাজের। তাই আবার, কেবল নিষ্ক্রিয় অসহযোগ নয়, এবার সক্রিয় আইন-অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করেছেন। আইন-অমান্যের প্রথম দফা কাজ হল লবণ-আইন-ভঙ্গ। সে যুগে লবণের ব্যবসায় ছিল গবর্মেণ্টের খাসে; লবণ তৈরির উদ্দেশ্যে সমুদ্রের জলে কেউ হাত দিতে পারত না। এই আইন-ভঙ্গ করবার জন্য গান্ধীজি কয়েকজন বাছা বাছা সাকরেদ নিয়ে দাণ্ডী যাত্রা করলেন (৬ এপ্রিল ১৯৩১); সেখানে জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের দিন (১৩ এপ্রিল) স্মরণ করে লবণ-আইন ভঙ্গ করলেন।

গবর্মেন্ট্ চণ্ডনীতি অবলম্বন করে এক মাসের মধ্যে গান্ধীজি, জওহরলাল ও আরো অনেককে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরলেন। এটা চলছে পশ্চিম ভারতে, বোম্বাই প্রদেশে।

ভারতের অপর প্রান্ত থেকে খবর এল বাঙালি বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে। তার পরেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে গেল

ঢাকায়। চট্টগ্রামেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। গবর্মেন্টের পক্ষ থেকে দাঙ্গা-দমনের লোক-দেখানো প্রচেষ্টা চলে, অথচ হিন্দুর ধনসম্পত্তি দিবালোকে লুঠপাট হতে থাকে, কোনো সুরাহা হয় না। পশ্চিম ভারতে সোলাপুরে শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি দেখা দিল; তিনজন বিশিষ্ট বংশের যুবককে তার প্ররোচক ঠাউরিয়ে, সামরিক আদালতের সরাসরি বিচারে তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হল।

এই-সব সংবাদ রবীন্দ্রনাথ পেলেন ইংলন্ডে বসে। তিনি তখনই ম্যান্‌চেস্টার গার্ডিয়ান ও স্পেক্‌টেটর পত্রিকায় ভারতের অবস্থা ও ব্রিটিশ শাসকদের ব্যবহার সম্বন্ধে পত্র-প্রবন্ধে নিজমত ব্যক্ত করলেন। গান্ধীজির সঙ্গে কবির যতই মতভেদ থাক্, বিদেশের কাগজ-পত্রে বা সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে কবি তা প্রকাশ করতেন না— গান্ধীজির নেতৃত্বের মধ্যে যে আদর্শবাদ রয়েছে তার পূর্ণ সমর্থন করতেন। দেশের দিকে তাকিয়ে তিনি গান্ধীজির অহিংসার তত্ত্বই ব্যাখ্যা করলেন। আর দেশবাসীর উদ্দেশে বলে পাঠালেন যে, ভারতকে আজ এই কথা মনে রাখতে হবে— সে যেন বীরের ন্যায় আপনার ধর্মরক্ষা করে এবং অত্যাচারের প্রতিবাদে কোনো অনাচার যেন না করে।

কোয়েকারদের বার্ষিক সভায় কবির আহ্বান এল কিছু বলবার জন্য। কবি ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তদানীন্তন অবস্থার কথা যা বললেন তা নিয়ে সভায় বেশ বাদ-প্রতিবাদ চলল, এটা কোয়েকার-সভার নিয়ম— যার মনে যা আছে তা খোলাখুলি ভাবে বলবার স্বাধীনতা প্রত্যেক সদস্যের আছে। কবি স্পষ্ট করেই শেষকালে বললেন যে, আপনারা আজ আমাদের অবস্থায় পড়লে কী করতেন তাই ভেবে ভারত সম্বন্ধে বিচার করবেন। আমরা দেশের সেবা করতে চাই, এ বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা চাই; পৃথিবীতে কোনো জাতির পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভব নয়, পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতাই হচ্ছে সভ্যতার আদর্শ। তাই বলে অধীনতায় থাকাও সম্ভব নয়।

উড্‌ব্রুকে কবির দিনগুলি মোটের উপর আনন্দে ও আরামেই কেটেছিল।

অক্স্‌ফোর্ডে হিবার্ট্ বক্তৃতাগুলি কবি মে মাসে পাঠ করলেন; কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল মানবধর্ম। (পরে এই একই তত্ত্ব নিয়ে, 'মানুষের ধর্ম' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেছিলেন।) মে-জুন মাস দুটো ঘোরাঘুরিতে কেটে গেল, শেষ কয়দিন ডার্টিংটন হলে এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌দের অতিথি হয়েছিলেন।

১২৫

ইংলন্ড থেকে এলেন জর্মনিতে; গত কয় বৎসরের মধ্যে সে দেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯২১ বা ১৯২৬ সালের জর্মনি আর ১৯৩০ খৃস্টাব্দের জর্মনির মেজাজের মধ্যে অনেক তফাত। জর্মানদের মধ্যে বিশ্বজাতীয়তার ভাবটা প্রথম দিকে দেখেছিলেন, সেটা পরাভূত জাতির সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র। সে উদার দৃষ্টি এখন প্রায় লোপ পেতে বসেছে। য়ুরোপের সকল জাতির কাছ থেকে খোঁচা খেয়ে খেয়ে এরা ভিতরে ভিতরে উগ্র জাতীয়তাবাদীই হয়ে উঠেছে। অবস্থার পেষণে এদের শক্তি যেন দুর্দম হয়ে উঠেছে। সময়টা হিট্‌লারের আবির্ভাবের সূচনাপর্ব।

বর্লিনে পৌঁছনোর পরদিন (১২ জুলাই ১৯৩০) জর্মনির পার্লামেণ্টে বা রাইখ্‌স্টাখে প্রধান মন্ত্রী ডক্টর ব্রূলিং ও অন্যান্য সদস্যগণের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হল। কয়দিন পরে সাক্ষাৎ হল অধ্যাপক আইন্‌স্টাইনের সঙ্গে। এবারকার সফরে এটাই বোধ হয় বিশেষ ঘটনা। তখনো ইহুদী অপবাদে আইন্‌স্টাইন্‌কে দেশ ছেড়ে পালাতে হয় নি। কয়েক মাস পরে আমেরিকায় গিয়েও কবির সঙ্গে আইন্‌স্টাইনের আবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

বর্লিনে কবির চিত্র-প্রদর্শনী হল; এর ব্যবস্থা করলেন জর্মান মহিলা ডক্টর সেলিগ। এই বিদুষী মহিলা কয়েক বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে কিছুকাল ছিলেন। ইতিপূর্বে প্যারিসে পেয়েছিলেন যেমন ভিক্‌টোরিয়াকে, এখানে তেমনি ডাঃ সেলিগ। এমন-কি, কাজে কর্মে এঁকে বেশি তৎপর বলে কবির মনে হচ্ছে। কবি লিখেছেন যে, এ-সব স্থলে মেয়ে-বন্ধু পেলেই সব চেয়ে কাজে লাগে। সে সৌভাগ্য কবি চিরজীবন লাভ করেছিলেন। ডাঃ সেলিগ ভারতে আসেন ও শান্তিনিকেতনে কিছুকাল থেকেও যান।

বর্লিন থেকে ম্যুনিকে এলেন। সেখান থেকে একদিন মধ্যয়ুরোপের বিখ্যাত প্যাশন-প্লে বা যিশুখৃস্টের জীবনের শেষ পর্বের অভিনয় দেখতে এক গ্রামে গেলেন। দশ বৎসর অন্তর এই উৎসব হয়ে আসছে ১৬৪৩, অব্দ থেকে। দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক আসে দেখতে। সারাদিন কবি উৎসব দেখলেন, যদিও সবই জর্মান ভাষায় হচ্ছে। খৃস্টের আত্মত্যাগের ভাবটি তাঁর মনের মধ্যে বসে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে কবিকে এক চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী কিছু লিখে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। এই প্যাশন-প্লে দেখে কবির মনে যে গভীর রেখাপাত হয়, তার স্পষ্ট প্রভাব পড়ল *The Child* কথিকাটিতে। মূলতঃই ইংরেজিতে লেখা হয়, এটি বোধ হয় কবির সেরূপ একমাত্র রচনা। দেশে ফিরে 'শিশুতীর্থ' নাম দিয়ে তার রূপান্তর করেন। আলোর সন্ধানে নেতা চলেছেন— অনুগামীরা চলতে চলতে সংশয়ী বা অবিশ্বাসী হয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জনতা নেতাকে হত্যা করল। তার পরেও, সেই নিহত নেতার অলক্ষ্য নির্দেশের অনুসরণে অতিদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে সকলে এক পর্ণকুটীরে পৌঁছে নবজাত শিশুর মধ্যে মানবজাতির চির-অন্বেষণের ধন যে, তাকেই দেখল;— যার সম্পর্কে বেদে বলা হয়েছে— সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্ণবঃ। ইনি সনাতন, ইনিই অদ্য পুনর্ণব।

জর্মনি-ভ্রমণে অমিয়চন্দ্র কবির সঙ্গী; তিনি এক পত্রে লিখছেন, "সম্রাটের মতো জরমেনি পরিক্রমণ করেচি— শ্রেষ্ঠ যা-কিছু আপনিই আমাদের কাছে এসে পড়ছে। পৃথিবীতে কোথাও রবীন্দ্রনাথকে এদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে ভাবতে পারি না।" অমিয়চন্দ্র ধীমান হলেও কবি; তাই বুঝতে পারেন নি যে, ভিতরে ভিতরে আগুন ধোঁওয়াচ্ছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই হিট্‌লারের হুকুমে জর্মেনিতে রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়— কেননা, রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী, শান্তিকামী, বিশ্বজনীনতাকে স্বাজাত্যাভিমান থেকে বড়ো স্থান দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ নাৎসি যুবকদের অপাঠ্য। যা হোক, ম্যুনিক থেকে বর্লিন হয়ে ডেন্‌মার্কের এলসিনোর শহরে এলেন। 'নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ' নামে নূতন এক

প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে য়ুরোপের নানা দেশ থেকে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা এখানে এসেছেন; রবীন্দ্রনাথও আমন্ত্রিত।

এল্সিনোর থেকে কোপেন্হাগেন হয়ে বর্লিনে এলেন; এখানে এণ্ড্রুজ কবির সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। সকলে মিলে স্থইস দেশের জেনেভা শহরে পৌছলেন ১৯৩০ সালের আগস্টের মাঝামাঝি। জেনেভাতে 'লীগ অব নেশনস্'-এর বিরাট কার্যালয়— বিশ্বজাতীয়তার উদ্যম সংঘীভূত। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কবির আস্থা কম; এর স্থচনাকালে বলেছিলেন, এ প্রতিষ্ঠান তস্করদলের সমবায় (a league of robbers)। আজও দেখছেন এতে ঠিক স্থর বাজে নি, এবং তাঁর ধারণা—হয়তো বাজবেও না। তবু কবির বিশ্বাস, এই জেনেভাতে যাঁরা বিশ্বপ্রাণ তাঁরা স্বেচ্ছায় এসে মিলিত হবেন।

জেনেভায় থাকতে থাকতে স্থির হল রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়ায় যাবেন। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে একবার ইচ্ছা হয়েছিল; বহু বাধা পেয়ে সে যাত্রায় যাওয়া হয় নি। কিন্তু এবার তিনি কৃতসংকল্প। আর, কবির একবার কিছুতে ঝোঁক পড়লে, তাঁকে নিবৃত্ত করতে বড়ো কেউ পারত না। অবশেষে অমিয় চক্রবর্তী, ডাঃ হ্যারি টিম্বার্স্ ও আরিয়াম্কে নিয়ে কবি ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে মস্কো রওনা হলেন।

১২৬

মস্কো পৌছলে তাঁকে স্বাগত জানালেন অধ্যাপক পেট্রোফ; ইনি বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগরক্ষা-সমিতির সভাপতি। সেদিন সন্ধ্যায় মস্কোর লেখকগোষ্ঠীর ও পূর্বোক্ত সমিতির সদস্যেরা মিলে কবির জন্য কন্সার্টের ব্যবস্থা করলেন। এখানে সোভিয়েট আর্টস্ একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক কোগান, মস্কো দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পিন্কেভিচ্, মাদাম লিংবিনোব, ফেরা ইন্বার, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফেদর গ্লাদ্কোভ্ প্রভৃতি বহু লেখক-লেখিকার সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হল। কয়দিন পরে পাওনীয়ার কম্যুনে গিয়ে সেখানকার কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন, 'জনগণমন' জাতীয় সংগীত শোনালেন। আর-একদিন গেলেন কেন্দ্রীয় কৃষক-

আবাসে, চাষীদের সঙ্গে অনেক প্রশ্নোত্তর হল— কবি বিস্মিত হলেন নানা বিষয়ে তাদের আগ্রহ দেখে।

মস্‌কোর স্টেট্ ম্যুজিয়ামে কবির চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছে। কবি দেখতে গেলেন; ত্রেতিয়াকোফ আর্ট্‌গ্যালারির অধ্যক্ষ অধ্যাপক ক্রিস্‌টি কবিকে স্বাগত জানিয়ে সমবেত জনতার কাছে বললেন, "রবীন্দ্রনাথকে আমরা দার্শনিক কবি বলেই জানতাম, আর তাঁর ছবি তাঁর একটা খাম-খেয়ালির ব্যাপার বলেই জানা ছিল; কিন্তু আজ তাঁর ছবি দেখে বিস্মিত হয়েছি।"[১]

রাশিয়ায় কবির শেষ ভাষণ প্রদত্ত হল ২৪শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে, ট্রেড-ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় গৃহে। সোভিয়েট কবি শিংগলী রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটি কবিতা পড়লেন; সাহিত্যিক গল পেরিন কবির তিনটি কবিতার রুশ তর্জমা আবৃত্তি করলেন, আর অভিনেতা সিমোনোভ্ কবির 'ডাকঘর'এর অনুবাদ থেকে পড়লেন। পরদিন ২৫শে সেপ্‌টেম্বর কবি মস্‌কো থেকে বর্লিনে ফিরে এলেন।

মস্‌কো থেকে নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে এলেন। আমেরিকার পথে এক পত্রে লিখছেন, "এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীর ভাবে অনেক কথা ভাবিয়েছে। প্রচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিঘ্ন আছে সেটা বেশ স্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছি।" তিনি পরিষ্কার বললেন, "নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে— তার চেয়ে বড়ো কথা সামনে এসেছে।" কবি ভাবছেন নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গরিব প্রজাদের উপর আর চাপাবেন না; তাই লিখছেন, "এ কথা আমার অনেক দিনের পুরানো কথা। বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়— আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি।... কিন্তু দেখলুম জমিদারি-রথ সে রাস্তায় গেল না।" আর-একটি পত্রে লিখছেন, "দেশের ইতিহাসে অনেক কিছু উলটপালট হবে। জীবনযাত্রাকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল।... ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ

১ We consider these works to be a great manifestation of artistic life, and that his methods will be, like all high technical achievements assimilated by us from abroad, of the greatest use to our country.

সকলকেই পেতে হবে, সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল।" কিন্তু কবি তাঁর সত্যসংকল্পকে মূর্তি দিতে পারেন নি— অন্তরে বাহিরে ছিল শতবিধ বাধা, স্থান কাল পাত্র অনুকূল ছিল না।

সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে কবির পত্রগুলি উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিবাক্য আদপেই নয়, তাতে প্রচুর তথ্যচয়ন আর ধীর স্থির মননের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর, চিঠিগুলি একত্র করে 'রাশিয়ার চিঠি' ছাপাবার পূর্বে কবি 'উপসংহার' প্রবন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য কী অপরিসীম, আর একনায়কত্বেরও বিপদ কোথায় তা সুন্দরভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। রাশিয়া থেকে লেখা চিঠিগুলি আর এই 'সারসিদ্ধান্ত' দুটি মিলিয়ে দেখলে তবেই রবীন্দ্রনাথের মোট বক্তব্য সম্পর্কে যথোচিত ধারণা হতে পারে।

১২৭

সোভিয়েট রুশে ভ্রমণের পর কবি চলেছেন আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে— সঙ্গে আরিয়াম ও টিম্বার্স্। ইতিপূর্বে এন্ড্রুজকে পাঠিয়েছিলেন টাকা তোলবার ভূমিকা তৈরি করতে। কিন্তু সময়টা বিশ্বব্যাপী বাজার-মন্দার। প্রথম মহাযুদ্ধের দশ বৎসর পরেও দেখা যাচ্ছে, বাজার-ভর্তি মাল, কিন্তু কেনবার টাকা লোকের হাতে নেই। সমস্ত টাকা জমে গেছে মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে। ধনকুবের রক্‌ফেলারের সঙ্গে দেখা করবার আশায় কবি মাস দেড়েক নিউইয়র্কে থাকলেন। শেষকালে বন্ধুবান্ধবেরা বললেন, সময় বড়ো খারাপ, পরে দেখা যাবে। কিন্তু কবিকে নিয়ে বাহিক আড়ম্বর চলছে খুব। বিল্‌টমোর হোটেলে এক বিরাট ভোজ-সভা হল; পাঁচশো লোক মিলে কবিকে স্বাগত করল। কিন্তু সে লোক কারা? নিউইয়র্কের নাম-করা সাপ্তাহিক "সাটার্ডে রিভিউ" লিখলেন, "নিমন্ত্রিতের তালিকাটিতে কারবারি ও ধনী লোকের নাম অনেক দেখা গেল, কিন্তু একজন কবির নাম তো পেলাম না— এমন-কি একজন লেখকেরও নাম নয়। এমন ব্যাপার কি ফ্রান্সে হতে পারত?" ব্রিটিশ রাজদূত ঘন ঘন আসেন ভদ্রতা করতে, এক দিন প্রেসিডেন্ট্ হুভারের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করিয়ে দিলেন। কিন্তু কোনো বক্তৃতার ব্যবস্থা হচ্ছে না, পাছে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট

রাশিয়ার প্রশস্তি করেন। আমেরিকার হঠাৎ-ধনীদের বড়ো ভয় কম্যুনিজম্‌কে।

আমেরিকায় কবির চিত্র-প্রদর্শনী হল; আনন্দ কুমারস্বামী তার যথাযোগ্য বিচার করে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে দিলেন।

অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে আমেরিকায় আসা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। মাস-তিন মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে কবি ইংলন্‌ডে ফিরলেন ডিসেম্বরের শেষাশেষি।

তখন লন্‌ডনে গোল-টেবিলের বৈঠক বসেছে; ভারতের ভাবী শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা সর্বদলীয় মত ও সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য চেষ্টা চলছে। কংগ্রেস সকলকে নিয়ে সকলের অনুমোদিত একটা বোঝাপড়ায় আসবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু কংগ্রেসের বাহিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের ক্ষুদ্র স্বার্থ মিটিয়ে সর্বভারতীয় মিলনসাধন অসম্ভব। সব থেকে বড়ো বাধা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ অথচ সংঘবদ্ধ মুসলমানেরা। গোল-টেবিলের মুসলমান সদস্যদের সঙ্গে কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের মতের মিল হচ্ছে না। তাঁরা ধর্মগত বা সম্প্রদায়গত ভেদ পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখে মিলনের ব্যবস্থা করতে চান। তাঁরা নির্বাচন ও মনোনয়নাদি ব্যাপারে সম্প্রদায়গত পার্থক্য রক্ষার পক্ষপাতী। এই নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ।

রবীন্দ্রনাথ লন্‌ডনে ফিরে এলে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করলেন কবির সালিশী হয়তো লোকে মানবে। কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই কবি বুঝলেন এ-সব তাঁর কাজ নয়, সাম্প্রদায়িকতার বিষে সকলেই জর্জরিত।

১২৮

য়ুরোপ-আমেরিকার সফর শেষ করে কবি দেশে ফিরলেন। য়ুরোপ তাঁর কাছ থেকে পেল মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যা, আর তারা জানল রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তিনি শক্তিমান আর্টিস্ট, শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি মৌলিক ভাবনার ভাবুক—স্বদেশে তারই হাতে-কলমে পরীক্ষা করে চলেছেন। কবির জীবনের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হল, সোভিয়েট রাশিয়াকে নিজের চোখে দেখা।

শান্তিনিকেতনে ফিরে ভাবছেন, এখানেও তিনি সমবায়ভাণ্ডারের সূত্রে সোভিয়েট আদর্শে সংঘজীবন গড়ে তুলবেন। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া বা সহযোগিতা পেলেন না; কবির সমবায়কেন্দ্রিক সংঘজীবন-গঠনের শুভেচ্ছা বাস্তবে রূপ নিল না।

দেশে ফিরে গীতসরস্বতীর সাক্ষাৎ মিলল, মন ডুবল সুরের রসে। এক পত্রে লিখছেন, "আমি আছি গান নিয়ে, কতকটা ক্ষ্যাপার মতো ভাব। আপাতত ছবির নেশাটা ঠেকিয়ে রেখেছি, কবিতার তো কথাই নেই। আমার যেন বধূবাহুল্য ঘটেছে; সব-কটিকেই একসঙ্গে সামলানো অসম্ভব।"

গানগুলো নিয়ে 'নবীন' নামে একটা পালা লিখলেন। শান্তিনিকেতনে দোলপূর্ণিমার দিন (১৩৩৮) উৎসব করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চললেন কলিকাতায়— অভিনয় হবে। একদিন জাপানী ওস্তাদ তাকাগাকি শান্তি-নিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জুজুৎসুর কসরৎও দেখাবেন। কবির অন্তরের ইচ্ছা দেশবাসীকে সবল সক্রিয় শক্তিমান শ্রীমান করে তোলেন; তাই নৃত্যগীত ও জুজুৎসু এক সঙ্গে পেশ করলেন। কিন্তু দেখা গেল, নবীনের নাচগান দেখতেই লোকের যত উৎসাহ, জুজুৎসুর আশ্চর্য ক্রীড়াকৌশল সম্পর্কে তাদের কিছুমাত্র কৌতূহল নেই।

'নবীন' অভিনয়ের পর, কয়েক দিন বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে থেকে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন।

এবার পঁচিশে বৈশাখে কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ হচ্ছে, শান্তিনিকেতনে পরিমিত সমারোহে সুন্দর করে জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল। সেদিনের ভাষণে কবি বললেন, "একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র। আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী, গুরু বা নেতা নই··· আমি বিচিত্রের দূত।" কয়েকদিন পূর্বে লেখা এক পত্রে এই কথাটাই বলেছিলেন আরো স্পষ্ট করে—"আমি··· নানা কিছুকেই নিয়ে আছি নানা ভাবে নানা দিকেই নিজেকে প্রকাশ করতে আমার ঔৎসুক্য। বাইরে থেকে লোকে মনে ভাবে তাদের মধ্যে অসঙ্গতি আছে, আমি তা অনুভব করি নে। আমি নাকি গাই, লিখি, আঁকি, ছেলে পড়াই— গাছপালা আকাশ-আলোক জলস্থল থেকে আনন্দ কুড়িয়ে বেড়াই।···

"আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী— অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে, আমি সমগ্রকেই মানি।··· আমি মনে করি··· সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ ক'রে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ করে সার্থক হতে পারবে।"

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি আছি, ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এপারের খেয়ার ঘাটায়।

আমরা এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারি যে, কবি কোনোদিন গুরুগিরি করেন নি, চেলা তৈরির ব্যাবসা ফাঁদেন নি। আমরা তাঁকে কবি বলে দেখেছি, মানুষ বলেই বিচার করেছি, তর্ক করে প্রতিবাদ করে নিজেদের অভিমত জানাতে সংকোচ বোধ করি নি। তিনিও গুরুর গুরুত্ব দাবি করেন নি।

জন্মোৎসবের পর কয়েক দিনের জন্য দার্জিলিঙ ঘুরে এলেন। ঠাণ্ডা দেশে গেলেও মন ঠাণ্ডা হয় না— দেশে কোথাও শান্তি নেই। নূতন শাসন-ব্যবস্থা-প্রবর্তনের কথা চারি দিকেই চলছে, সকলেরই আশা নতুন-কিছু হবে। কবি জানেন, ক্ষমতা-হস্তান্তরের সময়ে বা অন্তর্বর্তীকালে ইংরেজ শাসকেরা তাঁদের শাসনমুষ্টি শিথিল ক'রে ভারতীয়দের হাতে শাসনভার তুলে দেবেন, কিন্তু সেই পর্বটা হবে ভীষণ পরীক্ষার— কারণ হিন্দু-মুসলমানের মতানৈক্য বেড়েই চলেছে।

কবি 'হিন্দু মুসলমান' নামে প্রবন্ধে লিখলেন—

"যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে-দেশ হতভাগ্য। যে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ।··· মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটিকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে-দেশকে বাঁধতে পারে?"

কবি এই সময়ে আর-একটি প্রবন্ধে লিখলেন, "সিভিল সার্ভিসের মেয়াদ

কিছুকাল টিঁকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু সেইদিনকার সিভিল-সার্ভিস হবে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশ রাজ্যের পাহারা আলগা হবামাত্রই অরাজকতার কাল-সাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারি দিকেই ফণা তুলে আছে—তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও এ কথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভালো। সেই যুগান্তরের সময়ে যে-যে গুহায় আমাদের আত্মীয়বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই-সেইখানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়।"

সত্যই সে পরীক্ষা এল ১৯৪৬ সালে। অবস্থা এমন হল যে, শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বলে উঠল, আমাদের পৃথক্ রাষ্ট্র চাই।

১২৯

দেশের কথা ভেবে প্রবন্ধ লিখছেন, সেটা খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক কাজ। কিন্তু ঘরের দ্বারে যে পালিত সিংহশাবকটি নিত্য বেড়ে উঠে খাদ্যের জন্য ছট্‌ফট্ করছে, সেই বিশ্বভারতীর অভাবের কথা তো রাত পোহালেই ভাবতে হয়। টাকা তোলবার বিশেষ দায়িত্ব তাঁরই। ভিক্ষা সাধতে পারেন, বক্তৃতা দিতে পারেন, লেখা বেচতে পারেন, আর নাচ-গানের দল নিয়ে রঙ্গমঞ্চে নামলেও উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে দেখবার জন্য শহর ভেঙে পড়ে—সুতরাং সাময়িকভাবে অভাব পূরণ করতেও পারেন। কবির প্রধান সহায় ও সহযোগী বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা। কবির প্রেরণায় ও প্রযোজনায় আর তাদের নৈপুণ্যে, নাচে গানে অভিনয়ে, নানা উপলক্ষে বিশ্বভারতীর জন্য অল্প টাকা ওঠে নি।

অর্থের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ গেলেন ভূপালের নবাব-দরবারে। সে-সময় ডক্টর আমীর আলি নামে হায়দরবাদের এক যুবক কর্মী শ্রীনিকেতনের গবেষণা বিভাগে আছেন—এলম্‌হার্স্ট তাঁকে বিলাত থেকে পাঠিয়েছিলেন—তিনি কবিকে নিয়ে ভূপাল গেলেন। নবাব সাহেব বাদশাহী কায়দায় কবির

বহু আদর-আপ্যায়ন করলেন; তবে জানালেন, খুবই টানাটানির মধ্যে দিন যাচ্ছে।

অর্থসংগ্রহের দিক দিয়ে ভূপাল-ভ্রমণ নিরর্থক হওয়ায় স্থির হল—পূজার পূর্বে একটা গীতাভিনয়ের অনুষ্ঠান হবে। জর্মনিতে 'দি চাইল্ড' নামে যে ইংরেজি কথিকাটা লিখেছিলেন, সেটা বাংলায় নূতন ক'রে লিখে নাম দিলেন 'শিশুতীর্থ'। ১৯৩১ সেপ্টেম্বরে কলিকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে দুদিন গীতোৎসব ও সেই সঙ্গে 'শিশুতীর্থে'র মূকাভিনয় হল। গানগুলি সবই পুরাতন, কথিকাটি নূতন

এবারকার গীতোৎসবের বিশেষত্ব হল বিচিত্র নৃত্যকলার পরিবেশনে—দক্ষিণভারতীয় নৃত্য, গুজরাটি গরবা, মণিপুরী, সেই সঙ্গে হাঙ্গেরিয়ান লোকনৃত্য, সবই এক আসরে রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। 'শিশুতীর্থ' কবি আবৃত্তি করে গেলেন—অভিনেতারা নৃত্যসংযোগে সেটিকে রূপ দিলেন।

১৩০

কবি যখন গীতোৎসবে মশগুল, তখন সহসা দারুণ এক দুঃসংবাদে তাঁর মন বিচলিত হয়ে উঠল।

দেশে তখন বিদেশী রাজের উগ্র দমননীতি চলছে, বহুশত বাঙালি যুবক বিনা বিচারে জেলখানায় বা সুদূর দুর্গম স্থানে বন্দী। মেদিনীপুরের হিজলী জেলে বন্দীদের সঙ্গে জেল-কর্তৃপক্ষের বহুদিন ধরেই বিরোধ চলছিল। একদিন রক্ষীরা গুলি চালিয়ে দুজন বন্দীকে খুন করল আর বিশ জনকে প্রহার করে আধমরা করে ফেলল। কারাগারে চোরাগোপ্তা মারধোর চিরদিনই চলে। কোনো বিচারকের কাছে প্রমাণ করা যায় না, যন্ত্রণা দেওয়ার এমন-সব 'বিজ্ঞানসম্মত' পদ্ধতিও ছিল। কিন্তু এ ধরণের নিরস্ত্র বন্দীদের হত্যাকাণ্ড ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি বা জানাজানি হয় নি।

কলিকাতায় জনসভা হল গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টের তলায় (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১)। রবীন্দ্রনাথ জাতির প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন; লক্ষাধিক লোক সেদিন সভায় জমায়েত হয়েছিল। কবি বললেন, "প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের উপরেই বিদেশী

শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।" এই ঘটনা নিয়ে কবি পরেও তীব্র মন্তব্য করেছিলেন।

পূজাবকাশটা দার্জিলিঙে কাটালেন। ফরমাইশি লেখা লিখতে হয়; তবে মন এখন বিশেষভাবে ডুবেছে ছবি আঁকাতে।

শান্তিনিকেতনে ফিরে পৌষ উৎসব করলেন; তার পর কলিকাতায় এলেন; সেখানে কবির সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীরা সপ্তাহব্যাপী উৎসবের আয়োজন করেছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলে বাঙালি সাহিত্যিকগণ কবির প্রতি সম্মান দেখিয়েছিল। এবার সকল শ্রেণীর লোকেই শ্রদ্ধানিবেদন করলেন জয়ন্তী উৎসব করে। এই উৎসবের উদ্যোগী ছিলেন বাংলার মনীষীরা। কিন্তু তাঁর কর্মরূপ দান করেছিলেন অমল হোম। এই উপলক্ষে উৎসবসমিতির পক্ষ থেকে *The Golden Book of Tagore* কবিকে উপহার দেওয়া হল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী গুণী ও সাহিত্যিকের রচনা ও প্রশস্তি সংগ্রহ করে এ শ্রেণীর গ্রন্থ এ দেশে ইতিপূর্বে কখনো মুদ্রিত হয় নি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক। অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান থেকে কবিসম্বর্ধনার অনেক-কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল।

সপ্তাহব্যাপী উৎসব শেষ হবার পূর্বেই, ৪ঠা জানুয়ারি (১৯৩২) উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হল— খবর এসেছে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১৩১

১৯৩১ অক্টোবরে গান্ধীজি লন্ডনের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গিয়েছিলেন। হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে আগামী শাসনসংস্কারের শর্তাদি সম্বন্ধে একটা মিলনসূত্র সন্ধানের বহু ব্যর্থ চেষ্টা হল; শেষে তিনি হতাশ হয়ে ২৮শে ডিসেম্বর দেশে ফিরে এলেন।

নূতন বড়োলাট এসেছেন লর্ড উইলিংডন; তিনি পূর্বে মাদ্রাজের রাজ্যপাল ছিলেন। ভারতবাসীদের দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি খুবই ওয়াকিবহাল; ভেদনীতির ব্রহ্মাস্ত্র-ব্যবহারেও অত্যন্ত পটু। পূর্ববর্তী বড়োলাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে গান্ধীজির একটা চুক্তি (a gentleman's agreement) হওয়ার পর আইন-অমান্য আন্দোলন মুলতুবি রাখা হয়। দেশে ফিরেই তিনি শুনতে

পেলেন, সরকারের পক্ষ হতে শর্তভঙ্গ করে নানা রকমের উৎপাতের কথা ; আবার এও জানতে পারলেন যে, সরকার-পক্ষীয়েরাও কংগ্রেসীদের দায়ী করছেন নানা রকম উপদ্রবের জন্য। এই-সব ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলবার জন্য গান্ধীজি নূতন বড়োলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বড়োলাট সরাসরি 'না' করে দিলেন এবং গান্ধীজি বিলাত থেকে দেশে ফেরার সাত দিনের মধ্যেই তাঁকে বন্দী করার আদেশ দিলেন (৪ জানুয়ারি ১৯৩২)।

গান্ধীজিকে পুনার যেরবাদা জেলে বিনা বিচারে আটক রাখা হল। কয়েক দিনের মধ্যে নেতৃস্থানীয় অনেকেই কারাগারে আশ্রয় পেলেন। কংগ্রেস নেতৃশূন্য হল। রবীন্দ্রনাথ একটি বিবৃতিতে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। তিনি বিলাতে প্রধান-মন্ত্রী রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডকে এক তারবার্তা পাঠিয়ে জানালেন যে, মহাত্মাজির গ্রেপ্তারের পর ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা আর কী করে ভারতীয়দের কাছ থেকে সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা আশা করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ বড়োলাটের উদ্দেশ্যে এই কবিতাটি লিখে থাকবেন— (মানী)—

উচ্চপ্রাচীরে রুদ্ধ তোমার ক্ষুদ্র ভুবনখানি,
হে মানী, হে অভিমানী।
মন্দিরবাসী দেবতার মতো সম্মান-শৃঙ্খলে
বন্দী রয়েছ পূজার আসনতলে।
সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে নিজেরে পৃথক করি
আছ দিনরাত গৌরবগুরু কঠিন মূর্তি ধরি।
সবার যেখানে ঠাঁই
বিপুল তোমার মর্যাদা নিয়ে সেথায় প্রবেশ নাই।
অনেক উপাধি তব,
মানুষ-উপাধি হারায়েছ শুধু
সে ক্ষতি কাহারে কব।

ভুটান-সীমান্তে দুর্গম বক্সা দুর্গের রাজবন্দীরা এই বৎসর রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে কবিকে যে অভিনন্দনের বাণী পাঠান তাতে কবির হৃদয়

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো —
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো। —
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে ॥

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে, —
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরব নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

স্পর্শ করে, তিনি লেখেন—

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।...
ভৈরবের আনন্দেরে দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

হিজলী হত্যাকাণ্ডের দুঃখ অপমান ও বেদনা থেকে, ইংরাজ দণ্ডধরগণের চণ্ডনীতির তীব্র প্রতিবাদে কবি পুনর্বার লিখলেন ১৩৩৮ পৌষে—

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে।
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে, বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে।
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

১৩২

কলিকাতায় জন্মোৎসবের উত্তেজনার পর কবি গঙ্গার তীরে খড়দহে এক ভাড়া বাড়িতে গিয়ে বাসা বাঁধলেন। মন সম্পূর্ণ নূতন জগতে চলে গেছে— সেখানে উৎসবের আড়ম্বর নেই, দেশ-কাল-ব্যাপ্ত সংকটের বিষাদও নেই— কবিতা লিখছেন। এ কবিতা লেখার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। বহু বৎসর পূর্বে কবি যখন তাঁর 'চয়নিকা' প্রথম প্রকাশ করেন সে সময়ে নন্দলাল বসুকে দিয়ে কাব্যবর্ণিত বিষয়ে ছবি আঁকিয়েছিলেন। এখন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছবি-আঁকিয়ে; তাই এখন নিজের ও নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পীদের ছবির উপর কবিতা লিখছেন। এই কবিতাগুলি 'বিচিত্রিতা' কাব্যে সচিত্র প্রকাশিত হয়; নন্দলালের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বইটি তাঁকে কবিতা লিখে উৎসর্গ করেন—"পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ"-সহ।

শান্তিনিকেতনে ফিরলেন ফেব্রুয়ারির গোড়ায় (১৯৩২); শ্রীনিকেতনের দশম বার্ষিক উৎসব, এই দিনের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে আবার 'স্বদেশী' সামগ্রী ব্যবহারের সংকল্প গ্রহণ করতে বললেন—"কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হলেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব।··· দেশকে আপন বলে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা।"

কলিকাতা থেকে ডাক এল; কথা হচ্ছে পারস্যে বা ইরানে যাবার। এ বয়সে আকাশপথে যেতে পারবেন কি না তার পরীক্ষা হবে। উড়োজাহাজে কবির সঙ্গে উঠলেন ডাচ্‌ কন্‌সাল জেনারেল ও তাঁর পত্নী। দেখা গেল বিমানপথে যাবার মতো শক্তি সত্তর বৎসর বয়সেও অক্ষুণ্ণ।

১৩৩

সত্তর বৎসর বয়স পেরিয়ে যাবার পর দেশ থেকে বের হবার বয়স আর নেই এইটাই ছিল কবির ধারণা, দেশের লোকেরও সেই বিশ্বাস। কিন্তু এমন সময়ে পারস্যের খোদ্‌ শাহন্‌শাহ রেজাশাহ পেল্‌হবীর কাছ থেকে ইরান-সফরের আমন্ত্রণ পেয়ে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। বোম্বাইয়ের বন্ধু দিনশা ইরানী ভরসা দিয়ে লিখে পাঠালেন যে, বুশায়ার শহর থেকে

তিনিও কবির সঙ্গী হবেন। কবির সঙ্গে একই উড়োজাহাজে চললেন প্রতিমাদেবী ও অমিয় চক্রবর্তী; ইরান সফরের অন্যতম সঙ্গী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় আগে চলে গিয়েছিলেন, একই বিমানে চারখানা টিকিট পাওয়া যায় নি বলে।

এলাহাবাদ, যোধপুর, করাচি, জাস্ক্ বিমান-বন্দরে এরোপ্লেন থামতে থামতে চলল। বুশায়ার পারস্যের প্রথম বড়ো শহর, এখানে কবিকে নামতে হল। এর পর রাজধানী তেহারান পর্যন্ত স্থলপথে যাত্রা। তখনো পারস্য-উপসাগর থেকে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয় নি; রাজপথের যা দশা তা অবর্ণনীয়। পথও নিরাপদ নয়। দস্যুর দল রাস্তা ভাঙে, তাই সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন রাখতে হয়।

বুশায়ারে দুই দিন থেকে কবি ও তাঁর সঙ্গীরা সরকারি লোক-লস্করের সঙ্গে মোটরে শিরাজে এসে পৌছলেন; শিরাজ পারস্যের প্রাচীন শহর, হাফেজ ও সাদীর বাসভূমি। সাদীর সমাধি-উদ্যানে ভারতীয় কবির অভ্যর্থনা হল— লোকের কী ভিড়! পুলিস হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল, শেষকালে সিপাহীরা এসে লোক ঠেকায়। আর-এক দিন কবি হাফেজের সমাধিস্থলে বহুক্ষণ ছিলেন— বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতাকে হাফেজ থেকে সানন্দে আবৃত্তি করতে শুনতেন, সে স্মৃতি তাঁর মনে খুবই স্পষ্ট ছিল। পারস্যের গুল্‌বেহেস্তের শোভা ও সৌন্দর্য উপভোগ করলেন। সাতদিন কবির শিরাজে কাটল।

ইস্পাহান যেতে পথে পড়ে প্রাচীন পারসি পুরী রাজধানী 'পার্সিপোলিস'। সেখানে জর্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ হের্ৎজ্‌ফেল্‌ট্ (Hertzfeld) বহুকাল ধরে আছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে দেখাবার জন্য বাছা বাছা শিল্প-নিদর্শন একটা জায়গায় সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, বিরাট ধ্বংসস্তূপ ঘুরে ঘুরে কবির পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। হের্ৎজ্‌ফেল্‌টের সঙ্গে পারসিক শিল্প নিয়ে কবির আলাপ-আলোচনা হল— এখনো জানবার ও বোঝবার আগ্রহ কী প্রবল! ইস্পাহানে ছয়দিন থাকলেন; সেখানকার বিখ্যাত ইসলামিক স্থাপত্যগুলি তন্ন তন্ন করে দেখলেন।

বুশায়ারে পৌছনোর পনেরো দিন পরে রাজধানী তেহারানে কবি ও

তাঁর সঙ্গীরা উপস্থিত হলেন। এই দীর্ঘ দুর্গম পথ দিয়ে এর থেকে দ্রুত হয়তো আসা যেত, কিন্তু দেশকে এমন করে ভালোভাবে দেখা হত না— আর শরীরেও সইত কি না সন্দেহ।

তেহারানে কবি পনেরো দিন ছিলেন, তার মধ্যে আঠারোটি অনুষ্ঠান হয়। পারস্যের শাহন্‌শাহ রেজাশাহ পেল্‌হবীর সঙ্গে একদিন দেখা হল। কবির জন্মদিন এবার এখানে উদ্‌যাপিত হল— রাজাদেশে রাজোদ্যানে দিবসব্যাপী উৎসব। বলা বাহুল্য ইরানের শাহন্‌শাহের উপযুক্ত আয়োজনই হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ইরাকের রাজদূত এসে কবিকে সে দেশে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে গেলেন। তেহারান থেকে মোটরযোগে ইরাক যাত্রা করলেন। পথে পড়ে সেই খাড়া পাহাড়, যার গায়ে খোদাই আছে অখামনীয় দরায়ুসের বেহিস্তান শিলালিপি। সেখান থেকে অদূরেই তাকিবুস্তানের পর্বতগাত্রে শাসনীয় যুগের কারুকার্যখোদিত সমাধিমন্দির। কবি সবই দেখলেন বা চোখ বুলিয়ে এলেন। প্রাচীন ও আধুনিক পারস্যের ইতিহাস কবির অজ্ঞাত ছিল না; সাইকসের দুই খণ্ড ইতিহাস তাঁর ভালো করেই পড়া! সুতরাং এ-সব বুঝতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল না।

ইরাক সীমান্ত নিতান্ত নিকটে না— একরাত্রি কির্মনাশায় কাটাতে হল। পরদিন ইরাকের রেল-স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে তিনি বোগ্‌দাদে পৌঁছলেন। ভারতের কবিকে দেখবার জন্য সে কী জনতা! কবি উঠলেন বোগ্‌দাদের বড়ো এক হোটেলে। রাজা ফৈজলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাঁর সাদাসিধা, অনাড়ম্বর ব্যবহার কবির খুবই ভালো লাগল।

বোগ্‌দাদে যথারীতি সম্বর্ধনাসভা হল। কিন্তু আরবের নাগরিক সভ্যতা দেখে কবির মন উঠছে না, তিনি চললেন মরুপ্রান্তরে বেদুইন সর্দারদের তাঁবুতে। যৌবনের আবেগে একদিন বলেছিলেন—

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন!

আজ সেই বেদুইনদের দেখতে গেলেন। বেদুইনরা তাদের তাঁবুতে কবিকে ভোজ দিল; তাদের রণনৃত্য দেখালো। বেদুইন-সর্দার দেশ-বিদেশের খবর

রাখেন যথেষ্ট। তিনি বললেন— ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ চলছে, তার মূলে আছেন শিক্ষিত লোকেরা। কয়েক দিন পূর্বে ভারত থেকে কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমান বোগ্‌দাদে এসে ইসলামের নাম নিয়ে ভেদবুদ্ধি প্রচারের চেষ্টায় ছিলেন। বেদুইন-সর্দার তাঁদের নিমন্ত্রণসভায় যান নি।

১৯৩১ সালে ভারত-সম্পর্কিত গোলটেবিল বৈঠকে যাবার পথে নেতৃস্থানীয় খিলাফতী কয়েকজন আরব দেশে গিয়েছিলেন— তাঁরাই ১৯২১ খৃস্টাব্দে গান্ধীজির বড়ো চেলা ছিলেন।

বোগ্‌দাদ থেকে ডাচ বিমানে কবি ও প্রতিমাদেবী দেশে ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গী অমিয়চন্দ্র ও কেদারনাথ ইরাক দেখবার জন্য থেকে গেলেন।

১৩৪

১৯৩২ সালের ৩রা জুন কবি পারস্য থেকে ফিরলেন— ১১ই এপ্রিল কলিকাতা ছেড়েছিলেন। পারস্য থেকে ফিরে এসে শুনলেন তাঁর একমাত্র দৌহিত্র নীতু (মীরাদেবীর পুত্র) জর্মনিতে কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী। কয়েক বৎসর পূর্বে খুব আশা করে তাকে জর্মনীতে পাঠানো হয়েছিল মুদ্রাযন্ত্রের কাজ শেখবার উদ্দেশ্যে।

রবীন্দ্রনাথ মীরাদেবীকে য়ুরোপে পাঠিয়ে দিলেন। এক মাস পরে সংবাদ এল, ৭ই আগস্ট (১৯৩২) নীতুর মৃত্যু হয়েছে। বৃদ্ধবয়সে একমাত্র দৌহিত্রের এই বিচ্ছেদ-বেদনা কতটা রবীন্দ্রনাথের প্রাণে লাগল জানবার উপায় নেই। ব্যক্তিগত মর্মান্তিক দুঃখকেও উপেক্ষা করে বা আবরণ করে আপন বিধিনির্দিষ্ট ব্রতে তিনি বরাবরই নিযুক্ত থেকেছেন। এই সময়ের একটি কবিতায় বলছেন—

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।

ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,
রেখো না দ্বারে অর্গল দিয়ে।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি—
কৃপণ হোয়ো না।

এ সময়ে কবি আছেন বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাসায়। কলিকাতায় এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ই আগস্ট তারিখে তাঁর সম্বর্ধনা হয়েছে। কবির আর্থিক অবস্থা অস্বস্তিজনক। অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার রামতনু লাহিড়ী -অধ্যাপকের পদ তাঁকে নিতে হল; 'কমলা বক্তৃতা' দেবারও আহ্বান পেলেন।

শান্তিনিকেতনে ফিরে গদ্যছন্দে কবিতা লিখছেন। 'পরিশেষ' নামে কাব্যখণ্ড প্রকাশ করে ভেবেছেন এই তাঁর শেষ রচনা। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল 'পরিশেষ' কাব্যেও শেষ কথা বলা হয় নি— তাই 'পুনশ্চ'।

ভাদ্রমাসের শেষ দিকে (১৩৩৯) কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব, কবি তার সভাপতি। শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার সভাপতি। কিন্তু শরৎ-উৎসব অসমাপ্ত থেকে গেল। সংবাদ এল পুনার যেরবাদা জেলে গান্ধীজি আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করেছেন। উৎসব গেল পিছিয়ে। শরৎচন্দ্রের এই ৫৭তম জন্মদিবস-উপলক্ষে কবি 'কালের যাত্রা' গ্রন্থখানি তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৩৫

পুনার জেলে গান্ধীজি অনশনব্রত কেন গ্রহণ করলেন, সে কথাটা সংক্ষেপে বলা দরকার। গোলটেবিল-বৈঠকে যোগদান করে ফেরবার সপ্তাহকালমধ্যে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখা হয় প্রায় নয় মাস পূর্বে (জানুয়ারী ১৯৩২)। ভারতবর্ষের নূতন শাসনপদ্ধতির খসড়া নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মতানৈক্য এমন তীব্র হয়ে উঠল যে, অবশেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড নিজের বুদ্ধি ও অভিসন্ধি -মত যা করবার তাই করলেন। ইতিপূর্বে মুসলমান-সমাজকে স্বতন্ত্র নির্বাচকগোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল; এবার প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে, হিন্দুরাও অখণ্ড

'জাতি' নয়—বর্ণহিন্দুরা 'তপশীলী'দের থেকে পৃথক্। ভারত ছিল এক ; মুসলমানদের পৃথক্ নির্বাচনী-অধিকার সাব্যস্ত হওয়াতে হল দুটো ; আর নূতন প্রস্তাবে চেষ্টা হল, ভারতের অন্যতর অংশকে আরও খণ্ড খণ্ড করে তৃতীয় দল গড়া ; তারা হবে তপশীলী দল। ঐক্যমুখী ভারতীয় সমাজকে এ ভাবে বহুধা বিচ্ছিন্ন করতে পারলে শাসকশ্রেণীর বিশেষ সুবিধা। গান্ধীজি জেল থেকে আপত্তি জানিয়ে ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্‌টেম্বর থেকে অনশন আরম্ভ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পেয়ে গান্ধীজিকে তার করে জানালেন, ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখবার জন্য অমূল্যজীবন-দান সার্থক কর্ম। গান্ধীজি জবাবে লিখলেন, গুরুদেবের কাছ থেকে তিনি এই আশীর্বাদই আশা করেছিলেন।

দেশের সমস্ত নেতা তখন কারারুদ্ধ ; রবীন্দ্রনাথ অস্থির হয়ে উঠলেন ও ২৬শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্রনাথ করকে সঙ্গে নিয়ে পুনা রওনা হয়ে গেলেন। সেদিন বিকালে খবর এল ম্যাক্‌ডোনাল্ড গান্ধীজির প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। এই সংবাদ পেয়ে মহাত্মাজি জলগ্রহণ করলেন। কবি সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন, মহাত্মার অনুরোধে তাঁর অতি প্রিয় একটি গান রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—"জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো"।

২রা অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিন। পুনা শহরের বিরাট জনসভায় কবি এক লিখিত ভাষণ পড়লেন ; তিনি বললেন, দেশবাসীকে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতেই হবে। আর বললেন, হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে দেশসেবায় আত্ম-উৎসর্গ না করলে স্বরাজ-লাভ সহজসাধ্য নয়।

কবি শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন। পুনা যাত্রার পূর্বে যে-সব কবিতা লিখেছিলেন তার খেই হারিয়ে গিয়েছে যেন এই কয় দিনের উত্তেজনায়। এবার লিখলেন বড়ো গল্প—'দুই বোন'। তার লিরিক ভাবভঙ্গিতে 'শেষের কবিতা'র অনুস্মৃতি।

পুনর্বার কলিকাতায় যেতে হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিবর্ষপূর্তি-উপলক্ষে। উৎসবসভায় (১১ ডিসেম্বর ১৯৩২) সভাপতি হলেন রবীন্দ্রনাথ।

আচার্য রায় গান্ধীজির পরম ভক্ত ও চরম খদ্দরপন্থী ; তাই কবি তাঁকে উৎসর্গ করলেন মহাত্মাজি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র এক পুস্তিকা।

১৩৬

১৯৩৩ সাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নূতন সম্বন্ধ হয়েছে— দু'বৎসরের জন্য 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক'-এর পদ গ্রহণ করেছেন। সৌভাগ্যবশত কবিকে সত্যকার ক্লাস নিতে হয় নি। এই সময়ে 'কমলা বক্তৃতা'গুলি দিলেন, বক্তৃতার বিষয় ছিল—'মানুষের ধর্ম'। তিন বৎসর পূর্বে অক্স্‌ফোর্ডে যে বক্তৃতা দেন এগুলি তারই বাংলা রূপান্তর, সাধারণ বাঙালি শ্রোতার উপযোগী ক'রে বলা— যথাসাধ্য সহজ করবার চেষ্টা করেছেন।

কবি আছেন বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্রের বাড়িতে ; দেখা করতে এলেন মদনমোহন মালবীয়। তিনি এসে কবিকে বললেন, ভারতে নূতন শাসন প্রবর্তিত হবার মুখে ভারতের বিরুদ্ধে বিদেশে ভীষণ কুৎসা প্রচারিত হচ্ছে এটা তাঁকে জানিয়েছেন য়ুরোপ থেকে বিঠলভাই প্যাটেল। ভারত অধিকতর অধিকার দাবি করছে, তা পাবার সে যে অযোগ্য এটাই ব্রিটিশ এজেন্টদের প্রমাণের বিষয়। তার জন্য তারা অজস্র অর্থ ব্যয় করছে ও মিস্‌ মেয়ো-র 'মাদার ইন্‌ডিয়া' বই সমস্ত প্রধান ভাষায় তর্জমা করিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এক বিবৃতিতে লিখলেন যে, দু-একটা খুচরা প্রবন্ধ লিখে বা দুই-একজন লোককে বিদেশে পাঠিয়ে এ স্রোত বন্ধ করা অসম্ভব। পাশ্চাত্য দেশের প্রধান নগরগুলিতে ভারত সম্বন্ধে তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করবার জন্য সুসংগঠিত কেন্দ্র -স্থাপনের প্রয়োজন।

কবির দিন যায় পাঁচ কাজে ; গ্রীষ্মাবকাশে দার্জিলিঙে দু মাস থেকে এলেন। বিদ্যালয় খুললে ছাত্র-অধ্যাপকদের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেন। বেশির ভাগ আলোচনা চলেছে গদ্যছন্দকে কেন্দ্র ক'রে ; কারণ গদ্যছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা করছেন এই পর্বে।

পূজাবকাশের পূর্বে শান্তিনিকেতনে কিছু-না-কিছু অভিনয়ের রেওয়াজ খুবই পুরোনো। এবারও সকলে কবির কাছে নূতন নাটক চাইলে, তিনি লিখে দিলেন 'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা'। সাধনা পত্রিকায় ১২৯৯ সালে 'একটা

আষাঢ়ে গল্প' লিখেছিলেন ; সেই কাহিনী অবলম্বনে 'তাসের দেশ' কৌতুকনাট্য লেখা হল। বৌদ্ধ অবদান-সাহিত্যের একটা গল্প নিয়ে লিখলেন 'চণ্ডালিকা'। চণ্ডালকন্যা মাতঙ্গীর গল্প নিয়ে নাটক লেখবার ইচ্ছা বহুকালের ; এতকাল পরে রূপ দিলেন বটে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাটকরূপ নিলো না ; তবে এবার নাটকের একটা নূতন টেকনিক দেখা দিল।

শান্তিনিকেতনে অভিনয় করলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মন ভরে, কিন্তু তাতে বিশ্বভারতীর ছিদ্রকুম্ভ পূর্ণ হয় না। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই যে-সব নৃত্যগীত ও অভিনয়ের অনুষ্ঠান— কবির রসরূপসৃষ্টি হিসাবে এগুলির বিশেষ এক অপূর্বতা ও সার্থকতা আছে— বৃহত্তর সমাজের সাহিত্য-রসিকগণকে তার অংশভাক্ না করাও অনুচিত। কাজেই শান্তিনিকেতনের উৎসবানুষ্ঠানশেষে দলবল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চললেন কলিকাতায়। ম্যাডান থিয়েটরে তিন রাত অভিনয় হল। 'তাসের দেশ'-এর অভিনয়ে, সাজসজ্জায় ভাবভঙ্গিতে ও কথাবার্তায়, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নাট্যনির্দেশে আর শিল্পী নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথের রূপকল্পনায়, এমন এক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল যা দেশের লোক পূর্বে কখনো দেখে নি, আর যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। অভিনয়ের এ একটা নূতন ধারা।

১৩৭

পূজার ছুটিতে কবি কোথাও নড়লেন না। "ছুটির অবকাশেও অতিথি-অভ্যাগতে আশ্রম পরিপূর্ণ।" কবির উপর বিবিধ লোকের বিচিত্র চাহিদা সব পূরণ করতে না পারলে লোকে আবার অসন্তুষ্ট হয়। "বাহাত্তর বছর বয়সের মাথাটাও নড়বড়ে হয়ে উঠেছে— ভুল হয় বিস্তর— কিন্তু লোকে বিচার করে সাবেক কালের আদর্শে।"

ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ে রবীন্দ্রসপ্তাহ-উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে কবির চিত্র প্রদর্শনী হবে ; অভিনীত হবে 'শাপমোচন' আর 'তাসের দেশ'। তাসের দেশের গুজরাটি তর্জমা করানো হয়েছে— সেটা দর্শকেরা দেখে নেবেন, কিন্তু অভিনয় বাংলায় হবে।

বিরাট বাহিনী বোম্বাই চলল; তাঁরা যে টাকা তুলতে যাচ্ছেন তা মনে হয় না। কবিও গেলেন। বক্তৃতা, পার্টি, অভিনন্দন হল। অভিনয়েও ভালো টাকা উঠল। বোম্বাই থেকে ওয়াল্‌টেয়ার গেলেন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার আহ্বানে; বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মানব'। সেখানে অল্পকাল থেকে চললেন নিজাম-হায়দরাবাদে। কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নিজাম রাজ্যের শাসনপরিষৎ-পতি স্যর কিষণপ্রসাদ।

অতীতে ১৯২৭ সালে নিজাম বিশ্বভারতীকে ইসলামি বিভাগের জন্য এক লক্ষ টাকা দেন। এবারে রবীন্দ্রনাথের সুযোগ হল ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার। হায়দরাবাদে দিন-পনেরো ছিলেন; বিশ্বভারতীর জন্য হিন্দু মুসলমান অনেকেই উদার হস্তে দান করলেন। বোম্বাই ও হায়দরাবাদ মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকা সেবার সংগৃহীত হয়েছিল।

দেড় মাস পশ্চিমে দক্ষিণে ও মধ্যভারতে ভ্রমণ করে কবি কলিকাতায় ফিরলেন। কলিকাতায় রামমোহন-শতবার্ষিক-উৎসব উপলক্ষে প্রথম আর শেষ ভাষণ দিলেন 'ভারতপথিক রামমোহন' সম্পর্কে। ভারতের ধর্মেতিহাসে রামমোহনের স্থান কোথায় সেই কথাটি রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে বললেন। আরও অন্যান্য সভায় অন্য বক্তৃতা দিতে হয়, বাহাত্তর বৎসর বয়সেও রেহাই পান না। রেহাই পেলেই যে খুশি হতেন তাও বলতে পারি নে।

কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলে উল্লেখযোগ্য অতিথি এলেন সরোজিনী নাইডু, বোম্বাইয়ে রবীন্দ্রসপ্তাহ-উদ্যোক্তাদের প্রধানা। আর এলেন জওহরলাল নেহরু ও তাঁর পত্নী কমলাদেবী; তাঁদের একমাত্র সন্তান ইন্দিরা তখন বিশ্বভারতীর ছাত্রী— তাকে এঁরা দেখতে এসেছিলেন।

কয় দিন পরে কবি জানতে পারলেন, গান্ধীজি কলিকাতায় আসছেন হরিজন-আন্দোলনের প্রচারকার্যে। পুনা-চুক্তির ব্যাপারে বাংলার বর্ণহিন্দুরা গান্ধীজির উপর খুবই বিরক্ত; কারণ, তাদের ধারণা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলেই অচিরে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের পশুবলে বিপন্ন হবে। তাই কলিকাতার অনেকে স্থির করেছেন, গান্ধীজিকে এবার তাঁরা স্বাগত করবেন না। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে খুবই ক্ষুণ্ণ হয়ে দেশবাসীকে অসৌজন্য প্রকাশ না

করবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। গান্ধীজির সঙ্গে তাঁরও বহু বিষয়ে মতানৈক্য আছে। অল্প কয়দিন পূর্বে বিহারের ভূমিকম্পে বহু লোক হতাহত এবং বহু লক্ষ টাকার ভূসম্পত্তি ধূলিসাৎ হলে গান্ধীজি বলে বসেছিলেন, "অস্পৃশ্যতা-পাপের ফলে এটি ঘটেছে"— এই অযৌক্তিক উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন কবি। কিন্তু গান্ধীজির মহাপ্রাণের মহত্ত্ব কেউ তো অস্বীকার করতে পারে না; রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, "আমি গান্ধীজিকে স্বাগত করছি।"

১৩৮

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিয়াত্তর বৎসর বয়সে দলবল নিয়ে কবি চললেন সিংহলে। ইতিপূর্বে ১৯২২ ও ১৯২৮ সালে দুবার সে দেশে গিয়েছিলেন, গান বা অভিনয়ের দল সঙ্গে ছিল না।

এবার চলেছেন স্টিমারে। জন্মদিন কাটল বঙ্গোপসাগরের বুকে। গতবার এই দিনে ছিলেন তেহারানে।

কলম্বোতে কবির বক্তৃতা, কবির চিত্র-প্রদর্শনী ও 'শাপমোচন' অভিনয় হল। ভারতীয় নৃত্যগীত ও সাজসজ্জা সিংহলীদের নিকট আজ অজ্ঞাত, অপূর্ব। বহু শতাব্দী ধরে পোর্তুগীজ ডাচ ও ইংরেজের অধীনে থাকায় লোকে অত্যন্ত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়ে গেছে— এমন-কি বৌদ্ধধর্মী হলেও তাদের অনেকের নামের অর্ধেকটা হয় পর্তুগীজ নয় ডাচ। সিংহলীদের কাছে ভারতীয় নৃত্য-কলা নূতন লাগল, ভালোও লাগল। ইতিপূর্বে দু'চার জন সিংহলী ছাত্র শান্তিনিকেতনে এসেছে; কিন্তু এবার থেকে সিংহলী ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে আসতে শুরু করল বিশ্বভারতীর কলাভবনে, সংগীত-ভবনে। এত বড়ো বিজয়, শুধুই সাংস্কৃতিক বিজয়, বোধ হয় বিজয়সিংহের পরে আর হয় নি।

কলম্বো ছাড়া গালে, হোরানা, কান্‌ডি, মাতারু প্রভৃতি স্থানে কবি গিয়েছিলেন। সিংহলী সংস্কৃতির অনেক-কিছু দেখলেন, বুঝলেন, জানলেন। কান্‌ডি শহরে সাত দিন ছিলেন। সেখানকার শান্ত পরিবেশে বাস-কালে কবি তাঁর 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি শেষ করলেন। এই নিরন্তর চলাফেরা

নৃত্যগীত আদর-অভ্যর্থনার উত্তেজনার ভিতরে ভিতরে অন্ত-এলার প্রেমদ্বন্দ্বের কাহিনী কবিচিত্তে অন্তর্বাহিনী ফল্গুর ন্যায় বয়ে আসছিল। কান্‌ডি থেকে গেলেন অনুরাধপুরে, প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখে এবার এলেন জাফ্‌নায়। জাফ্‌না শহর সিংহলের তামিল-সংস্কৃতির কেন্দ্র। উত্তরসিংহল এক কালে তামিল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। সেই থেকে পুরুষানুক্রমে তামিলদের বাস এখানে। জাফ্‌নায় তিন দিন 'শাপমোচন' অভিনীত হল, আর-একদিন কবির বক্তৃতা। ১৯৩৪ সালে জুন মাসের মাঝামাঝি কবি ধনুষ্কোটি হয়ে ভারতে ফিরলেন।

১৩৯

পূজাবকাশে বিদ্যালয় বন্ধ হলে আবার চললেন দক্ষিণভারতে। পূর্বে সিংহল থেকে ফেরার পথে মাদ্রাজে থামবার ইচ্ছা ছিল, সময় ছিল না। তাই শাপমোচনের দল নিয়ে আবার এই অভিযান। মাদ্রাজে দিন-চার অভিনয় হল বটে, কিন্তু রসের আবেদন ঠিক পৌঁছল না স্থানীয় সামাজিকদের মনে। অর্থার্জনের দিক থেকে অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছিল, আর্টের দিক থেকে অভিনন্দিত হয় নি। দিন-বারো মাদ্রাজে থেকে, ওয়াল্‌টেয়ার হয়ে দেশে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে কাশী-হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে ভাষণ দেবার আহ্বান এসেছে। রওনা হওয়ার মুখে সংবাদ এল মালবীয়জি অসুস্থ হয়ে পড়ায়, সমাবর্তন উপস্থিত মুলতুবি রইল। কিন্তু কবির মন একবার যখন বিচলিত হয় তখন তাঁর শরীরকে অচলতায় বন্দী রাখা কঠিন, তাঁর এই চিরকালের স্বভাব এবং সেটি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে। সুতরাং কাশী গেলেন, দিন পাঁচ-ছয় পরে ফিরে এলেন (৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪)। দু মাস পরে ফেব্রুয়ারি মাসে আবার যেতে হয় সমাবর্তন-অনুষ্ঠানে।

কবির যেদিন কাশী রওনা হওয়ার কথা— ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫— সেদিন বিশ্বভারতী দেখতে এলেন বাংলার লাটসাহেব স্যার জন আণ্ডার্‌সন। আণ্ডার্‌সন জবর্দস্ত লাট, বাংলাদেশের বিপ্লবীদের দমন করেছেন বলে সরকারি মহলে তাঁর খুব খ্যাতি ও প্রতিপত্তি— আয়ার্‌ল্যাণ্ডের সন্ত্রাস-

বাদীদের তিনি নাকি ইতিপূর্বে সায়েস্তা করে এসেছিলেন। এমন দোর্দণ্ড লাটসাহেব আসছেন বলে শান্তিনিকেতন পুলিশে ও গুপ্তচরে ছেয়ে গেল। কয়দিন পূর্বে জেলার পুলিশ-বিভাগের কর্তা এসে বলেছিলেন যে, লাটসাহেবের নিরুবিঘ্নতার অনুরোধে তাঁরা কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে আটকাতে চান। কবি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তা হলে আপনারা লাটসাহেবের অভ্যর্থনা করুন, আমি এখান থেকে চললাম। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা হল যে, গভর্নরের আগমনের দিন আশ্রমে কেউ থাকবে না, লাটসাহেব এসে শূন্যপুরী দেখে যান। ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের বাংসরিক উৎসব, ছাত্র অধ্যাপক সকলেই শ্রীনিকেতনের মেলায় চলে গেলেন। বিভাগীয় অধ্যক্ষরা থাকলেন পুলিশের লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ নিজ বিভাগে লাটসাহেবকে অভ্যর্থনা করতে। আণ্ডার্‌সন সাহেব আশ্রম দেখে গেলেন। সেদিন অনেকেরই 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তির কথা মনে হয়েছিল।

কবি সেইদিনই অপরাহ্ণে কাশী রওনা হয়ে গেলেন হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-ভাষণ এই প্রথম। কবিকে বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করলেন।

১৪০

রবীন্দ্রনাথ কাশী থেকে মোটরে এলাহাবাদে গেলেন। সেখানে কয়েকটা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে হল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সম্মেলনেও কিছু বললেন।

এখান থেকে কবি চলেছেন লাহোর-ছাত্রসম্মেলনের আহ্বানে। এলাহাবাদে শরীর খারাপ হওয়ায় দীর্ঘপথ উজিয়ে লাহোরে যেতে অনেকেই নিষেধ করে-ছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিবৃত্ত করা গেল না।

লাহোর পৌছলেন ১৪ই ফেব্রুয়ারি; ধনীশ্রেষ্ঠ ধনীরাম ভল্লার অতিথি হলেন। কবি ইকবাল তখন লাহোরে ছিলেন, পাছে শহরে থাকলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে হয় তাই নাকি শহর ছেড়ে চলে যান— এমনও শোনা গেছে।

লাহোরে দুই সপ্তাহ কাটালেন। বহু লোকের সঙ্গে দেখা হল। তখন পাঞ্জাবে নানা মতের ঘূর্ণিধূলি উড়ছে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদের ফাটল ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সমসাময়িক একপত্রে লিখলেন, "পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম, তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তা-জনক এবং লজ্জাকর রূপে অসভ্য। বাংলার অবস্থা তো জানোই—এখানে উভয় পক্ষের ধিক্কৃত সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে প্রায়ই যে-সব বীভৎস অত্যাচার ঘটছে তাতে কেবল অসহ্য দুঃখ পাচ্ছি তা নয়, আমাদের মাথা হেঁট করে দিল।" এখানে এবার কবির সঙ্গে শিখেদের ঘনিষ্ঠতা হল; তার দরকারও ছিল। কিছুকাল পূর্বে 'গুরু গোবিন্দ' কবিতার উর্দু তর্জমা পড়ে শিখেরা কবির উপর খুবই খাপ্পা হয়। সেই বিকৃত উর্দু তর্জমা থেকে শিখেদের ধারনা হয় যে, কবি বুঝি গুরুগোবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। এবার তাদের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে কথাবার্তা হওয়াতে ভুলের মেঘ কেটে গেল। তাঁরা কবির ঋষিকল্প মূর্তি দেখে মুগ্ধ; কথাবার্তা শুনে আরও আকৃষ্ট হয়ে গুরুদ্বারে তাঁর সম্বর্ধনা করলেন।

লাহোর থেকে ফেরার পথে লখ্‌নৌয়ে দু দিন থাকলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের বাসায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রকাব্য ও সংগীত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তাঁর চেষ্টায় গানের আসর হল; শ্রীকৃষ্ণ রতন্‌জন্‌কারের গান শুনলেন মাঝ-রাত পর্যন্ত বসে, জ্বর গায়ে। শান্তিনিকেতনে ফেরবার পরে ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে সংগীত সম্বন্ধে কবির দীর্ঘকাল পত্র-বিনিময় হয়; 'সুর ও সঙ্গতি' নামের বইখানিতে সেই-সব পত্র এবং পত্রোত্তর সংকলিত আছে।

১৪১

রবীন্দ্রনাথ উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন। উত্তরায়ণের বাড়িতে কেউ নেই। রথীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়েছেন এল্‌ম্‌হার্‌স্টের সঙ্গে শ্রীনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করতে। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত ডার্টিংটন ট্রাস্ট থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৩৫ সালের পর ভারতে নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে, তার পরেও ট্রাস্ট্ থেকে টাকা পাওয়া যাবে কি না

জানা প্রয়োজন।

কবির মন এখন মেতে উঠেছে মাটির ঘর 'শ্যামলী' নিয়ে। তার মাটির দেওয়াল, মাটির ছাদ হবে—আলকাতরা মাটি গোবর মিলিয়ে-মিশিয়ে ও পচিয়ে একটা মশলা তৈরি হচ্ছে ঘরের জন্য। নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ করের সঙ্গে পরামর্শ চলছে; ভাবছেন এটা কার্যোপযোগী হলে গ্রামে খড়ের চালের যে অসুবিধা তা দূর হতে পারে। পরীক্ষা করা হচ্ছে ব্যবহারিক প্রয়োজনের কথা ভেবে।

কবির পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনে 'শ্যামলী'তে গৃহপ্রবেশ হল। সেই সন্ধ্যায় রাজশেখর বসুর 'বিরিঞ্চি বাবা' অভিনয় করা হয়; কবি নাটকটার কয়েক জায়গায় অদল-বদল করে দিয়েছিলেন এবং অভিনয়ক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

জন্মোৎসবের পর (মে ১৯৩৫) রবীন্দ্রনাথ গঙ্গায় নৌকাবাসে গেলেন। তার পূর্বে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কবির চুয়াত্তর বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে একটা সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। তা ছাড়া বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে সভাপতি হয়ে 'বুদ্ধদেব' সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। কবি সেদিন বললেন, "আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি, আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় [১৩৪২] তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে চাই।" কিছুকাল পূর্বে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ থেকে 'বুদ্ধদেব' নামে যে বইখানি বের হয়েছে সেটি দেখলেই পাঠক বুঝতে পারবেন বুদ্ধদেবের প্রতি কবির শ্রদ্ধা কত গভীর ও সুচিরস্থায়ী।

গঙ্গাবক্ষে নৌকায় ঘুরছেন; চন্দননগরের ঘাটে এসে নৌকা বাঁধা হল। "সামনেই সেই দোতলা বাড়ি যেখানে একদা জ্যোতিদাদার সঙ্গে অনেক-দিন" কেটেছিল। "সে বাড়ি বে-মেরামতী অবস্থায়" জীর্ণ; তাই কবির ইচ্ছা পাশের একটা বাড়ি ভাড়া নেবেন। আজ পঁচাত্তর বৎসর বয়সে মনে পড়ছে প্রথম যৌবনের কথা; মনে পড়ছে স্নেহময়ী নতুন-বৌঠানের কথা যাঁকে ঘিরে কবিমনের অনেক কথা-কহা ও অনেক গান-গাওয়া উদ্রিক্ত হয়েছিল।

এই সময় কবির রচনাবলী সম্পূর্ণভাবে ছাপানোর একটা প্রস্তাব হচ্ছে। প্রশান্তচন্দ্র-প্রমুখের মতে, কবির কোনো লেখা বর্জন করা চলবে না, কবি যে বয়সে যা লিখেছেন সবই অবিকল অবিকৃত ছাপতে হবে। তাই নিয়ে কবির সঙ্গে চিঠিপত্র চলছে। রবীন্দ্রনাথ 'অবর্জিত' কবিতায় তাঁকে লিখলেন :

প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক ;
কিন্তু হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ।

কিন্তু সে কথা তো সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরা মানবেন না। তাঁরা চান সমগ্রটিকে, সমস্ত মালমশলা মজুত থাকা দরকার। তার পর সাহিত্য-রসিকেরা বাছাবাছি ও বিচার-বিশ্লেষণ করবেন।

এবার গঙ্গাবক্ষে নৌকাবাস পর্বটা সাহিত্যসৃষ্টির দিক থেকে একেবারে বন্ধ্যা হয় নি।

১৪২

গঙ্গাবক্ষে বাস করে শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। প্রতিদিন প্রাতে বসেন, কিছু লেখাপড়া করেন। কবিতাও জমছে। সেগুলি চিরচেনা ছন্দোবদ্ধ কবিতা, বীথিকায় সংকলিত হয়েছে। 'পরিশেষ'এ দাঁড়ি টানার সঙ্গে সঙ্গে 'পুনশ্চ' শুরু করেন। তার পরে 'শেষ সপ্তক' লিখে জানাতে চেয়েছিলেন, শেষ কথা বুঝি বলা হয়ে গেল। কিন্তু কবি-অন্তরের অফুরন্ত ধারা— বিচিত্র ভাব বিচিত্র সুরে কেবলই বিচিত্র রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে।

একটা দুঃসংবাদ পেলেন— দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতায় হঠাৎ মারা গেছেন (৫ শ্রাবণ ১৩৪২)। দিনেন্দ্রনাথ গত বৎসর শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। যিনি আশ্রমের সঙ্গে নানাভাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর যুক্ত ছিলেন, যিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের "বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী" এবং রবীন্দ্রনাথের "সকল গানের ভাণ্ডারী", যিনি কবির অসংখ্য গানের সুর অভ্রান্ত স্মৃতিতে সঞ্চয় করে ও

কণ্ঠে ধারণ করে আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের রবীন্দ্রসংগীতে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করে দিয়েছেন, কেন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গেলেন অল্প কথায় তার সদুত্তর দেওয়া যায় না। অথচ আমাদের জানা আছে, কলিকাতায় গিয়েও রবীন্দ্রসংগীত-প্রচারের বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন না। দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদের অল্প পরে রবীন্দ্রনাথ বর্ষামঙ্গল-উৎসবের যে-কয়টি গান লেখেন তার একাধিক স্থলে কথায় ও সুরে এই বিয়োগের প্রচ্ছন্ন বেদনা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কবির এখন যে বয়স তাতে মৃত্যু-আঘাত আর আঘাত বলেই মনে হয় না, কারণ, অনেক সহ করেছেন দীর্ঘ জীবনে। শরীর দুর্বল হয়ে আসছে বয়সের সঙ্গে। কানে কম শুনছেন, চোখের তেজও ম্লান হয়ে আসছে, চলাফেরাতেও কষ্ট বোধ হয়— বার্ধক্যের সকল লক্ষণই দেহে দেখা দিচ্ছে, মন এখনো উজ্জ্বল।

সামাজিক অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট অতিথিদের সম্বর্ধনা, আগন্তুকদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ এখনো করেন সাধ্যমত। এই সময়ে শান্তিনিকেতনে এলেন জাপানী কবি য়োনে নোগুচি। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম জাপানে গিয়েছিলেন, সে সময়ে তরুণ কবি নোগুচি ভারতীয় কবির প্রতি প্রচুর সম্মান দেখান। আজ তিনি প্রৌঢ় বয়সে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজস্থানে দেখতে এলেন। কবি যথোচিতভাবে তাঁর সম্বর্ধনা করলেন; তাঁকে বিশ্বভারতীর সম্মানিত 'প্রধান'দের অন্যতম করা হল।

কলিকাতায় না গিয়ে কবিতা লিখে পাঠিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে সংবর্ধনা (১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৫) জানালেন, আর রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের জন্ম-শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্যও চার পংক্তি কবিতা ও তার ইংরেজী তর্জমা লিখে পাঠালেন। কবি এ পর্যন্ত কখনো পরমহংসদেব সম্বন্ধে কোনো ভাষণ বা উক্তি করেন নি; এবার যে করলেন তার পেছনে ছিল অন্যের অনুরোধ। 'শতবার্ষিক' কমিটির ধর্মমহাসম্মেলনে কবি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি পরমহংসদেবের ধর্মমত বা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন নি, কেবল বুঝিয়েছিলেন ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকার কী সর্বনাশা পরিণাম।

মহড়া চলছে 'অরূপরতন' নাটকের— এটি 'রাজা' নাটকের অন্যতম রূপান্তর। কলিকাতায় চললেন দলবল নিয়ে; এম্পায়ার-থিয়েটরে দুদিন

অভিনয় হল (১১, ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৫)। অভিনয় উৎরে গেল, কিন্তু নিজে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন— পঁচাত্তর বৎসর বয়সে এত শ্রম, এত উদ্‌বেগ, এত উত্তেজনা সইবে কেন? এ জন্য উড়িষ্যার সংগীতসম্মেলনে যাওয়া হল না।

১৪৩

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় শিক্ষাসপ্তাহপালন ও নবশিক্ষা-সংঘের অধিবেশন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে। সপ্তাহব্যাপী শিক্ষাবিষয়ক সভা প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন হয়েছে।

নবশিক্ষাসংঘ (New Education Fellowship) য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠান, ১৯৩০ সালে য়ুরোপ-ভ্রমণ-কালে এলসিনোরে এঁদের এক অধিবেশনে কবি উপস্থিত ছিলেন। ভারতে তার এক শাখা শান্তিনিকেতনে স্থাপিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতীয় শাখার সভাপতি, সম্পাদক ছিলেন শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীঅনিলকুমার চন্দ।

শিক্ষাসপ্তাহের সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ দুটি ভাষণ দিলেন, তার মধ্যে 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ'টি 'শিক্ষা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই ভাষণের শেষে 'পুনশ্চ' -আকারে একটা প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পেশ করেছিলেন। কবি তাতে বলেছিলেন যে-সব লোকের স্কুলে পড়বার সুযোগ নেই, তাদের জন্য গৃহশিক্ষার ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করা দরকার। সরকার থেকে তার উদ্যোগ না হলে এটা দেশব্যাপী হতে পারে না। বলা বাহুল্য, হিতকথা রাজনীতিকদের কানে পৌঁছয়, প্রাণে পশে না। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ কাজের ভার নিলেন, বিশ্বভারতী থেকে 'লোকশিক্ষাসংসদ' স্থাপিত হল।

শিক্ষাসপ্তাহ-সম্মেলন থেকে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। তাঁর মনে হচ্ছে, বহুকাল গীতহীন কাব্যহীন জীবন কেটেছে। জীবনদেবতাকেই যেন বলছেন "আমার দুই চক্ষুর বিস্ময়কে ডাক দিতে ভুলে গেলে।" কিন্তু এ আপশোষ বেশি দিন টিকল না— 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যকে নৃত্যনাট্যের রূপ দিতে বসলেন। ইতিপূর্বে 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন'কে নৃত্যনাট্যে

রূপায়িত করেছিলেন; কিন্তু সেখানে নাট্যবস্তু অত্যন্ত ক্ষীণ বলে সর্বাঙ্গ-সুন্দর নৃত্যনাট্য দেহ ধরে উঠতে পারে নি— সেটা যে কী ও কেমন করে সার্থক হতে পারে, তার পুরোপুরি ধারণা সম্ভবপর হয় নি। 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'য় নৃত্য গীত অভিনয় অঙ্গাঙ্গী সার্থকতায় উজ্জ্বল ও অপরূপ হয়ে উঠেছে।

কালান্তর হয়েছে; পঁচিশ বৎসর পূর্বে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে 'চিত্রাঙ্গদা' 'পরিশোধ' প্রভৃতি ছাত্রদের পাঠ করা নিষিদ্ধ ছিল। এখন সেখানেই ছাত্র ছাত্রী অধ্যাপকে মিলে এই-সকল রচনার আবৃত্তি বা অভিনয় করছেন। আর্টের নূতন প্রেরণায় কবির জীবনের ও মতের অনেক বিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কতটা আগন্তুক নানা প্রভাবে, কতটাই-বা জীবনব্যাপী আর্টের সাধনাতে ক্রমিক সংস্কারমুক্তি-বশতঃ, তা বলা কঠিন।

মনে আছে ১৯১০ সালে যখন 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র মতো নাটিকায় শান্তি-নিকেতনের মেয়েরা অভিনয় করেন, তখন কোনো পুরুষ অধ্যাপক ও ছাত্র সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তার পর বিশ বৎসরের মধ্যে যুগান্তর হয়ে গেছে। এখন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ও কলেজে সহশিক্ষা প্রচলিত হয়েছে, দেশের অন্য নানা স্থানেও ঐরূপ হচ্ছে বা হবে— নূতন দৃষ্টিতে দেখে শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থার উদ্ভাবন অনিবার্য সন্দেহ নেই।

বাল্মীকিপ্রতিভায় নারীচরিত্র অল্প, তাও ঠাকুর-বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে আত্মীয় মেয়েরা মিলে অভিনয় করেন। 'মায়ার খেলা'র প্রাথমিক অভিনয়ে মেয়েরাই সমুদয় ভূমিকায় নামেন। কেবলমাত্র ছেলেরা অভিনয় করবে ব'লে এক সময়ে কবি মুকুট, শারদোৎসব, অচলায়তন, গুরু প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। তেমনি শুধু মেয়েদের উপযোগী করে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' 'নটীর পূজা' প্রভৃতি লেখা হয়। এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, কবির জীবিতকালে, তাঁর প্রযোজনায়, 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'য় অর্জুনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীমতী নিবেদিতা; ঐরূপ 'পরিশোধ' বা 'শ্যামা'য় বজ্রসেন বা উত্তীয়ের ভূমিকাও গ্রহণ করেন মেয়েরাই। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের সংস্কার আচরণ ব্যবস্থা যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে (কখনো-বা দু-এক পা আগে আগে) পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল। মনুষ্যচরিত্র তিনি বুঝতেন, অধিকারীভেদের বিষয়েও অবহিত

ছিলেন। না বুঝে, কবির কাজের বা কথার অনুকরণ করলে জাতি অগ্রসর হওয়া দূরে থাক্‌, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতেও পারবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

১৪৪

স্থির হল 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র দল নিয়ে কবি উত্তরভারত-ভ্রমণে যাবেন। বিশ্বভারতীর অর্থ-উপার্জন এবং বাংলাদেশের নৃত্যগীতের প্রচার একসঙ্গে দু কাজই হবে। বিরাট এক বাহিনী নিয়ে কবি পাটনা, এলাহাবাদ, লাহোর পর্যন্ত ঘুরে এসে দিল্লিতে উপস্থিত হলেন।

দিল্লিতে দল উপস্থিত হলে গান্ধীজি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন; শুধালেন বিশ্বভারতীর কত টাকা ঘাটতি, যেজন্য কবিকে এই বয়সে এমন ভাবে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। শুনলেন ষাট হাজার টাকার ঘাটতি। গান্ধীজি সেই টাকার ব্যবস্থা ক'রে কবিকে বললেন, আর এই বয়সে এ ভাবে ঘুরে বেড়াবেন না। মীরাটে পূর্বেই আয়োজন করা হয়েছিল বলে সেখানে অভিনয়ের দল নিয়ে যেতে হয়েছিল। তার পর (১৯৩৬) কলিকাতায় ফিরে এলেন।

গান্ধীজির ব্যবস্থায় এই ষাট হাজার টাকা পাওয়ায় বিশ্বভারতীর পুরাতন ঋণ শোধ হল। কর্তৃপক্ষ ঋণমুক্ত হয়ে কাজ শুরু করলেন। কবি নিশ্চিন্ত। কিন্তু সে কয়দিন? "এ কেবল দিনেরাত্রে, জল ঢেলে ফুটা পাত্রে, বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।"

১৪৫

আষাঢ়ের শেষ দিকে (১৩৪৩) শান্তিনিকেতনে এলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও রাজনীতিক তুলসী গোস্বামী। তাঁরা এসেছেন কলিকাতায় কবিকে নিয়ে যেতে; সেখানে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে হবে। সভাটা হচ্ছে— প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা -নীতির বিরুদ্ধে জনমত উদ্‌বুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে। পুনাচুক্তিতে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় হিন্দু মুসলমানের সংখ্যানুপাতিক ক্ষমতার ভাগ-

বাঁটোয়ারা মেনে নেওয়ায়, মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশে হিন্দুদের হল মুশকিল। সংখ্যানুপাতে মুসলমানেরা প্রতিনিধিত্ব ও চাকুরি প্রভৃতি তো বেশি করে পাচ্ছেই, তার উপর এত কাল তারা শিক্ষায় দীক্ষায় পিছিয়ে ছিল বলে বিদেশী সরকার মেহেরবানি করে তাদের আরও বেশি চাকরি-বাকরি দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। বেশ বোঝা গেল, সরকার ভেবেছেন, হিন্দুরা রাজনীতিক্ষেত্রে বরাবর উৎপাত সৃষ্টি করে আসছে ব'লে তাদের ন্যায্য জীবিকা হরণ ক'রে অন্ত সম্প্রদায়কে দিলে 'দুষ্টের' দমন ও 'শিষ্টের' পালন ছাড়াও পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষার আগুন সর্বদাই জাগিয়ে রাখা যাবে —অতিপ্রাচীন আর শাসকগোষ্ঠীর অতীব মনোমত 'ভেদনীতি' যার নাম। ইংরেজ-রাজের এই কূটনীতির বিরুদ্ধে জনসভা আহূত হয়েছিল, মুসলমানদের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ নয়।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় গেলেন, টাউন-হলে সভা (১৫ জুলাই ১৯৩৬) হল। তিনি তাঁর ভাষণে হিন্দুসমাজ বা আতঙ্কিত বর্ণহিন্দুর স্বার্থ ও প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্য ওকালতি করলেন না; সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডার উপর 'আরও দাও' দাবির প্রতিবাদও জানালেন না; তিনি বললেন, ধর্ম তথা সম্প্রদায় -নিরপেক্ষ রাষ্ট্রতন্ত্র ভারতীয়দের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। তিনি বললেন, এই সম্প্রদায়গত রাজ্যশাসননীতি নিঃসন্দেহই আসন্ন বিপদের অশুভ সঙ্কেত, দুটি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধবার পূর্বাভাস। আর এতে করে বাঙালির রাজনৈতিক শক্তিই যে শুধু খর্ব হবে তা নয়, অর্থনৈতিক উন্নতির পথও প্রতিরুদ্ধ হবে। কবির বাণী ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার বাণী। আজ দুই বাংলারই অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত।

কলিকাতায় দু দিন থাকলেই নানা দিক থেকে নানা জনের টানাটানি, বয়স ছিয়াত্তর হলেও। তবে এবার যে-একটি আহ্বানে সাড়া দিতে হল সেটা খুব অরুচিকর নয়। শরৎচন্দ্রের গৃহে একদিন যেতে হল রবিবাসরের অধিবেশনে (৩ শ্রাবণ ১৩৪৩)।

শান্তিনিকেতনে ফিরে কংগ্রেস-সভাপতি জওহরলাল নেহরুর পত্র পেলেন। ভারতের সর্বত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন, মানবের সেই জন্মগত

অধিকার রক্ষার জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা-সংঘ গড়া হয়েছে— কবিকে তাঁরা 'এই সংঘের সভাপতি করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে বিলাতের সিভিল লিবার্টি ইউনিয়নেরও ভাইস্‌প্রেসিডেণ্ট তাঁকে করা হয়; সেটি করেন নেভিন্‌সন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবটাই কাব্যও নয়, ধর্মও নয়— আর রাজনীতির দমকা হাওয়াও পালে এসে লাগে। টাল খেয়ে নৌকাডুবি হতে পারে না; কারণ, শক্ত হাতে হাল ধরে থাকেন কবির জীবনতরীর যিনি নেয়ে।

উপস্থিত গুরুগম্ভীর-দার্শনিক-তত্ত্ব-পূর্ণ মিল-হীন গদ্যছন্দে লেখা কবিতার মাঝে মাঝে কোথা থেকে আসছে খাপছাড়া কবিতার ঝাঁক, দায়মুক্ত মনের বল্‌গাহীন কল্পনা। সঙ্গে সঙ্গে চলছে যদৃচ্ছা খেয়ালে বুঝে না বুঝে জেগে-দেখা স্বপ্নের বিস্ময়সৃজন— অজস্র অভাবিত রূপ, অদ্ভুত ছবি, আশ্চর্য নক্সার লিখন।

'খাপছাড়া' কবিতা একত্র ক'রে (নিজেই প্রত্যেক কবিতার ছবি এঁকে বা ছবির কবিতা লিখে) উৎসর্গ করলেন শ্রীরাজশেখর বসুকে। ইতিপূর্বে কবি পরশুরামের গড্ডলিকা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি শুধু কাব্য-উৎসর্গ করেন নি; রাজশেখর বসু মহাশয়কে বিশ্বভারতীর ভিতর টানবার প্রত্যাশায়, আই. এসসি ক্লাসের ল্যাবরেটরির দরজায় (টিনের ঘরে) পাথরের ফলকে 'রাজশেখর-বিজ্ঞানসদন' লিখিয়েছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এ-সব করা তা সফল হয় নি।

১৪৬

শান্তিনিকেতন একঘেয়ে হয়ে উঠলেই কলিকাতায় পালান। এবার মহলানবিশদের বরাহনগরের নূতন বাড়িতে উঠলেন। সভাসমিতির আহ্বান ছিল না, ভেবেছিলেন "আরামে দিবস যাবে।" কিন্তু শান্তিনিকেতনে ফিরে লিখছেন— "রাজধানীর উৎপীড়নে হাঁপিয়ে উঠল প্রাণ, পালিয়ে এলেম"।

পূজার ছুটি আসছে; একটা-কিছু অভিনয় করতে হবে। তাই 'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' গল্পটাকে নৃত্যনাট্যের রূপ দিলেন। তার পর

দলবল নিয়ে কলিকাতায় উপস্থিত হলেন; অভিনয় হল আশুতোষ কলেজ-হলে।

এই সময়ে কলিকাতায় শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী হচ্ছে; কবি উপস্থিত হয়ে শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা জানালেন। পরস্পরের মধ্যে নানা সময়ে মতভেদ হয়েছে সত্য, কিন্তু পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁরা হারান নি। রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র দেবতার মতো ভক্তি করতেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে মতান্তরের ফলে কারো সঙ্গে মনান্তর হতে বড়ো দেখি নি। কলিকাতায় থাকতে থাকতে আর-এক দিন নিখিলবঙ্গ-নারীকর্মী সম্মেলনের উদ্‌বোধন করে কবি একটি ভাষণ দিলেন; 'নারী' প্রবন্ধটিতে বর্তমান যুগের মেয়েদের বহু সমস্যার আলোচনা দেখতে পাই।

কবি কলিকাতা থেকে ফিরে শ্রীনিকেতনে উঠলেন। সেখানে তেতলায় একা আছেন, বেশ ভালো লাগছে। আকাশ খুব কাছে, আলোর বাধা নেই কোথাও, লোকজনও সর্বদা ঘাড়ের উপর এসে পড়ে না।

জওহরলাল এলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে; উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তা কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখেন নি, নয়তো রাখলেও প্রকাশ করেন নি।

১৪৭

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের নিকট ভাষণ দিতে কবির আহ্বান এসেছে। এখন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশি বৎসরের ইতিহাসে (১৮৫৭-১৯৩৭) তথাকার কর্তৃপক্ষীয়েরা বেসরকারি কোনো ব্যক্তিকে এ পর্যন্ত এমন সম্মানের আসনে আহ্বান করেন নি। রবীন্দ্রনাথও অভূতপূর্ব কার্য করলেন— তিনি বাংলায় তাঁর ভাষণ পড়লেন। ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের লোকের মাতৃভাষায় কেউ ছাত্রদের কাছে কথা বলেন নি। রবীন্দ্রনাথ নূতন পথ দেখালেন।

কলিকাতায় এলে কবি প্রায়ই বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্রের বাড়িতে ওঠেন। সেখানে থাকতে থাকতেই একদিন নৌকা করে চন্দননগরে

সাহিত্যসম্মেলনের উদ্‌বোধন করে এলেন। আর-এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে সর্বধর্মসম্মেলনে ভাষণ দিলেন। ধর্মের মূলতত্ত্ব ও ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়ার বিচারই ছিল ভাষণের মূল কথা—"যে ধর্ম আমাদের মুক্তি দিতে আসে সেই হয়ে ওঠে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রচণ্ড শত্রু। সব বাঁধনের মধ্যে ধর্মনামাঙ্কিত বাঁধন ভাঙাই সব চেয়ে কঠিন। সব গারদের চেয়ে জঘন্যতম সেটা যা অদৃশ্য, যেখানে মানুষের আত্মা মোহজনিত আত্মপ্রবঞ্চনায় বন্দী।" বাংলাদেশ এ সময়ে সাম্প্রদায়িকতাবিষে জর্জরিত। তাই কবির মনে এই কথাটাই জাগছিল বেশি ক'রে।

শান্তিনিকেতনে ফিরলেন প্রায় মাসেক কাল পরে (৭ মার্চ ১৯৩৭)। কয়েক দিন পরে এলেন কলিকাতা থেকে রবিবাসরের সদস্যগণ, প্রায় চল্লিশ জন্। এ ভাবে সাহিত্যিক বা সাহিত্যামোদীদের সমাবেশ ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। কবির জীবিতকালে শান্তিনিকেতনে কখনো কোনো সাহিত্য-সম্মেলনও হয় নি।

১৪৮

১৩৪৪ সালের নববর্ষের দিন শান্তিনিকেতনে চীনাভবনের উদ্‌বোধন হল। জওহরলাল নেহরুর আসবার কথা ছিল, আসতে না পারায় কন্যা ইন্দিরার হাত দিয়ে তাঁর ভাষণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিষয়টি আসলে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের অন্তর্গত ঘটনা। এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে ভারতকে বাঁধবার জন্য এ কালে সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছিলেন। ১৯২১ সালে অধ্যাপক লেভিকে বিশ্বভারতীতে আনেন এবং তখন থেকেই চীনা ও তিব্বতী ভাষার, বৌদ্ধ সংস্কৃতির আলোচনা শুরু হয়—আজ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনাভবন প্রতিষ্ঠিত হল।

বিদ্যালয়ে গরমের ছুটি হয়ে গেলে কবির মন বাইরে যাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল; এবার কবি সপরিজন আলমোড়া পাহাড়ে চললেন। সঙ্গে চলেছে রাশীকৃত বিজ্ঞানের বই, আর নন্দলালের আঁকা বহু কার্ডস্কেচ।

আলমোড়ায় বসে লিখলেন 'বিশ্বপরিচয়' ও 'ছড়ার ছবি'। 'বিশ্বপরিচয়'

বইখানা প্রথমে লিখতে দেন বিশ্বভারতীর পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্তকে। পরে কবি নিজেই সেটা লিখতে আরম্ভ করে দেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের সব কথা সহজবোধ্য নয়। এ জন্য কবি সে সম্বন্ধে বহু বই পড়লেন, বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবলেন, অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিষয়গুলি বুঝে নিলেন— তার পর লেখা আরম্ভ করেন। কবির বহু দিনের ইচ্ছা 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' নামে সাধারণের সহজবোধ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের গ্রন্থমালা লিখিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে অল্প মূল্যে প্রচার করেন। অনেক বৎসর আগে একবার এই পরিকল্পনাটা কাগজে ছাপাও হয়, কিন্তু সেবার কাজে খাটানো যায় নি। এতদিনে সেই গ্রন্থমালার সূত্রপাত হল— বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে। কারণ কবির বিশ্বাস, "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার"। এ কথা সত্য যে, প্রথমে প্রমথনাথ এ বইয়ের খসড়া তৈরি না করলে, কবির পক্ষে বিশ্বপরিচয় লেখা সহজ হত না। উৎসর্গ করলেন অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে।

বিশ্বপরিচয় লেখার সঙ্গে সঙ্গে চলছে শিশুদের জন্য কবিতা-রচনা; সেগুলি সংকলন করে হল 'ছড়ার ছবি'। নন্দলালের স্কেচগুলি দেখে যে কল্পনা ও কাহিনী তাঁর মনে জেগেছে তাই স্বচ্ছন্দ ভাষায় হাল্কা ছন্দে সুন্দর করে লিখলেন। কর্মক্লান্ত মনকে অবগাহন করালেন শিশুমানসের স্নিগ্ধ সলিলে; নিজের শৈশবজীবনেও কল্পনায় আর-একবার সাঁতার দিলেন। এই আলমোড়ায় বহু বৎসর পূর্বে লিখেছিলেন 'শিশু'র কবিতা। এবারও লিখলেন শিশুদের জন্য। লেখা ও পড়া ব্যতীত, অবশিষ্ট সময় কাটান ছবি এঁকে। কত রূপ, কত মুখ, জগতে যার অস্তিত্বই নেই। আঁকতে আঁকতে ছবি রূপ নেয়; রূপ কল্পনা ক'রে ছবি আঁকেন না। কুমায়ুনের চিত্রীরা যে-সব দেশি রঙ ব্যবহার করেন, কবি সে-সব নিয়েও পরীক্ষা করেন।

১৪৯

দু মাস পরে আলমোড়া থেকে ফিরলেন (৩০ জুন ১৯৩৭)। কবি বেশ বুঝতে পারছেন তাঁর শরীর ভাঙছে। তাই বোধ হয় শেষবারের মতো পতিসর মহালে ঘুরে এলেন। একমাত্র উদ্দেশ্য পুরাতনকে আর-একবার

চোখে দেখে আসা— যার সঙ্গে এককালে জীবনের সুখ দুঃখ নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। পতিসর থেকে ফেরার পর টাউন-হলের এক জনসভায় কবিকে সভাপতিত্ব করতে হল (২ অগস্ট ১৯৩৭)। এই সভার উদ্দেশ্য আন্দামানে দ্বীপান্তরিত রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে জনগণের সহানুভূতি-প্রদর্শন ও লীগ-সরকারের হৃদয়হীন মনোবৃত্তি ও আচরণের প্রতিবাদ-জ্ঞাপন। সভাশেষে কবি আন্দামানে রাজবন্দীদের কাছে টেলিগ্রাম করে জানালেন যে, দেশ তাঁদের পিছনে আছে।

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন। প্রান্তরে বর্ষা নেমেছে। দীর্ঘদিন বিজ্ঞান, ছড়া ও ছবির মধ্যে মন ছিল নিবিষ্ট। বর্ষণমুখরিত দিনে এবার মনের মুক্তি এল গানে গানে। গানগুলি গেঁথে বর্ষামঙ্গল উৎসব করাবার জন্য কলিকাতায় গেলেন। 'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান হল।

কলিকাতা থেকে ফিরে কবি একদিন সন্ধ্যায় কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ হতচৈতন্য হয়ে পড়লেন (২৫ ভাদ্র ১৩৪৪)। দুই-একদিনের মধ্যে সামলে নিলেন সত্য, কিন্তু নূতন অভিজ্ঞতা হল অন্তর্‌জীবনের। সেই অভিজ্ঞতা থেকে যে কবিতা-ক'টি লেখেন তা 'প্রান্তিক' কাব্যে সংকলিত।

সুস্থ হয়েই যথাবিধি কাজ শুরু করলেন। বিশ্বপরিচয় মুদ্রিত হয়ে পড়ে ছিল, তার ভূমিকা লিখলেন ২রা আশ্বিনে।

শরীর ক্রমশ বিগড়ে যাচ্ছে তা কবি বেশ বুঝছেন। কলিকাতায় গেলেন চিকিৎসার জন্য, উঠলেন প্রশান্তচন্দ্রের বাড়িতে। কলিকাতায় তখন খুব উত্তেজনা ; কংগ্রেসের কর্মীদের সভা বসছে। গান্ধীজি-প্রমুখ সমস্ত নেতাই এসেছেন। কবির সঙ্গে অনেকেই দেখা করতে এলেন। মহাত্মাজিও কবির সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে কবিও গান্ধীজিকে দেখতে গেলেন।

জাতীয় সংগীত কী হতে পারে, তা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বাগবিতণ্ডা চলছে। একদল 'বন্দে মাতরম্' গানের পক্ষপাতী। জওহরলাল প্রভৃতির মতে, 'বন্দে মাতরম্' পুরোপুরি কখনোই ভারতের সর্বজাতির পক্ষে গ্রাহ্য হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে তাঁর মত কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালকে লিখে জানালেন ; কবিও সমগ্র গানটি জাতীয় সংগীত

-রূপে গ্রহণের পক্ষে মত দিতে পারলেন না। এরূপ অভিমত-প্রকাশের জন্য বাংলাদেশের কোনো কোনো উগ্রজাতীয়তাবাদী পত্রিকা কবিকে ভীষণ-ভাবে আক্রমণ করেন। এমন কথাও কেউ কেউ বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসংগীত বাংলাদেশকে কোনো প্রেরণাই দেয় নি। বলা বাহুল্য, কবি এ-সব কথা-কাটাকাটির মধ্যে প্রবেশ করেন নি। কংগ্রেসের অধিকাংশের মতানুসারে 'বন্দে মাতরম্' গানটির প্রথম স্তবক জাতীয় সংগীত-রূপে গৃহীত হল (নভেম্বর ১৯৩৭)।

১৫০

শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন। মন নানা কাজের মধ্যে ঘুরছে। 'বাংলাকাব্য-পরিচয়' সংকলন করাচ্ছেন। গীতবিতানের নূতন সংস্করণ তৈরি করবার জন্য সহস্রাধিক গানকে বিষয়-অনুসারে সাজাচ্ছেন— পূর্বের সংস্করণ ছিল কালানুক্রমে। নূতন করে সাজানোর ব্যাপারে কবির খাটুনি কম হয় নি, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে।

দেশবিদেশ থেকে চিঠিপত্র আসে, যথাসাধ্য উত্তর দেন। একখানা পত্র উল্লেখযোগ্য ; সেটা খোলা চিঠি রূপে বিলাতে মুদ্রিত হয়। ১৯৩৫ সনের নয়া শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয়দের মত কী, এই ছিল প্রশ্ন। কবি উত্তরে লিখলেন যে, ভারতকে যে ধরণের স্বরাজ দেওয়া হয়েছে তা যদি ইংরেজকে দেওয়া যেত তারা ঘৃণায় সেটাকে স্পর্শ করত না। তিনি স্পষ্টই বললেন, যত দিন ইংরেজ ভারতকে তার হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে চাইবে তত দিন তার পক্ষে আমাদের শ্রদ্ধা বা বন্ধুত্বের আশা করা বৃথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তখনো বৎসর-দুই দেরি। কবি য়ুরোপের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে যেটুকু জানতেন তাতে লিখলেন যে, য়ুরোপের জাতগুলি তো পরস্পর হননের বিপুল আয়োজনে নিযুক্ত (paving the path for mutual annihilation)— আজ জানি কথাটা দৈববাণীর মতোই সত্য।

সাময়িক ব্যাপার নিয়ে চিঠি লেখা; সভা করা, বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের বিবিধ কার্যে ঢেরা-সহি করা এ-সব নিত্যকর্ম তো আছেই ; রসলোকের নূতন প্রেরণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন চণ্ডালিকাকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করতে।

চণ্ডালিকা মূলতঃ ছিল গদ্যে রচিত ; এবার গদ্যছন্দে গানের স্বর যোগ করলেন— অভিনব পরীক্ষা। মিলহীন কবিতায় ইতিপূর্বে স্বর সংযোগ করেছেন— সে তালিকা ছোটো নয় ; প্রচলিত তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানের শেষে 'গ্রন্থপরিচয়' খুললেই সে ফিরিস্তি চোখে পড়বে।

দোল-পূর্ণিমায় বসন্তোৎসব-অনুষ্ঠানের পর চণ্ডালিকার দল কলিকাতায় গেল ; কবিকে যেতে দেওয়া হল না— ডাক্তারের নিষেধ। কিন্তু নিজের স্বর-সৃষ্টিকে নিজের পরিকল্পিত রূপরাগে মঞ্চস্থ দেখবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল ; ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা ক'রে, একখানি পত্র লিখে কলিকাতায় চলে গেলেন একজন সঙ্গী নিয়ে। 'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হয়ে দেখে এলেন নিজের রূপসৃষ্টি।

১৫১

গ্রীষ্মকালে এবার গেলেন কালিম্পঙ। এখানে পূর্বে আসেন নি। কালিম্পঙ শহরটি মহকুমার সদর হলেও অদূরবর্তী দার্জিলিঙের আকর্ষণ অনেক বেশি হওয়াতে, এখানে শৌখিন লোকের বিশেষ ভিড় হয় না— হৈচৈ ও উত্তেজনা অল্প এবং সামাজিকতার ক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ। কবির ভালোই লাগছে।

জন্মদিনে অল-ইণ্ডিয়া-রেডিয়োর বিশেষ ব্যবস্থায় জন্মদিন সম্বন্ধে একটি কবিতা পাঠ করলেন— সমস্ত দেশ কবির মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ঘরে বসে শুনতে পেল।

কালিম্পঙে একমাস কাটল ; লিখছেন 'বাংলাভাষা-পরিচয়'। এমন সময়ে মংপু থেকে মৈত্রেয়ীদেবী নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। ইনি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কন্যা ; এঁর স্বামী সিংকোনা বাগানের বড়ো কর্তা— মংপুতে থাকেন।

মংপুতে এই প্রথম এলেন। এই পরিবারের সঙ্গে এই প্রথম ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। মৈত্রেয়ীদেবী কবির বিশেষ স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠলেন— তাঁর লেখা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' না পড়েছেন এমন রবীন্দ্রসাহিত্যামোদী বোধ হয় বিরল। রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তা, ভাব ও ভাবনা, অতি সুনিপুণভাবে লেখা হয়েছে।

১৫২

পাহাড়ে দুই মাস কাটিয়ে এলেন। নানা কারণে মন খুবই উদ্‌বিগ্ন। উদ্‌বেগের প্রধান কারণ হচ্ছে চীন-জাপানের যুদ্ধ। কবির কাছে চীন ও জাপান দুই-ই সমান প্রিয়; তাই জাপানকে চীনের উপর উৎপাত করতে দেখে মনে আঘাত পাচ্ছেন। কয়েক দিন পূর্বে, চীনের উপর জাপানের আক্রমণ সম্বন্ধে এক কড়া চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চীন দেশে। সেটা প্রকাশিত হলে জাপানীরা কবির উপর খুবই বিরক্ত হয়ে উঠল। তাদের মুখপাত্র হিসাবে জাপানী-কবি য়োনে নোগুচি ভারতীয় কবির মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ জবাবে জাপানে রণোন্মত্তদের তৈমুরলঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে বললেন যে, জাপানের ব্যবহারে তিনি মর্মাহত হয়েছেন, কেননা জাপানকে তিনি বরাবর শ্রদ্ধা করে এসেছেন। কবির ভরসা, একদিন চীন ও জাপান এই তিক্ত ঘটনাবলীর কথা ভুলে গিয়ে পরস্পর হাত মেলাবে; এশিয়ায় মানবিকতা নূতন রূপ নেবে এই মহামিলনে। নোগুচিকে লেখা শেষ পত্রের শেষ দিকে তিনি বললেন— আমি জাপানিদের ভালোবাসি, তাদের জয়কামনা করতে পারি না, অনুশোচনার ভিতর দিয়ে তাদের 'প্রায়শ্চিত্ত' হোক (wishing your people whom I love, not success but remorse)।

১৯৩৮ সালে য়ুরোপেও শান্তি নেই—একটা প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ যে-কোনো সময়ে যে-কোনো দেশে বেধে যেতে পারে। হিট্‌লার জর্মেনির সর্বময় কর্তা, মধ্যয়ুরোপ গ্রাস করছেন একটু একটু করে। ১৯৩৮ সেপ্‌টেম্বর মাসে ম্যুনিক প্যাক্ট হল— চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা লোপ পেল। এই-সব ঘটনায় কবির মন খুবই বিষাদগ্রস্ত হয়; নবজাতকের 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতা লিখলেন সেই বেদনা থেকে।

পৌষ-উৎসবের সময় এলম্‌হার্স্ট এলেন বিলাত থেকে, শ্রীনিকেতনে এতদিন কী কাজ হয়েছে তাই দেখতে। এন্‌ড্রুজ এলেন বহুকাল পরে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারির গোড়ায় জওহরলাল নেহেরু এলেন হিন্দিভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসু এলেন জওহরলালের সঙ্গে দেখা করতে। কবির গৃহে দুজনের সাক্ষাৎকার হল, এঁদের মধ্যে কী

কথাবার্তা হয়েছিল আমরা জানি না ; সম্ভবতঃ এখনো পর্যন্ত কেউ তা প্রকাশ করেন নি।

সময়টা কংগ্রেসের পক্ষে সংকটের কাল ; যদিও আটটা প্রদেশের মন্ত্রীসভায় ও ব্যবস্থাপকসভায় কংগ্রেসী দল সংখ্যাধিক্যের জোরে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েছেন। গোল বেধেছে নিজেদের মধ্যে, নূতন বৎসরের কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন করা নিয়ে। সুভাষচন্দ্র উগ্রপন্থী ব'লে গান্ধীজি-প্রমুখ নেতারা তাঁর পুনর্‌নির্বাচন পছন্দ করেন নি।

১৫৩

চীন-জাপানের যুদ্ধে মনের উদ্‌বেগ হয়, কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলিতেও মন বিষণ্ণ হয়, কিন্তু উড়ো মেঘের কালো ছায়ার মতো মনের আঁধার আসতেও যেমন যেতেও তেমনি— সুখের বিষয় যে, স্থায়ী হয় না। কলিকাতা থেকে এসে, জানুয়ারি মাসে (১৯৩৯) 'পরিশোধ' 'চণ্ডালিকা' ও 'তাসের দেশ' এই তিনটি নাটক নূতন করে লিখলেন। স্থির হয়েছে কলিকাতায় অভিনয় হবে। ঢেলে সাজালেন 'পরিশোধ', নূতন নাম হল 'শ্যামা'। 'তাসের দেশে'র নূতন সংস্করণ উৎসর্গ করলেন (মাঘ ১৩৪৫) সুভাষচন্দ্র বসুকে। তখনো তিনি কংগ্রেস-সভাপতি আছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন— "স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।"

দিন যায় নানা কাজে, নানা লেখায়, বিচিত্র ছবি আঁকায়, কলিকাতায় যাওয়া-আসায়। এবার উড়িষ্যা-সরকার কবিকে পুরীতে গ্রীষ্মকালে যাবার জন্য আহ্বান করেছেন ; সেখানে এখন কংগ্রেসীদলের মন্ত্রীত্ব। পুরীর সার্কিট-হাউসে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পুরীতে এসেছিলেন ; সমুদ্রের স্মৃতি বহন করে লিখেছিলেন 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা। সে-সব কথা এখানে এসে মনে পড়ছে! এবার এসে কবিতা লিখছেন বটে, কিন্তু— "এখনকার লেখায় সেদিনকার মতো উদ্‌বেল প্রাণের অচিন্তিত গতিমত্ততা থাকতেই পারে না। আছে হয়তো আত্মসমাহিত মনের ফলফলানোর নিগূঢ় আবেগ।"

পুরীতে তিন সপ্তাহ ছিলেন ; কবির জন্মদিবস, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে সমারোহ-সহকারে উদ্‌যাপিত হল। এন্‌ড্রুজ এই সময়ে পুরীতে এসে পড়াতে কবির ভালো লাগল।

১৫৪

পুরী থেকে ফিরে কবি মংপুতে চললেন। গতবার সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে যেমন আনন্দ পেয়েছিলেন, তেমনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীদেবীর যত্নে। আত্মীয়পরিবেষ্টিত শ্রী-সুখ-সম্পন্ন পরিবেশে যে স্বাভাবিক আনন্দ ও সেবা পাওয়া যায়, তার স্বাদ থেকে কবি বহুকাল বঞ্চিত। মৈত্রেয়ীদেবীর পরিবারে এসে সেটি যেন পেয়েছেন। এক মাস মংপুতে থাকলেন আরামে।

বর্ষা নামবার মুখে পাহাড় থেকে নেমে এলেন (১৭ জুন ১৯৩৯)। দেশের আভ্যন্তরীণ সংবাদ যেমন সুখের নয়, পশ্চিম সমুদ্রপারেও তেমনি ঘনঘটাপূর্ণ সমরায়োজন।

কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছে—সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় গান্ধীজি বিরক্ত ; তিনি চেয়েছিলেন পট্টভি সীতারামাইয়া সভাপতি হন। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির সর্বসহিষ্ণু নীতির অনুমোদক নন ব'লেই কংগ্রেসের উপরওয়ালারা ('হাই কমাণ্ড') তাঁর উপর রুষ্ট। শেষে অবস্থা এমন হল যে, সুভাষচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে ত্রিপুরী অধিবেশনের পর কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ছাড়তে হল। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসেও তিনি টিকতে পারলেন না।

এই-সব ব্যাপারে কবি খুবই উদ্‌বিগ্ন। স্বরাজলাভের পূর্বেই রাজনীতির এ কী মূর্তি! কংগ্রেস এখন আটটি প্রদেশকে চালনা করছেন। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা মুসলিম লীগের শাসনে কিরূপ—তার বাস্তববোধ অনেকেরই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "পৃথিবীতে যে দেশে যে বিভাগেই ক্ষমতা অতি প্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে—সেখানেই সে ভিতরে-ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্‌ভাবিত করে।···কংগ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি।"

কংগ্রেসের একদল মূর্খভক্ত ত্রিপুরীর অধিবেশনে গান্ধীজিকে মুসোলিনী ও হিটলারের সঙ্গে তুলনা করে জয়ধ্বনি করেছিল। এর দ্বারা গান্ধীজিকে বিশ্বসমক্ষে তারা কত ছোটো করেছিল সে বোধ তাদের ছিল না।

বিদেশের সংবাদ আরও ঘাতপ্রতিঘাতময় ও মর্মান্তিক। চীনের উপর জাপানের অত্যাচার সম্বন্ধে মংপুতে একদিন বলছিলেন—"ইচ্ছে করে না খবরের কাগজ খুলি, ইচ্ছে করে না রেডিয়োর খবর শুনি। কিন্তু না শুনেও তো পারি নে। চোখ বুজে তো বেদনার অন্ত করা যায় না। এ অত্যাচারের ইতিহাস অসহ হয়ে উঠল।...বাঁচতে ইচ্ছে করে না আর। এ পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।...এ নৃশংসতা আর কত দেখব!"

১৫৫

কবি মংপু থেকে ফিরে দুটো মাস শ্রীনিকেতনে ও শান্তিনিকেতনে কাটালেন। শ্রীনিকেতনের কর্মীদের কাছে ডেকে সেখানকার কাজের তাৎপর্যটি তাদের বোঝালেন। এই তাঁর শেষ শ্রীনিকেতনে বাস।

ইতিমধ্যে আহ্বান এল সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে; কলিকাতায় মহাজাতি-সদনের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে কবিকে। সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সে সময় কলিকাতায় কংগ্রেস-ভবন করবার সংকল্প গ্রহণ করে অর্থ সংগ্রহ করেন। গৃহনির্মাণের জন্য কর্পোরেশন জমি দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ (২ ভাদ্র ১৩৪৬) এই কংগ্রেস-ভবনের নাম দিলেন মহাজাতিসদন; তিনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন।

পরদিন জোড়াসাঁকোতে গীতোৎসব। জওহরলাল কলিকাতা হয়ে চীনদেশে যাচ্ছেন; শুনলেন কবি কলিকাতায়। সময় হাতে খুব কম, তবুও তিনি কবির সঙ্গে দেখা করে গেলেন—কারণ, চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জওহরলাল দেখা করতে এলে কবি তাঁকে বললেন, "আমি এমন আশা করতে পারি যে, তুমি চীনে গিয়ে ভারতের যুবমনের দূতরূপে এশিয়ার ঐক্যের ঐতিহাসিক তত্ত্বকে সুদৃঢ় করবে।" প্রায় দশ বৎসরের ব্যবধানে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর (১৯৪৮) দিল্লিতে যখন এশিয়াবাসীদের সম্মিলন আহূত হয়েছিল সেদিন সভায় কি

কেউ রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছিল? পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের ঐক্যবন্ধনের প্রথম দূত কি রবীন্দ্রনাথই নন?

মহাজাতি-সদনের কাজ শেষ করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন। ভরা ভাদর, বর্ষাকাল। এবার এখনো বর্ষার আবাহন হয় নি। লিখতে আরম্ভ করলেন গান ও কবিতা; 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি রচনা এই সময়ে লেখা।

১৫৬

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। জর্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করার দু দিন পরেই ইংরেজ জর্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করল এবং পনেরো দিনের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া পুব থেকে পোল্যান্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পোলরা বিশ বৎসর ধরে বহু যত্নে যে রাজ্য গড়ে তুলেছিল তা কয়েক দিনের বোমা-বর্ষণে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় এসেছেন। মংপু যাচ্ছেন, শরৎকালটা সেখানে থাকবেন। কলিকাতায় এসে দেখেন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যুদ্ধ-ঘোষণার কয়েক দিনের মধ্যেই জটিল হয়ে উঠেছে। জর্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার বললেন, এটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধ, অতএব এটা ভারতেরও যুদ্ধ। প্রশ্ন উঠল, যেটা ভারতের বৈদেশিক সরকারের কর্তব্য সেটা কি ভারতবাসীরও কর্তব্য? ভারত স্বাধীনতা চেয়ে আসছে; ইংরেজও প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। দেখা যাচ্ছে, ব্রিটেনের প্রতি ভারতের কর্তব্য যতখানি স্পষ্ট— ভারতের প্রতি ব্রিটেনের কর্তব্য ততখানিই অস্পষ্ট। ভারতীয় নেতারা ঘোষণা করলেন, জগতে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য স্বাধীন ভারত যাতে স্বাধীনভাবে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে পারে, এ জন্য স্বশাসন বা স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে দিয়ে ইংরেজ ভারতের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপন করুন আগে। এই বিবৃতিতে বহুজনের স্বাক্ষর ছিল, সর্বোপরি ছিল রবীন্দ্রনাথের।

কলিকাতায় এই-সকল সমস্যার মধ্যে কয়দিন জড়িত থেকে কবি ১২ই

সেপ্টেম্বর মংপু রওনা হয়ে গেলেন; সেখানে দু মাস ছিলেন। শান্তিনিকেতনে ফিরলেন ১১ই নভেম্বর। কবিতা লিখেছেন, রাজনীতি সম্বন্ধে পত্র প্রবন্ধ নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। আর, বহুদিন পরে একটি ছোটো গল্প লিখলেন— 'শেষ কথা'।

১৫৭

মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে যেতে হচ্ছে গৃহের উদ্‌বোধন করতে। শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন তখন ঐ জেলার শাসনকর্তা, তাঁরই চেষ্টায় গৃহ নির্মিত হয়েছে— বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী-প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে।

কবি বোলপুর থেকে চলেছেন মেদিনীপুর—হাওড়া স্টেশনে স্পেশাল ট্রেনে থাকলেন। মাঝে শহরে গিয়ে কর্পোরেশনের খাদ্যপুষ্টি সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীতে বক্তৃতা করে এলেন। সেদিনই স্টেশনে সুভাষচন্দ্র কবির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বলে শুনেছি। এঁদের আলাপের বিবরণী কোথাও প্রকাশিত হয় নি। মেদিনীপুর থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে পত্র দিয়ে অনুরোধ করেন, সুভাষের উপর কংগ্রেসের শাস্তিবিধান প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক। গান্ধীজি অটল; তিনি জানালেন তা সম্ভব নয়।

মেদিনীপুরের কর্তব্য শেষ করে পৌষ-উৎসবের পূর্বেই আশ্রমে ফিরলেন। ৭ই পৌষের ভাষণ 'অন্তর্দেবতা', যথাকালের পূর্বে লিখে, ছাপিয়ে, বিলি করা হল। এর কারণ ছিল। এই ভাষণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ-বিশ্লেষণে সে সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। যীশুখৃস্টের জন্মদিনে লিখলেন গান— "একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে, রাজার দোহাই দিয়ে"। বললেন, আজ তারাই মানুষ হত্যা করতে যাবার আগে কেউ বুদ্ধের নামে, কেউ খৃস্টের নামে প্রণাম নিবেদন করছে।

১৫৮

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০। গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ এলেন শান্তিনিকেতনে কবিকে দেখতে, কবির শরীর যে দ্রুত ভেঙে আসছে তা সকলেই বুঝতে

পারছেন। ১৯১৫ সালে উভয়ে এসেছিলেন ; মাঝে দুইবার গান্ধীজি একাই এসেছিলেন।

গান্ধীজি প্রায় দুদিন আশ্রমে থাকলেন, প্রত্যেকটি বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখলেন। আশ্রম ত্যাগ করার পূর্বে, কবি তাঁর হাতে একখানি পত্র দেন ; তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, তাঁর অবর্তমানে গান্ধীজির উপর বিশ্বভারতীর ভার ন্যস্ত থাকল। কলিকাতায় গিয়ে গান্ধীজি মৌলানা আবুলকালাম আজাদকে পত্রখানি দেন। তার দীর্ঘকাল পরে ১৯৫১ সালে ভারত-সরকার বিশ্বভারতীর ভার গ্রহণ করলেন— তখন রবীন্দ্রনাথও নেই, গান্ধীজিও গত হয়েছেন এবং মৌলানা সাহেবই ভারতসরকারের শিক্ষাসচিব।

গান্ধীজি চলে যাবার কয়েক দিন পর এক দিনের জন্য কবি সিউড়ি ঘুরে এলেন ; সেখানকার মেলা উদ্‌বোধন করবার জন্য আহূত হয়েছিলেন।

সপ্তাহান্তে চললেন বাঁকুড়া। খানা জংশন থেকে মোটরপথে গেলেন— দু পাশে গ্রামে গ্রামে লোক দাঁড়িয়ে কবিকে দেখবার জন্য। কোনো কোনো জায়গায় ভিড় সামলানো কষ্টকর হয়েছিল। বাঁকুড়ায় বিচিত্র অনুষ্ঠান— প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্‌ঘাটন, প্রসূতিসদনের ভিত্তি-স্থাপন, মেডিকেল স্কুল -পরিদর্শন, কলেজে অভিভাষণ প্রভৃতি।

বাঁকুড়ার ছাত্রসমাজকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন তা আজও স্মরণযোগ্য সন্দেহ নেই। তিনি বললেন, "যারা অকুণ্ঠিত মনে নিয়ম ভাঙতে চায়, তারা নিয়ম গড়তে কোনো দিন পারে না। এই ভাঙন-ধরানো মন সাংঘাতিকভাবে বিস্তার লাভ করছে···দলাদলিতে ক্রমাগতই ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে আশ্রয়সৌধকে···সভা-ভাঙা, দল-ভাঙা, ইস্কুল-ভাঙা, মাথা-ভাঙা, সমস্ত এর অন্তর্ভুক্ত।" এ কথা বিশেষভাবে বলবার কারণ— কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেসী দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে— সুভাষের দল রুখে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসের প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে। এই মতভেদ নিয়ে চারি দিকে অশান্তি ; বাংলাদেশে এর উপর আছে লীগ মন্ত্রীদের দৌরাত্ম্য।

বাঁকুড়া থেকে কলিকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। কলিকাতায় তখন এন্‌ড্রুজ পীড়িত অবস্থায় আরোগ্যসদনে পড়ে আছেন ; কবি তাঁকে দেখতে যান নি বলে কথা উঠেছিল। হাসপাতাল জেলখানা প্রভৃতি স্থান,

যেখানে মানুষকে বাধ্য হয়ে থাকতে হয়, সে-সব স্থানে যেতে কবির খুব খারাপ লাগত। তা ছাড়া তাঁর নিজের শরীরও এখন ভাঙনের মুখে।

কবির দিন যাচ্ছে গতানুগতিকভাবে। শরীর অশক্ত, কানে কম শোনেন, চোখেও কম দেখছেন ; কিন্তু মন এখনও সবল সুস্থ। সেই মনের খোরাক পাচ্ছেন না। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখছেন—"আমার মুশকিল, আমার দেহ ক্লান্ত, তার চেয়ে ক্লান্ত আমার মন ; কেননা মন স্থাণু হয়ে আছে, চলাফেরা বন্ধ। তুমি থাকলে মনের মধ্যে স্রোতের ধারা বয়— তার প্রয়োজন যে কত তা আশপাশের লোক বুঝতে পারে না।"

মন আপনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম, দেহ যদৃচ্ছ বিচরণ করতে অশক্ত, আপনাকে দেখে আপনার হাসি পায়— মনের সেই অবস্থায় 'খাপছাড়া' কবিতা লেখেন মনটাকে চাঙ্গা করবার উদ্দেশে। 'প্রহাসিনী' কাব্যলক্ষ্মী নতুন হাসির পাথেয় বহন করে এলেন। আপন আনন্দে 'ছড়া' কাটেন মনের মধ্যে যে শিশু ভোলানাথ আছে তাকেই ভোলাতে— আর তারই সাহচর্যে ভুলতে বিষয়ীর বিষম-রিপু-তাড়িত গরলমথিত বিশ্বসংসার।

১৫৯

১৩৪৭ নববর্ষের দিন জন্মোৎসব হবার কয়েক দিন পরে চলেছেন পাহাড়ে। কালিম্পঙে রথীন্দ্রনাথদের আসতে দেরি আছে বলে কবি গিয়ে উঠলেন মংপুতে। সেখানে কবির জন্মদিনের উৎসব হল। কবি লিখছেন :

বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
অপরাহ্ণে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।

পরদিন সংবাদ পেলেন, কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ভুগছিলেন— কবি এ সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কালীমোহন ঘোষের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদের জন্য মন তৈরি ছিল না ; এ খবর পেলেন কালিম্পঙে ফেরবার কয়েক দিন পরে।

দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র দলাদলি, রেষারেষি, সাম্প্রদায়িকতার দাঙ্গা, নারীহরণ ও নারী-উৎপীড়ন ; দেশের বাইরে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ— এই-সব খবর নিত্যই

শোনেন আর আহত মনটাকে হালকা করবার জন্য ছড়া কেটে বিদ্রূপ ক'রে বলেন :

সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুল-বনে চৌকিদারের হাঁচি।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, জাতিগত অনাচার বা অত্যাচারকে কবিতা লিখে ধিক্কৃত করেন—আর-কী করতে পারেন এ বয়সে! মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজ্‌ভেল্ট্‌কে এক কেব্‌ল্ করে জানালেন, মার্কিন যেন এই বিশ্বধ্বংসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করে। হায় রে কবির প্রত্যাশা!

কিন্তু ক্লান্ত দেহমনের সব শক্তি বিশ্বসমস্যার ভাবনায় নষ্ট হচ্ছে না। অতীতকে দেখছেন মনশ্চক্ষের সামনে। অস্তাচলগামী রবি নবারুণকে দেখছেন মুখ ফিরিয়ে আর পরিষ্কৃত ভাষার পটে এঁকে দেখাচ্ছেন অন্যকে—এই বইখানির নাম 'ছেলেবেলা'।

কালিম্পং থেকে ২৯শে জুন কলিকাতায় এসে ৩রা জুলাই শান্তিনিকেতন ফিরলেন। যে কয়দিন কলিকাতায় ছিলেন তারই মধ্যে কত সমস্যা এল। সুভাষ দেখা করতে এলেন (১ জুলাই ১৯৪০)। কী কথাবার্তা হল জানি না। তবে কয়েক দিন পরে দৈনিক কাগজে কবির এক বিবৃতি প্রকাশিত হল, তাতে তিনি বললেন—'স্বদেশীযুগের স্মৃতি' নামে যে সাক্ষাৎ-বিবরণ দু মাস আগে বের হয়েছিল, তার মধ্যে তিনি সুভাষকে নিন্দাবাদ করেন নি। ভ্রমসংশোধন কাগজে ছাপা হল, কিন্তু সুভাষ সেটি দেখলেন জেলে বসে। কবির সঙ্গে সুভাষের আর দেখা হয় নি।

শান্তিনিকেতনে ফিরে পাঁচরকম কাজের ভিতর আছেন—অন্য লোকের বইয়ের ভূমিকা লিখছেন, কারও গ্রন্থের প্রশংসা করছেন, আবার বড়ো ছেলেদের জন্য বাংলার অধ্যাপনাও করছেন, অবসরকালে মৃদু হাস্যপরিহাস চলছে পাশে যাঁরা আছেন তাঁদের নিয়ে।

১৬০

১৯৪০ সালের ৭ই অগস্ট্ তারিখে শান্তিনিকেতনে খুব জমকালো অনুষ্ঠান করে

অক্‌স্‌ফোর্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডক্টর উপাধি দিলেন। ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার মরিস গয়ার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মানপত্র পড়লেন। অক্‌স্‌ফোর্ডের দেশী ও বিদেশী বহু প্রাক্তন ছাত্র সেদিন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। ১৯১২ সালে গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হলে অক্‌স্‌ফোর্ড্‌-কর্তৃক কবিকে উপাধি দেবার প্রস্তাব একবার হয়েছিল; শোনা যায় তাতে বাধা দিয়েছিলেন লর্ড্‌ কর্জন, তিনি তখন অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সালর।

দিনগুলি যাচ্ছে মন্থরগতিতে। শরীর ভেঙে পড়ছে— হাঁটতে কষ্ট হয়, ঠেলাগাড়িতে চলাফেরা করেন, চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে, কানেও কম শুনছেন। তৎসত্ত্বেও ছোটোবড়ো কাজের জন্য লোক আসে, লেখার তাগিদ আসে। সে-রকম তাগিদে লিখলেন 'ল্যাবরেটরি' গল্প, এর পরে লেখেন 'বদনাম'। এ গল্পগুলি পড়ে মনে হয় কবি বয়সের হিসাবে ক্রমশঃই আধুনিক হয়ে পড়ছেন। একজন প্রতিভাবান সমালোচক বললেন, "সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক তার উল্‌টো; যত বয়স বেড়েছে, ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন।...নীতির চেয়ে সত্যকে বড়ো করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে।" জওহরলাল তাঁর 'ভারতসন্ধান' গ্রন্থেও ঠিক এই কথাই বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি-ভঙ্গি ও মতামত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেশি যেন প্রগতিবাদী— সচরাচর যা ঘটে তার বিপরীত।

শান্তিনিকেতনে মন টিকছে না। কলিকাতায় এলে 'চলাফেরা' সম্পর্কে ডাক্তারেরা সাবধান করে দিলেন। কিন্তু একবার ঝোঁক উঠলে সেবকদের পক্ষে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করা কঠিন। এই সময়ে রথীন্দ্রনাথ জমিদারিতে গিয়েছেন। প্রতিমাদেবী কালিম্পঙে— কবি সেখানে গেলেন। যাত্রার পূর্বে অমিয়চন্দ্রকে লিখছেন, "কিছুদিন থেকে আমার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়ছে, দিনগুলো বহন করা যেন অসাধ্য বোধ হয়, তবু কাজ করতে হয়— তাতে এত অরুচিবোধ— সে আর বলতে পারি নে। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই যেখানে পালিয়ে থাকা যায়। ভিতরের যন্ত্রগুলো কোথাও কোথাও বিকল হয়ে গেছে।... বিধান রায় কালিম্পঙে যেতে নিষেধ

করেছিলেন। মন বিশ্রামের জন্য এমন ব্যাকুল হয়েছে যে তাঁর নিষেধ মানা সম্ভব হল না। 'চল্লুম আজ কালিম্পঙ।' এই তাঁর শেষ সফর। সাত দিনের মধ্যে কলিকাতায় খবর এল কবি অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। প্রশান্তচন্দ্র কলিকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। প্রতিমাদেবী সেখানে একা— ভাগ্যে সেদিনই মৈত্রেয়ীদেবী এসেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ জমিদারিতে ঘুরছেন; রেডিওগ্রামে তাঁর উদ্দেশে খবর পাঠানো হল।

কলিকাতায় আনা হল অজ্ঞান অবস্থায়। এক মাস শয্যাশায়ী থাকলেন। শুয়ে শুয়ে কবিতা বলে যান, পাশের লোকে লিখে নেয়। 'রোগশয্যায়' কাব্যে এগুলি সংকলিত।

১৮ই নভেম্বর শান্তিনিকেতনে ফিরলেন; তার পর যে আট মাস সেখানে ছিলেন একান্ত রোগীর মতোই দিন কেটেছিল।—

সজীব খেলনা যদি গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে,
কী তাহার দশা হয় তাই করি অনুভব আজি আয়ুশেষে।

অন্তের সেবা জীবনে খুবই কম গ্রহণ করেছিলেন, কঠিন পীড়াতেও কখনো দীর্ঘকাল ভোগেন নি। আজ অসহায়ভাবে আপনাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে সেবক-সেবিকাদের হাতে। এই কথাটা লিখছেন এক কবিতায়:

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে…
আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়স্পর্শ দিতে।

রোগশয্যায় দিন যায়— কখনো কেদারায়, কখনো বিছানায়। রাত্রি কাটে কখনো অনিদ্রায়, কখনো বিচিত্র ভাবনায়। এরই মধ্যে চলছে সাহিত্যসৃষ্টি— কোনোটি গম্ভীর, কোনোটি লঘু। কবির কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা এই সময়ের লেখা। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি 'ঐকতান' কবিতার কথা: 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।'

আজ জীবনসন্ধ্যায় অনুভব করছেন:

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

পৌষ-উৎসব এল। 'আরোগ্য' নামে ভাষণটি আগেই মুখে মুখে বলেছিলেন, অন্যে লিখে নেন। উৎসবদিবসে সেটি পড়া হয়। কবি বলেছিলেন, "আমি আশ্রমে উপস্থিত আছি অথচ ৭ই পৌষের উৎসবে আসনগ্রহণ করতে পারি নি, এরকম ঘটনা আজ এই প্রথম হল।"

স্বাধীনতা-দিবসের সংকল্পের কথা হয়তো কবির মনে আছে; রাজার জাতিকে তাই স্মরণ করাতে চাইলেন; ২৪শে জানুয়ারি তারিখে লিখলেন :

সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা,
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা।

আজ ব্রিটেন বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ভারতের সহায়তা চাইছে, কিন্তু কে সাহায্য করবে? ভারতকে ইংরেজ কী দুর্বল, অসহায়, দীন করে রেখেছে!

এই বৎসরের মাঘোৎসবের দিনেও রবীন্দ্রনাথের ভাষণ মন্দিরে পঠিত হল; জীবনের শেষ ভাষণে কবি রাজা রামমোহনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

কবিমনের আর-একটা দিক থেকে উৎসারিত হচ্ছে 'গল্পসল্প' গদ্যে ও পদ্যে। অবসাদগ্রস্ত মন ও অসুস্থ দেহের যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন সে রচনায় নেই। 'গল্পসল্প' লেখার মূলে ছিল শিশুদের দ্রুতপাঠ্য সরস লেখা জোগাবার প্রেরণা। গল্পসল্পের শেষ রচনা লেখেন ১২ই মার্চ ১৯৪১ তারিখে। এর শেষ কয়েকটি পংক্তি তুলে দিচ্ছি :

সাঙ্গ হয়ে এল পালা,
নাট্যশেষের দীপের মালা
নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে;

রঙিন ছবির দৃশ্যরেখা
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা,
আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জমে।
সময় হয়ে এল এবার
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,
নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা;
খাতা হাতে এখন বুঝি
আসছে কানে কলম গুঁজি
কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা।
চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা
ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা
কোনোমতেই চলবে না তো আর;
অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে
পড়বে ধরা শেষ গণিতে
জিত হয়েছে কিংবা হল হার।

১৬১

জীবনের শেষ নববর্ষ এল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে।

'জন্মদিনের' সর্বশেষ ভাষণ 'সভ্যতার সংকট' সেদিন পঠিত হল। আর, মহামানবের আহ্বানের গান রচনা করে সুর দিলেন, সেদিন তা গাওয়া হল: ঐ মহামানব আসে।

রবীন্দ্রজীবনের শেষ ২৫শে বৈশাখ অনাড়ম্বর ভাবে উদ্‌যাপিত হল; শেষ জন্মদিনের কবিতা লিখে পাঠালেন বাঁকুড়ায় অন্নদাশঙ্করকে:

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্তের অন্তিম প্রীতিরসে

নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।

কয়েক দিন পরে ত্রিপুরা রাজদরবার থেকে প্রতিনিধিরা এসে কবিকে 'ভারতভাস্কর' উপাধি অর্পণ করলেন। জীবনের প্রত্যুষে এই রাজদরবারের প্রতিনিধি এসে তরুণ কবিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন; আজ জীবন-সায়াহ্নে সেখান থেকে শেষ অভিনন্দন এল।

দারুণ গ্রীষ্ম এবার; গ্রীষ্মের ছুটিতে এলেন অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু সপরিবারে। কবির সঙ্গে নানা আলোচনা হয় সাহিত্য নিয়ে; সেগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, আর পরে 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সাহিত্য সম্বন্ধে এইগুলি কবির শেষ কথা।

এই সময়ে কংগ্রেসের সকল নেতাই জেলে। বিশ্বযুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঋজু স্পষ্ট ঘোষণা চেয়েছিলেন ভারতীয় নেতারা। ভারতকে স্বাধীনতা-দানের প্রতিশ্রুতি তাঁরা চান। এই ধরণের দাবি ভারতীয়দের পক্ষে অকৃতজ্ঞতা, এই-সব কথা বলে মিস্ রাথ্‌বোন ভারতীয় নেতাদের ও বিশেষ-ভাবে জওহরলালের নিন্দা করে এক প্রবন্ধ লেখেন। মিস রাথ্‌বোন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফের প্রতিনিধি, নাম-করা মহিলা। তাঁর এই আক্রমণের প্রতিবাদ করলেন কবি; কৃষ্ণ কৃপালনীকে তার খসড়া করতে বললেন। এই লেখা, ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে কবির শেষ রচনা (৫ জুন ১৯৪১)।

কিন্তু দেহ আর চলছে না। চিকিৎসার ও সেবার ত্রুটি নেই।

অবশেষে ডাক্তারেরা পরামর্শ করে ঠিক করলেন অপারেশন ছাড়া উপায় নেই। ৯ই শ্রাবণ (২৫ জুলাই) কবিকে কলিকাতায় নিয়ে যাওয়া হল। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সত্তর বৎসরের স্মৃতি জড়িত; কবি কি বুঝতে পেরেছিলেন এই তাঁর শেষ যাত্রা? যাবার সময় চোখে রুমাল দিচ্ছেন দেখা গেল।

৩০শে জুলাই, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবির শরীরে অস্ত্রোপচার হল। তার কিছু পূর্বে শেষ কবিতা রচনা করেন:

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ, সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।

সকাল সাড়ে নটা
৩০ জুলাই ১৯৪১

চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করলেন, তা নিষ্ফল হল। অবস্থা দ্রুত মন্দের দিকে যেতে লাগল। জ্ঞান হারালেন। শেষ নিশ্বাস পড়ল— রাখীপূর্ণিমার দিন মধ্যাহ্নে, ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ তারিখে (৭ অগস্ট ১৯৪১)।

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি ?
মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিমসাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি ?
পেল না উত্তর।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
সকাল। ২৭ জুলাই ১৯৪১

—

বংশলতিকা

প্রধানতঃ, জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত আত্মীয়দের সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক দেখানো হইল
বিবাহ সম্পর্কে যাঁহারা এই বংশ-লতিকাভুক্ত তাঁহাদের নাম ছোটো হরপে

- **দ্বারকানাথ** ১৭৯৪-১৮৪৬, দিগম্বরী দেবী ? -১৮৩৯
  - কন্যাসন্তান[১] অল্পায়ু
  - **দেবেন্দ্রনাথ** ১৮১৭-১৯০৫, সারদা দেবী
    - কন্যাসন্তান ১৮৩৮[১] অল্পায়ু
    - দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৪০-১৯২৬, সর্বসুন্দরী দেবী
      - দ্বিপেন্দ্রনাথ। জ্যেষ্ঠ ১৮৬২-১৯২২, সুশীলা দেবী, হেমলতা দেবী
        - দিনেন্দ্রনাথ ১৮৮২-১৯[illegible]
      - সুধীন্দ্রনাথ। চতুর্থ পুত্র ১৮৬৯-১৯২৯, চারুবালা দেবী
    - সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৪২-১৯২৩, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
      - সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭২-১৯৪০, সংজ্ঞা দেবী
      - ইন্দিরা দেবী ১৮৭৩, প্রমথ চৌধুরী
      - কবীন্দ্রনাথ ১৮৭৫-১৮৭৯
    - হেমেন্দ্রনাথ ১৮৪৪-১৮৮৪, নীপময়ী দেবী
      - প্রতিভা। জ্যেষ্ঠা ১৮৬৫-১৯২২, আশুতোষ চৌধুরী
    - বীরেন্দ্রনাথ ১৮৪৫-১৯১৫, প্রফুল্লময়ী দেবী
      - বলেন্দ্রনাথ ১৮৭০-১৮৯৯, সাহানা দেবী, নিঃসন্তান
    - সৌদামিনী ১৮৪৭-১৯২০, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
      - সত্যপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ ১৮৫৯-১৯৩৩
      - ইরাবতী। জ্যেষ্ঠা ১৮৬১-১৯১৮, নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
    - জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৪৯-১৯২৫, কাদম্বরী দেবী, নিঃসন্তান
    - সুকুমারী ?১৮৫০-১৮৬৪, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
    - পুণ্যেন্দ্রনাথ ?১৮৫১-১৮৫৭
    - শরৎকুমারী ১৮৫৪-১৯২০, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
      - সুশীলা। জ্যেষ্ঠা, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়
    - স্বর্ণকুমারী ?১৮৫৬-১৯৩২, জানকীনাথ ঘোষাল
      - হিরণ্ময়ী ১৮৬৮-১৯২৫
      - জ্যোৎস্নানাথ ১৮৭১
      - সরলা ১৮৭২-১৯৪৫
      - ঊর্মিলা ১৮৭৩-?
    - বর্ণকুমারী ১৮৫৮-১৯৪৮, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
    - সোমেন্দ্রনাথ ১৮৫৯-১৯২২, অবিবাহিত
    - **রবীন্দ্রনাথ** ১৮৬১-১৯৪১, মৃণালিনী দেবী
    - বুধেন্দ্রনাথ ১৮৬৩-১৮৬৪
  - নরেন্দ্রনাথ[১] আয়ু ৩ বৎসর
  - গিরীন্দ্রনাথ ১৮২০-১৮৫৪, যোগমায়া দেবী
  - ভূপেন্দ্রনাথ[১,২] ১৮২৬-১৮৩৯
  - নগেন্দ্রনাথ ১৮২৯-১৮৫৮, ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী, নিঃসন্তান

১ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রকথা পৃ ৪, ২২-২৩
২ দ্রষ্টব্য সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৪৫০'

- রবীন্দ্রনাথ
  ১৮৬১-১৯৪১
  মৃণালিনী দেবী
  ১২৮০-১৩০৯ (১৯০২)
  - মাধুরীলতা
    ১৮৮৬-১৯১৮
    শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
    নিঃসন্তান
  - রথীন্দ্রনাথ
    ১৮৮৮
    প্রতিমা দেবী
    - গৃহীতা কন্যা
      নন্দিনী
      ১৯২২
  - রেণুকা
    ১৮৯০-১৯০৩
    সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
    নিঃসন্তান
  - মীরা [অতসী]
    ১৮৯২
    নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
    - নীতীন্দ্রনাথ
      ১৯১২-১৯৩২
    - নন্দিতা
      ১৯১৬
      কৃষ্ণ কৃপালনি
  - শমীন্দ্র
    ১৮৯৪-১৯০৭

- *গিরীন্দ্রনাথ
  ১৮২০-১৮৫৪
  যোগমায়া দেবী
  - গণেন্দ্রনাথ
    ১৮৪১-১৮৬৯
    নিঃসন্তান
  - কাদম্বিনী
    যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
    - জ্যোতিঃপ্রকাশ
      ১৮৫৫-১৯১৯
      - যামিনীপ্রকাশ
  - কুমুদিনী
    নীলকমল মুখোপাধ্যায়
  - গুণেন্দ্রনাথ
    ১৮৪৭-১৮৮১
    সৌদামিনী দেবী
    - গগনেন্দ্রনাথ
      ১৮৬৭-১৯৩৮
    - সমরেন্দ্রনাথ
      ১৮৭০-১৯৫১
    - অবনীন্দ্রনাথ
      ১৮৭১-১৯৫১
    - বিনয়িনী
      শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়
      - প্রতিমা দেবী। মধ্যমা
        ১৮৯৩
    - সুনয়নী
      রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

রথীন্দ্রনাথের পরলোকগমন ১৯৬১

রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী

বর্তমান পঞ্জীর সংক্ষিপ্ত পরিসরে রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান বাংলা পুস্তকগুলিরই উল্লেখ করা সম্ভবপর হইয়াছে— রবীন্দ্রনাথ-রচিত পাঠ্যগ্রন্থ, তাঁহার রচিত গানের স্বরলিপি-গ্রন্থ, অভিনয়াদির অনুষ্ঠানপত্র অথবা পুস্তিকা ইহার অন্তর্গত করা হয় নাই। অনেক গদ্যপুস্তিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্যতা থাকিলেও এই তালিকায় সেগুলির স্থান হয় নাই; কেবল এই কয়টি অভিভাষণ-পুস্তিকা উল্লিখিত হইয়াছে— রামমোহন রায়, মন্ত্রি অভিষেক, ঔপনিষদ ব্রহ্ম, সভাপতির অভিভাষণ: পাবনা-সম্মিলনী, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, সভ্যতার সংকট। এই নির্বাচন সম্বন্ধে মতানৈক্য হওয়া সম্ভবপর।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি 'পুস্তিকা'ই আকারে পুস্তিকা হইলেও প্রকারে পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ বলিয়াই বিবেচ্য, বর্তমান পঞ্জীতেও সেগুলি সেইভাবেই গৃহীত।

বর্তমান তালিকাটি হইতে প্রধান গ্রন্থগুলির প্রকাশ-কাল ও ক্রম জানা যাইবে।

প্রত্যেক গ্রন্থের উল্লেখের সঙ্গে উহার প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে বা অন্যত্র মুদ্রিত তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন প্রথায়, কখনো শকাব্দে কখনো বঙ্গাব্দে, তারিখ মুদ্রিত থাকায় কালক্রম বুঝিবার সুবিধার জন্য সমসাময়িক খৃস্টাব্দ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তারিখ— দিন, মাস, বর্ষ— খৃস্টাব্দ-অনুযায়ী তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল। সেগুলি বস্তুতঃ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাভুক্তির তারিখ— গ্রন্থমধ্যে কোনো তারিখ মুদ্রিত না থাকায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -কর্তৃক সংকলিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' গ্রন্থ হইতে ঐ তারিখগুলি গৃহীত।

কাহাকে কোন্ গ্রন্থ উপহৃত হইয়াছে এই তালিকায় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। যে গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া নাম দেওয়া হয় নাই, সেখানে নামটি তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল।

এই সূচী প্রস্তুত করার কাজে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

১২৮৫ - ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

কবি-কাহিনী। কাব্য। সংবৎ ১৯৩৫ [১৮৭৮]। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত প্রথম পুস্তক।

বন-ফুল। কাব্যোপন্যাস। ১২৮৬ [১৮৮০]। 'কবি-কাহিনীর পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেও, বন-ফুল দুই বৎসর পূর্বে রচিত ও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।'

বাল্মীকি প্রতিভা। গীতিনাট্য। শক ফাল্গুন ১৮০২ [১৮৮১]। দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১২৯২ [১৮৮৬]— 'অনেকগুলি গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে কালমৃগয়া গীতিনাট্য হইতে গৃহীত'।

ভগ্নহৃদয়। গীতিকাব্য। শক ১৮০৩ [১৮৮১]। [কাদম্বরী দেবী]।

রুদ্রচণ্ড। নাটিকা। শক ১৮০৩ [১৮৮১]। 'ভাই জ্যোতিদাদা'কে রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম নাটক।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। পত্রাবলী। শক ১৮০৩ [১৮৮১]। 'ভাই জ্যোতিদাদা'কে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে প্রকাশিত নূতন সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৭ [১৯৬১]।

সন্ধ্যা সঙ্গীত। কবিতা। ১২৮৮ [১৮৮২]। গ্রন্থে ১২৮৮ মুদ্রিত হইলেও, কার্যতঃ ১২৮৯ সালে প্রকাশিত।

কাল-মৃগয়া। গীতিনাট্য। অগ্রহায়ণ ১২৮৯ [১৮৮২]।

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট। উপন্যাস। শক পৌষ ১৮০৪ [১৮৮৩]। 'শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী শ্রীচরণেষু'। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। প্রথম রচিত অসম্পূর্ণ (?) উপন্যাস 'করুণা' (ভারতী, ১২৮৪-৮৫) স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই, গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে, আশ্বিন ১৩৬৯ [১৯৬৪]। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' অবলম্বনে ১৩১৬ বঙ্গাব্দে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচিত হয়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রায়শ্চিত্ত পুনর্লিখিত হইয়া 'পরিত্রাণ' নামে মুদ্রিত।

প্রভাত সঙ্গীত। কবিতা। শক বৈশাখ ১৮০৫ [১৮৮৩]। 'শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু'।

বিবিধ প্রসঙ্গ। প্রবন্ধ। শক ভাদ্র ১৮০৫ [১৮৮৩]। প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক।

ছবি ও গান। কবিতা। শক ফাল্গুন ১৮০৫ [১৮৮৪]। [কাদম্বরী দেবী]।

প্রকৃতির প্রতিশোধ। নাট্যকাব্য। ১২৯১ [১৮৮৪]। 'তোমাকে [কাদম্বরী দেবী] দিলাম'।

নলিনী। নাট্য। ১২৯১ [১৮৮৪]।

শৈশব সঙ্গীত। কবিতা। ১২৯১ [১৮৮৪]। 'তোমাকেই [কাদম্বরী দেবী] দিলাম'।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। কবিতা। ১২৯১ [১৮৮৪]। [কাদম্বরী দেবী]।

রামমোহন রায়। প্রবন্ধ। [১৮ মার্চ ১৮৮৫]।

আলোচনা। প্রবন্ধ। [১৫ এপ্রিল ১৮৮৫]। 'এই গ্রন্থ পিতৃদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম'।

রবিচ্ছায়া। সংগীত। বৈশাখ ১২৯২ [১৮৮৫]। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম সংগ্রহ-পুস্তক। '১২৯১ সনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সংগীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে' মুদ্রিত।

কড়ি ও কোমল। কবিতা। ১২৯৩ [১৮৮৬]। 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দাদা মহাশয় করকমলেষু'।

রাজর্ষি। উপন্যাস। ১২৯৩ [১৮৮৭]। এই উপন্যাসের প্রথমাংশ অবলম্বনে 'বিসর্জন' (১২৯৭) নাটক রচিত।

চিঠিপত্র। ১৮৮৭। পরে গদ্যগ্রন্থাবলীর 'সমাজ' [১৯০৮] খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সমালোচনা। প্রবন্ধ। ১২৯৪ [১৮৮৮]। 'পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কর-কমলে'।

মায়ার খেলা। গীতিনাট্য। শক অগ্রহায়ণ ১৮১০ [১৮৮৮]। 'শ্রীমতী সরলা রায়'কে। 'আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার [নলিনী] সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।'— বিজ্ঞাপন। আশ্বিন

১৩৫৭ বঙ্গাব্দে [১৯৫০] গীতবিতানের নূতন সংকলিত তৃতীয় খণ্ডের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

রাজা ও রাণী। নাটক। ২৫ শ্রাবণ ১২৯৬ [১৮৮৯]। 'পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়দাদা মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে'। 'রাজা ও রাণী'র আখ্যানভাগ অবলম্বনে গদ্য আকারে 'তপতী' (১৩৩৬) নাটক মুদ্রিত হয়।

বিসর্জন। নাটক। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ [১৮৯০]। 'শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণাধিকেষু'। 'রাজর্ষি [১৮৮৭] উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত'। স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৮ [১৯৬১]।

মন্ত্রি অভিষেক। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ [১৮৯০]। 'লর্ড্ ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ উপলক্ষে যে বিরাটসভা আহূত হয় এই প্রবন্ধ সেই সভাস্থলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত'।

মানসী। কবিতা। ১০ পৌষ ১২৯৭ [১৮৯০]। [মৃণালিনী দেবী ?]

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। প্রথম খণ্ড, ১৬ বৈশাখ ১২৯৮ [১৮৯১]। কবির ইংলণ্ড-যাত্রার ভূমিকা। দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ আশ্বিন ১৩০০ [১৮৯৩]। 'শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত সুহৃদ্বরকে'। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে প্রকাশিত নূতন সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৭ [১৯৬০]।

চিত্রাঙ্গদা। কাব্য। ২৮ ভাদ্র ১২৯৯ [১৮৯২]। 'স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরমকল্যাণীয়েষু'। 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত'।

গোড়ায় গলদ। প্রহসন। ৩১ ভাদ্র ১২৯৯ [১৮৯২]। 'শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন প্রিয়বন্ধুবরেষু'। অভিনয়যোগ্য সংস্করণ, শেষ রক্ষা [১৯২৮]।

গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা। সংগীত ও গীতিনাট্য। শক ৮ বৈশাখ ১৮১৫ [১৮৯৩]। ১২৯৯ পর্যন্ত রচিত 'নূতন পুরাতন সমস্ত গান' এবং বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য ইহাতে সন্নিবেশিত।

সোনার তরী। কবিতা। ১৩০০ [১৮৯৪]। 'কবি-ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কর-কমলে'।

ছোট গল্প। ১৫ ফাল্গুন ১৩০০ [১৮৯৪]। 'পূজনীয় জ্যেষ্ঠসোদরোপম শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত সি. এস. মহাশয় করকমলেষু'।

বিচিত্র গল্প। প্রথম ভাগ। ১৩০১ [১৮৯৪]।

কথা-চতুষ্টয়। গল্প। ১৩০১ [১৮৯৪]।

গল্প-দশক। ১৩০২ [১৮৯৫]। 'পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ আশুতোষ চৌধুরীর করকমলে'।

নদী। কবিতা। ২২ মাঘ ১৩০২ [১৮৯৬]। 'পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে'। পরে ইহা 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র -সংবলিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭১ [১৯৬৪]।

চিত্রা। কবিতা। ফাল্গুন ১৩০২ [১৮৯৬]।

বৈকুণ্ঠের খাতা। প্রহসন। চৈত্র ১৩০৩ [১৮৯৭]।

পঞ্চভূত। প্রবন্ধ। ১৩০৪ [১৮৯৭]। 'মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সুহৃদ্বরকরকমলেষু'।

কণিকা। কবিতা। ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬ [১৮৯৯]। 'পরম প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের করকমলে'। স্বতন্ত্র শোভন সংস্করণ [১৯৪৮]।

কথা। কবিতা। ১ মাঘ ১৩০৬ [১৯০০]। 'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানাচার্য করকমলেষু'। পরবর্তী কালে 'কথা ও কাহিনী' [১৯০৮] গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়।

কাহিনী। কবিতা, নাট্যকাব্য ও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' প্রহসন। ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬ [১৯০০]। 'শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেবমাণিক্য মহারাজ ত্রিপুরেশ্বর করকমলে'।

কল্পনা। কবিতা। ২৩ বৈশাখ ১৩০৭ [১৯০০]। 'শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সুহৃৎকরকমলে'।

ক্ষণিকা। কবিতা। [২৬ জুলাই ১৯০০]। 'শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত সুহৃত্তমের প্রতি'।

নৈবেদ্য। কবিতা। আষাঢ় ১৩০৮ [১৯০১]। 'পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে'।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম। প্রবন্ধ। শ্রাবণ ১৩০৮ [১৯০১]।

চোখের বালি। উপন্যাস। ১৩০৯ [১৯০৩]।

কর্মফল। গল্প। ১৩১০ [১৯০৩]। নাট্যীকৃত রূপ 'শোধবোধ' [১৯২৬]।

আত্মশক্তি। প্রবন্ধ। ১৩১২ [১৯০৫]।

বাউল। গান। [৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫]।

ভারতবর্ষ। প্রবন্ধ। ১৩১২ [১৯০৬]।

খেয়া। কবিতা। 'উৎসর্গ'-শেষে তারিখ, ১৮ আষাঢ় ১৩১৩ [১৯০৬]। 'বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু করকমলেষু'।

নৌকাডুবি। উপন্যাস। ১৩১৩ [১৯০৬]।

বিচিত্র প্রবন্ধ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১ম ভাগ। বৈশাখ ১৩১৪ [১৯০৭]। এই সময় হইতে মোট ১৬ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা 'গদ্যগ্রন্থাবলী' নামে মুদ্রিত হয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ।

চারিত্রপূজা। প্রবন্ধ। [২৮ মে ১৯০৭]।

প্রাচীন সাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ২য় ভাগ। প্রবন্ধ। [১৩ জুলাই ১৯০৭]।

লোকসাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ। প্রবন্ধ। [২৬ জুলাই ১৯০৭]।

সাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ৪র্থ ভাগ। প্রবন্ধ। [১১ অক্টোবর ১৯০৭]। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬১। 'মূল প্রবন্ধগুলির অতিরিক্ত চৌদ্দটি প্রবন্ধ বর্তমান সংস্করণের সংযোজনে কালক্রমে সংকলিত।'

আধুনিক সাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ৫ম ভাগ। প্রবন্ধ। [১০ অক্টোবর ১৯০৭]।

হাস্যকৌতুক। গদ্যগ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ ভাগ। কৌতুকনাট্য। [১০ ডিসেম্বর ১৯০৭]।

ব্যঙ্গকৌতুক। গদ্যগ্রন্থাবলী ৭ম ভাগ। কৌতুকনাট্য ও নিবন্ধ। [২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭]।

প্রজাপতির নির্বন্ধ। গদ্যগ্রন্থাবলী ৮ম ভাগ। উপন্যাস। [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮]। ১৩১১ বঙ্গাব্দে [১৯০৪] রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী ('হিতবাদীর উপহার') গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয় ('চিরকুমার সভা' নামে)। এই উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত 'চিরকুমার সভা' ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

সভাপতির অভিভাষণ: পাবনা সম্মিলনী। ১৩১৪ [১৯০৮]। পরে 'সমূহ' [১৯০৮] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রাজা প্রজা। গদ্যগ্রন্থাবলী ১০ম ভাগ। প্রবন্ধ। [৩০ জুন ১৯০৮]।

সমূহ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১১শ ভাগ। প্রবন্ধ। [২৫ জুলাই ১৯০৮]।

স্বদেশ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১২শ ভাগ। প্রবন্ধ। [১২ অগস্ট ১৯০৮]।

সমাজ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৩শ ভাগ। প্রবন্ধ। [৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]।

শারদোৎসব। নাটক। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]। 'ঋণশোধ' নামে ইহার অভিনয়যোগ্য সংস্করণ ১৯২১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৪শ ভাগ। [১৭ নবেম্বর ১৯০৮]। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৫১।

মুকুট। নাটিকা। [৩১ ডিসেম্বর ১৯০৮]। 'বালক [১২৯২] পত্রে প্রকাশিত "মুকুট" নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত'।

শব্দতত্ত্ব। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৫শ ভাগ। প্রবন্ধ। [২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯]। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে, অগ্রহায়ণ ১৩৪২ [১৯৩৫]। এই সংস্করণ 'পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে' উৎসর্গিত।

ধর্ম। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৬শ ভাগ। প্রবন্ধ। [২৫ জানুয়ারি ১৯০৯]। ইহা শব্দতত্ত্বের পূর্বে প্রকাশিত হইলেও সংখ্যা অনুযায়ী পরে সন্নিবিষ্ট হইল।

শান্তিনিকেতন। ১-৮ ভাগ। অনুলিখিত ভাষণ। [জানুয়ারি-জুন ১৯০৯]।

প্রায়শ্চিত্ত। নাটক। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'এ তারিখ '৩১শে বৈশাখ ১৩১৬' [১৯০৯]। বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের [১৮৮৩] নাট্যীকৃত রূপ। ভিন্নতর রূপ— পরিত্রাণ— জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ [১৯২৯]।

বিদ্যাসাগর-চরিত। প্রবন্ধ। [১৯০৯?]। পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫।

শিশু। কবিতা। ১৯০৯। মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের [১৯০৩-০৪] সপ্তম ভাগ -রূপে প্রথম মুদ্রিত। ইহার শেষাংশে প্রসঙ্গোপ-যোগী পূর্বপ্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা সংকলিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন। ৯-১১ ভাগ। অনুলিখিত ভাষণ। [৯-১০ ভাগ জানুয়ারি ১৯১০ এবং ১১শ ভাগ অক্টোবর ১৯১০]।

গোরা। ১-২ খণ্ড। উপন্যাস। [১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০]। 'শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু'।

গীতাঞ্জলি। কবিতা ও গান। ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭ [১৯১০]। রবীন্দ্রশতবর্ষ-

পূর্তি সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৭ [১৯৬০]।

রাজা। নাটক। [১৯১০]। 'অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', অরূপরতন [১৯২০]।

শান্তিনিকেতন। ১২-১৩ ভাগ। ভাষণ। [২৪ জানুয়ারি ও ১০ মে ১৯১১]।

ডাকঘর। নাটক। [১৬ জানুয়ারি ১৯১২]।

গল্প চারিটি। [১৮ মার্চ ১৯১২]।

মালিনী। নাটক। [২৩ মার্চ ১৯১২]। 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অঙ্গীভূত প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দে [১৮৯৬]।

চৈতালি। কবিতা। [২৩ মার্চ ১৯১২]। 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অঙ্গীভূত প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দে [১৮৯৬]।

বিদায়-অভিশাপ। নাট্যকাব্য। [১০ মে ১৯১২]। ১৩০১ বঙ্গাব্দে 'চিত্রাঙ্গদা'র দ্বিতীয় সংস্করণের সহিত প্রথম মুদ্রিত, 'চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ'।

জীবনস্মৃতি। আত্মজীবনী। ১৩১৯ [১৯১২]। বিস্তারিত-গ্রন্থপরিচয়-সংবলিত নূতন সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৫০ [১৯৪৩]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি বিশেষ সংস্করণ, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৬৭ [১৯৬০]।

ছিন্নপত্র। ১৩১৯ [১৯১২]। প্রথম আটটি পত্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এবং অবশিষ্ট পত্র শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে লিখিত। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে লিখিত এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ছিন্ন' পত্রগুলি, এবং তাঁহাকে লিখিত আরও ১০৭ খানি পত্র, অচ্ছিন্ন আকারে সংকলিত হইয়া ছিন্নপত্রাবলী নামে রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার অন্যতম রূপে প্রকাশিত, ১৩৬৭ [১৯৬০]।

অচলায়তন। নাটক। [২ অগস্ট ১৯১২]। 'অভিনয়যোগ্য' সংস্করণ, গুরু [১৯১৮]।

স্মরণ। কবিতা। [২৫ মে ১৯১৪]। মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের (১৯০৩-০৪) ষষ্ঠ ভাগে প্রথম মুদ্রিত।

উৎসর্গ। কবিতা। উৎসর্গপত্রের তারিখ— ১ বৈশাখ ১৩২১ [১৯১৪]। 'রেভারেণ্ড সি. এফ্. এণ্ডরুজ প্রিয়বন্ধুবরেষু'। মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে (১৯০৩-০৪) বিষয়ানুযায়ী যে শ্রেণীবিভাগ করা

হয় সে-সকল শ্রেণীর প্রবেশক কবিতা ও বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্গত অন্য কবিতার সংকলন।

গীতি-মাল্য। কবিতা ও গান। [২ জুলাই ১৯১৪]।

গীতালি। কবিতা ও গান। ১৯১৪।

শান্তিনিকেতন। ১৪শ ভাগ। ভাষণ। ১৯১৫।

শান্তিনিকেতন। ১৫-১৭ ভাগ। ভাষণ। ১৯১৬।

ফাল্গুনী। নাটক। ১৯১৬। 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে'। প্রায় একই সময়ে কাব্যগ্রন্থের (১৯১৫-১৬) নবম খণ্ডে মুদ্রিত।

ঘরে-বাইরে। উপন্যাস। ১৯১৬। 'শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু'।

সঞ্চয়। প্রবন্ধ। ১৯১৬। 'শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নামে'।

পরিচয়। প্রবন্ধ। ১৯১৬।

বলাকা। কবিতা। ১৯১৬। 'উইলি পিয়র্‌সন বন্ধুবরেষু'। প্রায় একই সময়ে কাব্যগ্রন্থের (১৯১৫-১৬) নবম খণ্ডে মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা -সহ শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৭ [১৯৬১]।

চতুরঙ্গ। উপন্যাস। ১৯১৬।

গল্পসপ্তক। [১৯১৬]।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। প্রবন্ধ। [২২ অগস্ট ১৯১৭]। পরে কালান্তর [১৯৩৭] গ্রন্থের অন্তর্গত হয়।

গুরু। নাটক। ১ ফাল্গুন ১৩২৪ [১৯১৮]। অচলায়তন [১৯১২] নাটকের 'অভিনয়যোগ্য' সংস্করণ।

পলাতকা। কবিতা। অক্টোবর ১৯১৮।

জাপান-যাত্রী। ভ্রমণকথা। শ্রাবণ ১৩২৬ [১৯১৯]। 'শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু'। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে প্রকাশিত নূতন সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ [১৯৬২]।

অরূপ রতন। নাটক। [১৯২০]। 'রাজা নাটকের [১৯১০] অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ'।

পয়লা নম্বর। গল্প। বৈশাখ ১৩২৭ [১৯২০]।

ঋণশোধ। নাটিকা। ১৯২১। শারদোৎসবের [১৯০৮] অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

মুক্তধারা। নাটক। বৈশাখ ১৩২৯ [১৯২২]।

লিপিকা। কথিকা। ১৯২২।

শিশু ভোলানাথ। কবিতা। ১৯২২।

বসন্ত। গীতিনাট্য। ফাল্গুন ১৩২৯ [১৯২৩]। পরে ঋতু-উৎসবে [১৯২৬] সংকলিত হয়। 'শ্রীমান কবি নজ্‌রুল ইস্‌লাম স্নেহভাজনেষু'।

পূরবী। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৩২ [১৯২৫]। 'বিজয়ার [ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো] করকমলে'।

গৃহপ্রবেশ। নাটক। আশ্বিন ১৩৩২ [১৯২৫]। 'শেষের রাত্রি' গল্পের নাট্যরূপ।

প্রবাহিণী। গান। অগ্রহায়ণ ১৩৩২ [১৯২৫]।

চিরকুমার সভা। নাটক। ফাল্গুন ১৩৩২ [১৯২৬]। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসের [১৯০৮] নাট্যরূপ।

শোধ-বোধ। নাটক। [১৯ জুন ১৯২৬]। 'কর্মফল' [১৯০৩] গল্পের নাট্যরূপ।

নটীর পূজা। নাটক। ১৩৩৩ [১৯২৬]।

রক্তকরবী। নাটক। ১৩৩৩ [১৯২৬]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৭ [১৯৬০]।

লেখন। বাংলা ও ইংরেজি কবিতা। কার্তিক ১৩৩৪ [১৯২৭]। গ্রন্থে ১৩৩৩ মুদ্রিত হইলেও, বস্তুত ১৩৩৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি। অধিকাংশ বাংলা কবিতা কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ -যুক্ত। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, ১৩৬৮ [১৯৬১]।

ঋতুরঙ্গ। গীতিনাট্য। ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ [১৯২৭]।

শেষ রক্ষা। প্রহসন। শ্রাবণ ১৩৩৫ [১৯২৮]। 'গোড়ায় গলদ' [১৮৯২] নাটকের অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

যাত্রী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ [১৯২৯]। ইহাতে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'জাভা-যাত্রীর পত্র' মুদ্রিত। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশ :

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি, শ্রাবণ ১৩৬৮ [১৯৬১]।

জাভা-যাত্রীর পত্র, শ্রাবণ ১৩৬৮ [১৯৬১]।

পরিত্রাণ। নাটক। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ [১৯২৯]। 'প্রায়শ্চিত্ত' [১৯০৯] নাটকের পরিবর্তিত রূপ।

যোগাযোগ। উপন্যাস। আষাঢ় ১৩৩৬ [১৯২৯]।

শেষের কবিতা। উপন্যাস। ভাদ্র ১৩৩৬ [১৯২৯]।

তপতী। নাটক। ভাদ্র ১৩৩৬ [১৯২৯]। রাজা ও রানীর [১৮৮৯] আখ্যানভাগ অবলম্বনে রচিত গদ্যনাট্য।

মহুয়া। কবিতা। আশ্বিন ১৩৩৬ [১৯২৯]।

ভানুসিংহের পত্রাবলী। চৈত্র ১৩৩৬ [১৯৩০]। 'রানুর প্রতি ভানুদাদার আশীর্বাদ'। অধ্যাপক ফণীভূষণ অধিকারীর কন্যা রানু অধিকারীকে লিখিত পত্রালি।

নবীন। গীতিনাট্য। ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭ [১৯৩১]। ইহা পরে 'বনবাণী'র [১৯৩১] অন্তর্গত হয়।

রাশিয়ার চিঠি। বৈশাখ ১৩৩৮ [১৯৩১]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ করকে'।

বন-বাণী। কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৮ [১৯৩১]।

শাপমোচন। কথিকা ও গান। ১৫ পৌষ ১৩৩৮ [১৯৩১]।

পরিশেষ। কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৯ [১৯৩২]। 'শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন করকমলে'।

কালের যাত্রা। নাট্য-সংলাপ। ৩১ ভাদ্র ১৩৩৯ [১৯৩২]। 'শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের' উদ্দেশে 'কবির সস্নেহ উপহার'। ইহার অন্তর্গত— রথের রশি, কবির দীক্ষা।

পুনশ্চ। গদ্যকাব্য। আশ্বিন ১৩৩৯ [১৯৩২]। উৎসর্গ: 'নীতু' [দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]।

Mahatmaji and the Depressed Humanity। ভাষণ। ডিসেম্বর ১৯৩২। 'To Acharyya Praphulla Chandra Ray'. ইহাতে তিনটি বাংলা ভাষণও মুদ্রিত আছে— ৪ঠা আশ্বিন, মহাত্মাজির শেষ ব্রত, পুণা ভ্রমণ। এগুলি পরে 'মহাত্মা গান্ধী' [১৯৪৮] গ্রন্থে সংকলিত।

দুই বোন। উপন্যাস। ফাল্গুন ১৩৩৯ [১৯৩৩]। 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু করকমলে'।

মানুষের ধর্ম। ১৯৩৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে প্রদত্ত 'কমলা লেকচার্স্'।

বিচিত্রিতা। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪০ [১৯৩৩]। 'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ'।

চণ্ডালিকা। নাটিকা। ভাদ্র ১৩৪০ [১৯৩৩]।

তাসের দেশ। নাটিকা। ভাদ্র ১৩৪০ [১৯৩৩]। দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৪৫, 'কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র'কে উৎসর্গিত। 'একটা আষাঢ়ে গল্প' [প্রথম প্রকাশ ১৮৯২] রূপক গল্পের নাট্যরূপ।

বাঁশরী। নাটক। অগ্রহায়ণ ১৩৪০ [১৯৩৩]।

ভারতপথিক রামমোহন রায়। প্রবন্ধ। ১৪ পৌষ ১৩৪০ [১৯৩৩]। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার অন্তর্গত পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১১ মাঘ ১৩৬৬ [১৯৬০]।

মালঞ্চ। উপন্যাস। চৈত্র ১৩৪০ [১৯৩৪]।

শ্রাবণ-গাথা। গীতিনাট্য। শ্রাবণ ১৩৪১ [১৯৩৪]।

চার অধ্যায়। উপন্যাস। অগ্রহায়ণ ১৩৪১ [১৯৩৪]।

শান্তিনিকেতন। প্রথম খণ্ড। মাঘ ১৩৪১ [১৯৩৫]। দ্বিতীয় খণ্ড। বৈশাখ ১৩৪২ [১৯৩৫]। কবি-কর্তৃক মার্জিত বহুশঃ বর্জিত ও নূতন সংযোজন -যুক্ত।

শেষ সপ্তক। গদ্যকাব্য। ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ [১৯৩৫]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি পরিবর্ধিত সংস্করণে [১৯৬১] দশটি নূতন কবিতা সংযোজিত।

সুর ও সঙ্গতি। [১ অগস্ট ১৯৩৫]। 'অতুলপ্রসাদের স্মরণে'। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পত্রালাপ। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় -লিখিত পত্রও ইহার অন্তর্গত।

বীথিকা। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪২ [১৯৩৫]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি পরিবর্ধিত সংস্করণে [১৯৬১] দশটি নূতন কবিতা সংযোজিত।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ফাল্গুন ১৩৪২ [১৯৩৬]। চিত্রাঙ্গদা [১৮৯২] নাট্যকাব্যের নৃত্যাভিনেয় নূতন রূপ।

পত্রপুট। গদ্যকাব্য। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান কৃষ্ণ কৃপালানি ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দিতার শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে আশীর্বাদ'।

ছন্দ। প্রবন্ধ। আষাঢ় ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান দিলীপকুমার রায়কে'। পরিবর্ধিত সংস্করণ, বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয় -সহ, কার্তিক ১৩৬৯ [১৯৬২]

জাপানে-পারস্যে। শ্রাবণ ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু'। পূর্বতন 'জাপান-যাত্রী' [১৯১৯] ও নূতন 'পারস্যভ্রমণ' একত্র গ্রথিত। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে 'পারস্যভ্রমণে'র নূতন সংস্করণ, পারস্য-যাত্রী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭০ [১৯৬৩]।

শ্যামলী। গদ্যকাব্য। ভাদ্র ১৩৪৩ [১৯৩৬]। উৎসর্গ : 'কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবীশ'।

সাহিত্যের পথে। প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে'। পরিবর্ধিত সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৫। সংযোজন-অংশে দশটি নূতন রচনা সংকলিত।

প্রাক্তনী। অভিভাষণ-সংগ্রহ। পৌষ ১৩৪৩ [১৯৩৬]। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের বিভিন্ন সভায় কথিত। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে নূতন সংস্করণ, ৭ পৌষ ১৩৬৬ [১৯৫৯]।

খাপছাড়া। ছড়া। মাঘ ১৩৪৩ [১৯৩৭]। 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বন্ধুবরেষু'। কবি-কর্তৃক অঙ্কিত বহু চিত্র ও রেখাচিত্র -সহ। নূতন সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২ [১৯৬৫]; ইহাতে ১৯টি কবিতা বা ছড়া সংযোজিত।

কালান্তর। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩৪৪ [১৯৩৭]। সংস্করণ, পৌষ ১৩৫৫। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি সংস্করণে [১৯৬১] সাতটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত।

সে। গল্প। বৈশাখ ১৩৪৪ [১৯৩৭]। 'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য করতল-যুগলেষু'। কবি-কর্তৃক অঙ্কিত বহু চিত্র ও রেখাচিত্র -সহ।

ছড়ার ছবি। কাব্য। আশ্বিন ১৩৪৪ [১৯৩৭]। 'বৌমাকে' [শ্রীমতী প্রতিমা দেবী]। নন্দলাল বসু -কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র-সহ।

বিশ্ব-পরিচয়। বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৪৪ [১৯৩৭]। 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রীতিভাজনেষু'।

প্রান্তিক। কাব্য। পৌষ ১৩৪৪ [১৯৩৮]।

চণ্ডালিকা। নৃত্যনাট্য। ফাল্গুন ১৩৪৪ [১৯৩৮]। চণ্ডালিকা [১৯৩৩] নাটকের নৃত্যোপযোগী রূপান্তর।

পথে ও পথের প্রান্তে। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ [১৯৩৮]। শ্রীমতী রানী মহলানবীশকে লিখিত পত্রাবলী।

সেঁজুতি। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪৫ [১৯৩৮]। 'ডাক্তার সার্ নীলরতন সরকার বন্ধুবরেষু'।

বাংলাভাষা পরিচয়। প্রবন্ধ। ১৯৩৮। 'ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করকমলে'।

প্রহাসিনী। কাব্য। পৌষ ১৩৪৫ [১৯৩৯]।

আকাশ-প্রদীপ। কাব্য। বৈশাখ ১৩৪৬ [১৯৩৯]। 'শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু'।

শ্যামা। নৃত্যনাট্য। স্বরলিপি-সহ। ভাদ্র ১৩৪৬ [১৯৩৯]। 'পরিশোধ' [১৮৯৯] কবিতা হইতে 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্য [১৯৩৬] হয়, তাহারই সুসমৃদ্ধ রূপান্তর।

পথের সঞ্চয়। লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা ১। ভাদ্র ১৩৪৬ [১৯৩৯]। ১৯১২-১৩ সালে য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে লিখিত পত্রাবলী। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে পুনর্মুদ্রিত, মাঘ ১৩৬৮ [১৯৬২]।

নবজাতক। কাব্য। বৈশাখ ১৩৪৭ [১৯৪০]।

সানাই। কাব্য। আষাঢ় [শ্রাবণ] ১৩৪৭ [১৯৪০]।

ছেলেবেলা। বাল্যস্মৃতি। ভাদ্র ১৩৪৭ [১৯৪০]।

চিত্রলিপি [১]। সেপ্টেম্বর ১৯৪০। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের সংগ্রহ। চিত্র-বিষয়ক কবিতা ও তাহার ইংরেজি অনুবাদ -সহ।

তিন সঙ্গী। গল্প। পৌষ ১৩৪৭ [১৯৪০]।

রোগশয্যায়। কাব্য। পৌষ ১৩৪৭ [১৯৪০]।

আরোগ্য। কাব্য। ফাল্গুন ১৩৪৭ [১৯৪১]। উৎসর্গ : 'কল্যাণীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর'।

জন্মদিনে। কাব্য। ১ বৈশাখ ১৩৪৮ [১৯৪১]।

গল্পসল্প। খোশ-গল্প ও কবিতা। বৈশাখ ১৩৪৮ [১৯৪১]। 'নন্দিতাকে'।

সভ্যতার সংকট। অভিভাষণ। ১ বৈশাখ ১৩৪৮ [১৯৪১]। শান্তিনিকেতনে অশীতিবর্ষপূর্তি-উৎসবের ভাষণ।

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। প্রবন্ধ। আষাঢ় ১৩৪৮ [১৯৪১]।

১৩৪৮, ২২ শ্রাবণের পরে প্রকাশিত

স্মৃতি। শ্রাবণ ১৩৪৮ [১৯৪১]। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র।

ছড়া। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪৮ [১৯৪১]।

শেষ লেখা। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪৮ [১৯৪১]।

চিঠিপত্র ১। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯ [১৯৪২]। মৃণালিনী দেবীকে লিখিত পত্র। পরিবর্ধিত সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৭২ [১৯৬৬]।

চিঠিপত্র ২। আষাঢ় ১৩৪৯ [১৯৪২]। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র।

চিঠিপত্র ৩। অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ [১৯৪২]। শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্র।

আত্মপরিচয়। প্রবন্ধ। ১ বৈশাখ ১৩৫০ [১৯৪৩]।

সাহিত্যের স্বরূপ। প্রবন্ধ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ, বৈশাখ ১৩৫০ [১৯৪৩]।

চিঠিপত্র ৪। পৌষ ১৩৫০ [১৯৪৩]। মাধুরীলতা, মীরা, নন্দিতা, নীতু ও নন্দিনীকে লিখিত পত্র।

স্ফুলিঙ্গ। কবিতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৫২ [১৯৪৫]। পূর্বপ্রকাশিত [১৯২৭] 'লেখন' এর সগোত্র, তবে ইংরেজি রচনা নাই। পরিবর্ধিত রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৭ [১৯৬১]। ইহাতে ৬২টি নূতন কবিতা সংযোজিত হইয়াছে।

চিঠিপত্র ৫। পৌষ ১৩৫২ [১৯৪৫]। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র।

মহাত্মা গান্ধী। কবিতা, প্রবন্ধ ও অভিভাষণ। ২৯ মাঘ ১৩৫৪ [১৯৪৮]।

মুক্তির উপায়। নাটক। শ্রাবণ ১৩৫৫ [১৯৪৮]। 'মুক্তির উপায়' [১৮৯২] গল্পের নাট্যরূপ।

বিশ্বভারতী। প্রবন্ধ। ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫১]।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। প্রতিষ্ঠা-দিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যপ্রণালী। ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫১]।

বৈকালী। গান ও কবিতা। ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫১]। ১৩৩৩ সালে মুদ্রিত, কিন্তু তখন প্রচারিত হয় নাই। কবির হস্তাক্ষরের প্রতিচিত্ররূপে মুদ্রিত।

Chitralipi 2। ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫১]। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের সংগ্রহ।

সমবায়নীতি। প্রবন্ধ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালার শততম গ্রন্থ। ১৩৬০ [১৯৫৪]।

চিত্রবিচিত্র। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৬১ [১৯৫৪]। শিশুরঞ্জন বহু অপ্রকাশিত ও কয়েকটি পূর্বপ্রকাশিত কবিতার সংকলন।

ইতিহাস। প্রবন্ধ। ২২ শ্রাবণ ১৩৬২ [১৯৫৫]। ইহার কয়েকটি প্রবন্ধ পূর্বে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

বুদ্ধদেব। কবিতা ও প্রবন্ধ। বুদ্ধপূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ [১৯৫৬]। বুদ্ধদেব-সম্বন্ধীয় বিবিধ রচনার সংকলন। কতকগুলি রচনা পূর্বে কোনো গ্রন্থ-ভুক্ত হয় নাই।

চিঠিপত্র ৬। শক বৈশাখ ১৮৭৯ [১৯৫৭]। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত পত্র। প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রবীন্দ্ররচনা -সহ।

খৃষ্ট। পৌষ ১৩৬৬ [১৯৫৯]। খৃষ্ট-জন্মদিনে প্রদত্ত খৃষ্টের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে ভাষণ, ও কবিতা।

চিঠিপত্র ৭। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭ [১৯৬০]। কাদম্বিনী দেবী ও শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্র।

ছিন্নপত্রাবলী। আশ্বিন ১৩৬৭ [১৯৬০]। ছিন্নপত্র [১৯১২] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত 'ছিন্ন' পত্রগুলি অচ্ছিন্ন আকারে এবং তাঁহাকে লিখিত আরও ১০৭ খানি সম্পূর্ণ চিঠি একত্রে সংকলিত হইয়া রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত।

বীরপুরুষ। কবিতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৯ [১৯৬২]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'শিশু'র অন্তর্গত বীরপুরুষ কবিতার সচিত্র মুদ্রণ।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা। প্রহসন। পৌষ ১৩৬৯ [১৯৬২]। 'কাহিনী'র অন্তর্গত প্রথম প্রকাশ, ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬ [১৯০০]।

পারস্য-যাত্রী। ২৫ বৈশাখ ১৩৭০ [১৯৬৩]। পারস্য-ভ্রমণের কাহিনী জাপানে-পারস্যে গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়া প্রকাশিত হইলেও (শ্রাবণ ১৩৪৩ [১৯৩৬]), রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে এই প্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থ রূপে মুদ্রিত হইল।

চিঠিপত্র ৮। ২৫ বৈশাখ ১৩৭০ [১৯৬৩]। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্র। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রিয়নাথ সেনের পত্র এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য -সংবলিত।

চিঠিপত্র ৯। ২৫ বৈশাখ ১৩৭১ [১৯৬৪]। শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁহার পুত্র কন্যা জামাতা ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত পত্রাবলী। শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীর তিনখানি পত্র, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য পত্র ও তথ্যাদি -সহ।

রূপান্তর। পঁচিশে বৈশাখ ১৩৭২ [১৯৬৫]। সংস্কৃত পালি প্রাকৃত হইতে তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা হইতে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী।

সংগীতচিন্তা। বৈশাখ ১৩৭৩ [১৯৬৬]। রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী, ভাষণ, আলোচনা, চিঠিপত্র, প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও পুস্তক হইতে সংকলিত।

সংকলন-গ্রন্থের তালিকা

কাব্যগ্রন্থাবলী। ১৫ আশ্বিন ১৩০৩ [১৮৯৬]। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য-সংগ্রহ। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -কর্তৃক প্রকাশিত। ইহার অন্তর্গত 'মালিনী' ও 'চৈতালি' ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

গল্পগুচ্ছ। প্রথম খণ্ড, ১ আশ্বিন ১৩০৭ [১৯০০]; দ্বিতীয় খণ্ড ['গল্প' নামে], ১৩০৭ [১৯০১]। মজুমদার এজেন্সি -কর্তৃক দুই খণ্ডে প্রকাশিত। দুই খণ্ডে মোট গল্প-সংখ্যা ৫৩। পূর্বে প্রকাশিত ছোট গল্প ও বিচিত্র গল্প

(দুই খণ্ডে) গ্রন্থের অধিকাংশ এবং কথা-চতুষ্টয় ও গল্প-দশক গ্রন্থের সমুদয় গল্প এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। ১৯০৮-০৯ খৃস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেস -কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের সংকলন পাঁচ 'ভাগে' 'গল্পগুচ্ছ' নামে প্রকাশিত হয়। গল্প-সংখ্যা ৫৭। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে বিশ্বভারতী-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের গল্পের সংকলন 'গল্পগুচ্ছ' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়, গল্প-সংখ্যা ৮৪। 'তিন সঙ্গী', 'করুণা' উপন্যাস এবং পূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয় নি এমন কয়টি গল্প একত্রে গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩৬৯ [১৯৬২]। বর্তমান গল্পগুচ্ছের ১-৪ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গল্প গ্রথিত।

গল্প। ১৩০৭ [১৯০১]। ইহা পূর্বধৃত গল্পগুচ্ছের (মজুমদার এজেন্সি -কর্তৃক প্রকাশিত) দ্বিতীয় খণ্ড।

কাব্যগ্রন্থ। ১-৯ ভাগ। ১৩১০ [১৯০৩-০৪]। ইহা রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যসংগ্রহ। ইহাতে নূতন প্রণালীতে, বিষয়ানুক্রমে, কবিতাগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। অভিনবত্বের জন্য বিভিন্ন খণ্ড -নিবিষ্ট শ্রেণীগুলির উল্লেখ করা গেল— যাত্রা, হৃদয়-অরণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব, সোনার তরী, লোকালয়। নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক, যৌবনস্বপ্ন, প্রেম। কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য। সংকল্প, স্বদেশ। রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা। মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, স্মরণ। শিশু। গান। নাট্য॥ চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত 'সংকল্প' 'স্বদেশ', ষষ্ঠ ভাগে মুদ্রিত 'স্মরণ' এবং সপ্তম ভাগে মুদ্রিত 'শিশু' ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী। হিতবাদীর উপহার। ১৩১১ [১৯০৪]। প্রধানতঃ উপন্যাস নাটক ও ছোটোগল্পের সংকলন। ছোটোগল্প বিভাগে ('রঙ্গচিত্র') 'চিরকুমার সভা' এবং উপন্যাস বিভাগে 'নষ্টনীড়' সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। 'নষ্টনীড়' বিশ্বভারতী-সংস্করণ গল্পগুচ্ছ (১-৩ খণ্ড ১৯২৬, চতুর্থ খণ্ড ১৯৬২) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

স্বদেশ। কবিতা। ১৩১২ [১৯০৫]। ইহার অধিকাংশ প্রথমে কাব্যগ্রন্থ [১৯০৩-০৪] চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত হয় ('সংকল্প', 'স্বদেশ'); পরে পুনরায় 'সংকল্প ও স্বদেশ' নামে মুদ্রিত— এবং সেই নামেই বর্তমানে প্রচলিত।

প্রহসন। গদ্যগ্রন্থাবলী ৯ম ভাগ। [১৬ এপ্রিল ১৯০৮]। ইহাতে গোড়ায় গলদ [১৮৯২] ও বৈকুণ্ঠের খাতা [১৮৯৭] একত্র মুদ্রিত হয়।

কথা ও কাহিনী। কবিতা। [১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]। মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের [১৯০৩-০৪] পঞ্চম ভাগে মুদ্রিত 'কাহিনী' ও 'কথা' অংশের একত্র পুনর্মুদ্রণ।

গান। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]। যোগীন্দ্রনাথ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত।

চয়নিকা। কবিতা। ১৯০৯। ১৩৩২ ফাল্গুনে যে প্রথম বিশ্বভারতী-সংস্করণ ('তৃতীয় সংস্করণ') মুদ্রিত হয় তাহাতে কবিতা নূতন করিয়া নির্বাচিত। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে নূতন নূতন কবিতা-গ্রন্থ হইতে কবিতা সংকলিত।

গান। ১৯০৯। ইণ্ডিয়ান প্রেস -কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে দুই ভাগে 'গান' এবং 'ধর্মসঙ্গীত' নামে মুদ্রিত হয়। দ্রষ্টব্য, তৃতীয়-খণ্ড গীতবিতানে (ভাদ্র ১৩৬৪) 'রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন', পৃ. ৯৫৬।

আটটি গল্প। [২০ নবেম্বর ১৯১১]। বালকবালিকাদের উপযোগী গল্পের সংকলন।

গান। [২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৪]। গান (১৯০৯) দ্রষ্টব্য।

ধর্মসঙ্গীত। [২৭ ডিসেম্বর ১৯১৪]। গান (১৯০৯) দ্রষ্টব্য।

কাব্যগ্রন্থ। ১৯১৫-১৬। ইণ্ডিয়ান প্রেস -কর্তৃক দশ খণ্ডে প্রকাশিত। ১-৬ খণ্ড ১৯১৫ খৃস্টাব্দে এবং ৭-১০ খণ্ড ১৯১৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নবম খণ্ডে মুদ্রিত 'ফাল্গুনী' এবং 'বলাকা' ১৯১৬ খৃস্টাব্দেই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

সংকলন। প্রবন্ধ, পত্র, ডায়ারি ও কথিকা। ৯ অগস্ট ১৯২৫।

গীতিচর্চা। গান। পৌষ ১৩৩২ [১৯২৫]। 'শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সম্পাদিত'।

ঋতু উৎসব। নাট্য-সংগ্রহ। ১৩৩৩ [১৯২৬]। বিভিন্ন ঋতুতে অভিনয়ের উপযোগী নাট্য এবং গীত -সংকলন। সূচী : শেষ বর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত, সুন্দর, ফাল্গুনী।

গীতবিতান। ১-২ খণ্ড। গান। আশ্বিন ১৩৩৮ [১৯৩১]। তৃতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৩৯ [১৯৩২]। কবি-কর্তৃক বিষয়ানুক্রমে-সজ্জিত, পরিবর্তিত

ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, দুই খণ্ডে প্রচারিত, মাঘ ১৩৪৮ [১৯৪২]। নূতন সংস্করণ, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ—প্রথম খণ্ড পৌষ ১৩৫২, দ্বিতীয় খণ্ড আশ্বিন ১৩৫৪, তৃতীয় খণ্ড আশ্বিন ১৩৫৭। এই সংস্করণের ১-২ খণ্ড বস্তুতঃ পূর্ববর্তী সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। ১-২ খণ্ডে নানা কারণে সংকলিত হইতে পারে নাই এরূপ সমুদয় গান ১৩৫৭ [১৯৫০] আশ্বিনে মুদ্রিত তৃতীয় খণ্ডে সংকলনের যত্ন করা হইয়াছে, অপিচ সমুদয় গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য অচ্ছিন্ন আকারে সন্নিবিষ্ট।

সঞ্চয়িতা। কবিতা-সংগ্রহ। পৌষ ১৩৩৮ [১৯৩১]। কবি-কর্তৃক সংকলিত ও কবির সপ্ততিবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত। পরবর্তী দুইটি সংস্করণে কবি-কর্তৃক বহু পূর্বসংকলন সংস্কৃত বা বর্জিত ও বহুতর নূতন কবিতা সংযোজিত হইয়াছিল। আরও পরবর্তীকালের কাব্য হইতে কবিতা চয়ন করিয়া প্রচলিত সংস্করণে (১৩৪৮, ২২ শ্রাবণের পর) সংযোজনরূপে দেওয়া হয়।

পাশ্চাত্য ভ্রমণ। আশ্বিন ১৩৪৩ [১৯৩৬] পরিবর্তিত য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র [১৮৮১] ও দ্বিতীয়-খণ্ড য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি [১৮৯৩] একত্র সংকলিত।

পত্রধারা। ১-৩ খণ্ড। ১৩৪৫ [১৯৩৮]। 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'পথে ও পথের প্রান্তে' একত্র 'পত্রধারা' নামে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৬ [১৯৩৯]। এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে থাকে—প্রত্যেক খণ্ডে 'কবিতা ও গান', 'নাটক ও প্রহসন', 'গল্প ও উপন্যাস', 'প্রবন্ধ', এই কয়টি বিভাগে বিবিধ রচনা সন্নিবিষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবন-কালে ১-৭ খণ্ড এবং অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়; সংকলনকালে বিভিন্ন গ্রন্থের প্রবেশক-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বহু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। কবির মৃত্যুর পরে এ যাবৎ ৮-২৭ খণ্ড, অচলিত-সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড এবং রবীন্দ্র-রচনাবলী · প্রথম ছত্র ও শিরোনাম -সূচী প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও বহু রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ডে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। পৌষ ১৩৪৬ [১৯৩৯]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। তৃতীয় খণ্ড। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৭ [১৯৪০]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। চতুর্থ খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৪৭ [১৯৪০]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৭ [১৯৪০]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। পঞ্চম খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ [১৯৪০]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। ষষ্ঠ খণ্ড। ফাল্গুন ১৩৪৭ [১৯৪১]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। সপ্তম খণ্ড। আষাঢ় ১৩৪৮ [১৯৪১]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। অষ্টম খণ্ড। ভাদ্র ১৩৪৮ [১৯৪১]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ [১৯৪১]
রবীন্দ্র-রচনাবলী। নবম খণ্ড। ৭ পৌষ ১৩৪৮ [১৯৪১]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। দশম খণ্ড। চৈত্র ১৩৪৮ [১৯৪২]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। একাদশ খণ্ড। আষাঢ় ১৩৪৯ [১৯৪২]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। দ্বাদশ খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৯ [১৯৪২]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। ত্রয়োদশ খণ্ড। কার্তিক ১৩৪৯ [১৯৪২]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। চতুর্দশ খণ্ড। চৈত্র ১৩৪৯ [১৯৪৩]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। পঞ্চদশ খণ্ড। চৈত্র ১৩৪৯ [১৯৪৩]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। ষোড়শ খণ্ড। ২২ শ্রাবণ ১৩৫০ [১৯৪৩]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। সপ্তদশ খণ্ড। ১ ফাল্গুন ১৩৫০ [১৯৪৪]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। অষ্টাদশ খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৫১ [১৯৪৪]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। ঊনবিংশ খণ্ড। ২৫ বৈশাখ ১৩৫২ [১৯৪৫]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। বিংশ খণ্ড। ৭ পৌষ ১৩৫২ [১৯৪৫]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। একবিংশ খণ্ড। ২২ শ্রাবণ ১৩৫৩ [১৯৪৬]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। দ্বাবিংশ খণ্ড। আশ্বিন ১৩৫৩ [১৯৪৬]।
সঞ্চয়ন। কবিতা সংকলন। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৪ [১৯৪৭]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। ত্রয়োবিংশ খণ্ড। আশ্বিন ১৩৫৪ [১৯৪৭]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। চতুর্বিংশ খণ্ড। ৭ পৌষ ১৩৫৪ [১৯৪৭]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। পঞ্চবিংশ খণ্ড। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৫ [১৯৪৮]।
রবীন্দ্র-রচনাবলী। ষড়্‌বিংশ খণ্ড। পৌষ ১৩৫৫ [১৯৪৮]।

বিচিত্রা। বিবিধ রচনার সংকলন। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ [১৯৬১]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সুলভ মূল্যে প্রচারিত।

রবীন্দ্র-রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সংকলন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ [১৯৬১]। এ পর্যন্ত ১৪ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও সকল খণ্ডে একই প্রকাশ-তারিখ মুদ্রিত আছে, বস্তুত খণ্ডগুলি কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত।

দীপিকা। বিবিধ রচনার সংকলন। ২৫ বৈশাখ ১৩৭০ [১৯৬৩]।

রবীন্দ্র-রচনাবলী। সপ্তবিংশ খণ্ড। ২৫ বৈশাখ ১৩৭২ [১৯৬৫]।

রবীন্দ্র-রচনাবলী। প্রথম ছত্র ও শিরোনাম সূচী। বৈশাখ ১৩৭৩ [১৯৬৬]।

—

নির্দেশিকা

সংযোজন

২৮০-৮১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বংশলতিকায় মীরা [অতসী] এবং শমীন্দ্রনাথের জন্মকালের প্রতি শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ; 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৮৯৪ সনের ২৭ জুন, ১৬ ও ১৯ জুলাই এবং ১ অগস্টের চিঠি কয়খানি থেকে মনে করা সংগত—

মীরা [অতসী]— জন্ম ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ

সেইরূপ অপর একটি সূত্রে জানা যায় :

শমীন্দ্রনাথ— জন্ম ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দ

'ছিন্নপত্রাবলী' থেকে জানা যায় যে, পুরী ও ভুবনেশ্বর মন্দির পরিদর্শনকালে (দ্র. পৃ. ৬৪) রবীন্দ্রনাথ কোণারক মন্দিরেও গিয়েছিলেন।

—